উৎসর্গ

কন্যা মিলিকে

যে শেষ ভ্রমণে আমিও একদিন যাব

পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন

# ভ্রমণের আগে

ছুটি পেলেই প্রথম প্রথম বেরিয়ে পড়তাম, তা একদিন, ত্বদিন বা দীর্ঘদিন। যাইহোক তখন আমার জানা ছিল না ঘরের কাছেই পশ্চিম বাংলার বুকে এত কিছু দেখার আছে। ক্রমে ক্রমে নিত্য নতুন জায়গা দেখার ইচ্ছে নেশার মত পেয়ে ব'সল। প্রতিবারই বেরিয়ে পডার আগে মনে প্রশ্ন জাগত কোথায় যাব, কি ভাবে যাব, অনুমান কত খরচ হবে? বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গিয়েও মনে প্রশ্ন জেগেছে, 'এখানে কি কি দেখবার আছে? দর্শনীয় বিষয়গুলির সাথে কি কোন প্রাচীন কাহিনী জড়িয়ে আছে? কার কাছে বা কোথায় এর সন্ধান পাব? প্রশ্নগুলির সমাধান করতে আমাকে প্রায়ই বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে। পথে বেরিয়ে বিভিন্ন লোককে প্রশ্ন করেছি। কখনও জবাব পেয়েছি, কখনও কোন সত্নত্তর পাইনি, অনেক লোকের বিরক্তি উৎপাদন করেছি। বহু লোকের কাছ থেকে শ্লেষ বাক্য শুনতে হয়েছে। কিছু লোকের কাছে খুব সুন্দর ও শোভন ব্যবহারও পেয়েছি। বেড়াতে বেরিয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই বুঝতে পেরেছি এই সব বিক্ষিপ্ত দর্শনীয় বিষয়গুলির তথ্য সংগ্রহ করা কি ত্বঃসাধ্য ব্যাপার। কোথাও কোথাও মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন পড়ে আছে নির্জন পথের পাশে নির্দেশবিহীন অবস্থায়। আগের যুগের গৌরবের মুখ ঢেকে রেখেছে এ যুগের নিরেট নীরন্ধ্র অন্ধকার। তার মধ্যে অসহায় ত্বর্বল শঙ্কাজড়িত পদক্ষেপ করে পথ-রেখার সন্ধান যেটুকুও পেয়েছি, আমার মত অর্বাচীনের পক্ষে ভাষার মাধ্যমে তাকে সুধীসমাজে পরিবেশন করতে সংকোচ বোধ ক'রছিলাম।

'ভ্রমণ বার্তা' পত্রিকার তরফ থেকে বছর পাচেক আগে একটা অনুরোধ আসায় লিখতে আরম্ভ করি। 'ত্বয়ার হতে অদূরে' পর্যায়ে ঐ পত্রিকায় অনেকগুলি কাছাকাছি জায়গা সম্পর্কে লেখা প্রকাশ হতে থাকে। সুসাহিত্যিক সম্রাট সেনের আগ্রহ ও নির্দেশে ঐ বিচ্ছিন্ন লেখাগুলির সাথে নতুন আরও কতকগুলি স্থানের কথা মিশিয়ে পুস্তক আকারে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছি।

কল্যাণীয় শ্রীমান প্রফুল্ল বসু (কেওটা, হুগলী) ও শ্রীমান অনিল দত্ত (নৈহাটী), কুশলী আলোক শিল্পী—যেখানে ওরা আমার সঙ্গে গেছে, ছবি তুলে এনেছে। তাদেরই তোলা কতকগুলি ছবি বইখানাকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রীমানেরা

ধন্যবাদার্হ। 'ভ্রমণ বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক, যিনি প্রথমে অনেকগুলি তথ্য লোক-সমক্ষে প্রকাশ করেছেন এবং শরৎ পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার ধীমান সত্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, যার ঐকান্তিক চেষ্টায় পুস্তকখানি প্রকাশিত হচ্ছে, এদের ঋণ শোধ করা যায় না।

অগ্রজপ্রতিম সম্রাট সেনের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। তিনি ধন্যবাদ প্রদানের উর্দ্ধে। যদি একজনও ভ্রমণার্থী বা পাঠক এই পুঁথির মধ্যে কণামাত্র আনন্দ কিম্বা তথ্য ও পথের হদিস পান, তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

রথযাত্রা ভূপতিরঞ্জন দাস

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কিছুদিন আগে পুরুলিয়া জেলায় কতকগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তারই একটি জায়গা পাক-বিড়রার কথা এই সংস্করণে দেওয়া হোল।

## সূচীপত্র

## দ্বিতীয় পর্ব

## এক

### পানিহাটী—খড়দহ

যতদিন ডাকঘরের পরিদর্শকের চাকরি করেছি, ততদিন পেশার তাগিদে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরতে হয়েছে। শুধু শহরে নয়, কাছের-দূরের হাজার হাজার গ্রামেও ঘুরেছি। এখন পেশার তাগিদ শেষ হয়েছে কিন্তু নেশার ঘোর কাটেনি।

এ এক বিচিত্র ব্যাধি।

এই ভ্রমণ-ব্যাধিতে যে কেবল আমিই ভুগছি তা কিন্তু নয়, ছোট বড় অনেকেই অল্প-বিস্তর এই ব্যাধির কবলে। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গাঁয়ের বধূ কলসীতে জল থাকা সত্ত্বেও বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল ফেলে, নদীর ঘাটে ছোটে নোতুন করে 'গাগরী ভরণে। জটিল মনস্তত্ত্বে না-গিয়েও বলা যায়, তাকে সবার অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়েছে বাইরের পড়ন্ত আলো, মুক্ত আকাশ। 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল'—এই সুরের মধ্যেই আছে সেই ব্যাধির তাড়না।

প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতিস্থ হতে দেয় না। তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কি অপরাধ করেছিলুম কে জানে, চাকরীর হোল অবসান; স্বাচ্ছন্দ্য এখন আর নেই। তার উপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গতিশক্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে, ঘোরাঘুরির অভ্যাস তাই একটু কমে আসাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যার জন্যে এই অভ্যাস আজও অব্যাহত, তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ এক মাধবীতলায়। সেই কাহিনী প্রথমে বলি।

আমাদের ক'বন্ধুর কারও পকেটের অবস্থা খুব ভাল না। অথচ বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটা প্রবল। অল্প পয়সায় কোথায় বেড়াতে

যাওয়া যায়, আলোচনা করতে করতে ঠিক হ'ল, বহুদিন থেকে গিরিবালার ঠাকুরবাড়ি দেখে আসবার ইচ্ছা সত্ত্বেও এখনও দেখা হয়নি।

চৈতন্য মঙ্গলে পড়েছি :

"পানিহাটী সমগ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে,
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে।"

পানিহাটীতেও যাওয়া হয়নি।

অতএব ঠিক হয়ে গেল, পরদিন সকাল দশটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে সবাই বালিগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছব, তারপর মাথা-পিছু দু'টাকা মাত্র বাজেটে এক দিনের ট্যুর।

নরেন ও কেষ্টদা বলে দিল যে, তারা উত্তর কলকাতা থেকে বালিগঞ্জ না এসে বেলা দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত, শিয়ালদা নর্থ ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে।

পরদিন দশটার মধ্যেই বীরু বালিগঞ্জ থেকে শিয়ালদা এল ট্রেনে। বিষ্ণুবাবু ও আমি ট্রামে এসে হাজির হলাম। মৃণ্ময় ও আশিস আগে থেকে এসে শিয়ালদায় অপেক্ষা করছিল। সবাই পৌছলাম, কেবল উদ্যোক্তা কেষ্টদার দেখা নেই। এগারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা পাঁচজন, শিয়ালদা থেকে নৈহটীগামী লোকাল ট্রেনে চেপে আগরপাড়া ষ্টেশনে নামলাম।

ষ্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে দেড় মাইল দূরে গঙ্গার ধারে গিরিবালার ঠাকুরবাড়ি। সাইকেল রিক্সা ভাড়া, দেড় টাকা। আমরা দলে পাঁচজন, ছায়াঢাকা পিচের রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম। আধ মাইল গিয়ে বি. টি. রোড।

সবে বি. টি. রোড পার হয়েছি—পাশের চায়ের দোকান থেকে কেষ্টদার গলা শোনা গেল, 'কি হে পঞ্চ পাণ্ডব! বেশ তো এগিয়ে চলেছ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে পড়ে রইল, সেদিকে কারও নজর নেই।'

শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদার দিকে না গিয়ে, কেষ্টদা পাঁচমাথার

মোড় থেকে ৭৮ নম্বর বাস ধরে, পঁচিশ মিনিটের মধ্যে বি. টি. রোড ও ইলিয়াস রোডের মোড়ে নেমে, চায়ের দোকানে বসে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা ক'রছিলেন।

শ্যামবাজার থেকে এই পথে ৭৮ নম্বর, ৭৮বি ও ৭৮ই রুটের বাস চলাচল করে।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ ও ইলিয়াস রোডের মোড় থেকে আরও প্রায় এক মাইল দূরে গঙ্গা। দু-জনে চললাম ইলিয়াস রোড ধরে গঙ্গার দিকে। সামনে পড়ল গিরিবালার ঠাকুরবাড়ি।

অনেকে এই মন্দিরকে ছোট্ট দক্ষিণেশ্বর বলেন। এই মন্দিরের অবস্থান দক্ষিণেশ্বরের মত গঙ্গাতীরে ও শিব-মন্দিরগুলির গঠনশৈলী মোটামুটি একই ধাঁচের। দক্ষিণেশ্বরের মূল দেবতা দক্ষিণাকালী, কিন্তু গিরিবালার ঠাকুরবাড়ির মূল দেবতা রাধাকান্ত জীউ।

এই মন্দির বাংলা তেরশ আঠার সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাণী রাসমণির নাতবৌ, জানবাজারের গোপালকৃষ্ণ দাস মশায়ের স্ত্রী গিরিবালা, প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচিলঘেরা মন্দির-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। বাঁধান প্রাঙ্গণ থেকে, মন্দিরের মেঝে প্রায় সাত ফুট উঁচু। মন্দিরের গায়ে প্রচুর রঙিন কাচের ও নক্সার কারুকাজ। মন্দিরের মেঝে থেকে প্রাঙ্গণে নামবার সিঁড়ির দুপাশে দুটি পাথরের নারী মূর্তি, হাতে বাতিদান। দক্ষিণে, পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া সুন্দর নাট মন্দির, মেঝে শ্বেতপাথরে বাঁধান।

এক সময়ে এই মন্দিরে, বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত। উৎসবের দিনে দুপুরে নাট-মন্দিরে বসে শত শত ভক্ত রাধাগোবিন্দের প্রসাদ পেয়েছে। কত উৎসব-সন্ধ্যায় এই নাটমন্দির মুখরিত হয়েছে বিখ্যাত কীর্তনীয়াদের ভজন গানে। জানবাজারের জমিদারবাবুরা নিজেরাই দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখা-শুনা করতেন। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে কামেশ্বর, রাজেশ্বর, গোপেশ্বর, তারকেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও গিরিশ্বর নামে

ছটি শিবমন্দির। প্রতিটি মন্দিরের দরজার খিলানের উপর শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অংকিত।

কামেশ্বর মন্দিরের যুগল-মিলন, রাজেশ্বর মন্দিরে মথুরানাথ, গোপেশ্বর মন্দিরে গোষ্ঠলীলা, তারকেশ্বর মন্দিরে অনন্তশয়ান, ভুবনেশ্বর মন্দিরে রাইমিলন ও গিরিশ্বর মন্দিরে কালিয়াদমন লীলা আঁকা।

প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে, শিবমন্দিরগুলোর দিকে মুখ করে সারি সারি অনেকগুলি ঘর। কোনটা ভোগের ঘর, কোনটা ভাড়ার, কোনটা সেবকের ঘর; কতকগুলো ছিল ভক্ত ও যাত্রীদের আশ্রয় আবাস, বর্তমানে অযত্নে ও অব্যবহারে পোড়ো বাড়ির রূপ নিয়েছে। মন্দির সংলগ্ন প্রশস্ত গঙ্গার ঘাট। মন্দিরের দেউড়ীর ঠিক বাইরেই ছিল বিশাল কাছারী বাড়ি, বর্তমানে সেটি ভাড়াটে বাড়িতে পরিণত।

মন্দিরটি কামারহাটী এলাকার মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর-দিকের রাস্তার পর থেকেই পানিহাটী এলাকা সুরু।

এই মন্দিরের জাঁক-জমকের কথা আজ কিম্বদন্তী। মাত্র ষাট বছর আগে তৈরী সেই মন্দিরের বর্তমান দৈন্যদশা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে আমরা গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরে উত্তর মুখে এগোলাম।

শ্মশানঘাট ছেড়েই সামনে পড়ল বাজারের ঘাট। লর্ড ক্লাইভের আমলে রাণী ভবানীর দেওয়ান গৌরীচরণ রায়চৌধুরী (সাবর্ণ গোত্রীয়) পানিহাটীর জমিদারী পান। গৌরীচরণের ছেলে জয়গোপাল রায়চৌধুরী এই বাজার ও ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন।

বাজারের ঘাটের পাশেই একটি পুরান দোতলা দালান। একতলার ঘরগুলি ভুসিমালের গুদাম, দোতলার ঘরে রায়চৌধুরীদের রাধাগোবিন্দজী রয়েছেন। রাধাগোবিন্দজীর প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে পড়ায়, ঐ দোতলায় ঠাকুর আশ্রয় নিয়েছেন। কষ্টিপাথরের গোবিন্দ-বিগ্রহ, ওজন প্রায় একমন পঁয়ত্রিশ সের। রাধামূর্তি অষ্টধাতুর। বাজারের উত্তর পাশেই রাসমঞ্চ ও চারটি শিব মন্দির।

শিব-মন্দিরগুলি আটচালা। রাস, দোল, জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীতে রাধাগোবিন্দের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। অন্যদিনে বর্তমান পূজারী কালিপদ চক্রবর্তী কোনমতে নামমাত্র নিত্য সেবা চালান।

রাসমঞ্চের পাশ দিয়ে উত্তরে এগোনো মাত্র চোখে পড়ল—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যের ঘাট। এই ঘাটটি প্রথম তৈরী হয় ১১০২ খৃষ্টাব্দে, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে। আমেরিকার ফ্লোরিডা সহরে উইনটামার্কে 'ওয়াক অফ ফেম' নামক প্রতিষ্ঠানে, পানিহাটীর এই প্রাচীন ঘাটের দুখানি ইট প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে রাখা আছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে নীলাচল যাবার পথে একবার এবং গৌড় যাত্রার সময় আর একবার এই ঘাটে এসে নামেন। মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ ধন্য বলে এই ঘাট শ্রীচৈতন্যের ঘাট নামে বিখ্যাত। ঘাটের উপরেই একটা সাতশ বছরের পুরাণ বটগাছ। এই বটগাছের নিচে মহাপ্রভু ও তার পার্শ্বচর নিত্যানন্দ বিশ্রাম করেছিলেন। মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটীতে যখন প্রেমধর্ম প্রচার করতে আসেন, সেই সময় সপ্তগ্রামের বিখ্যাত জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভাইপো রঘুনাথ মজুমদার এই বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর কৃপাপ্রার্থী হন এবং এতদিন আসেন নি বলে নিজেকে অপরাধী মনে করে প্রভূর কাছে দণ্ড প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তোমার মত বৈষ্ণবের বৈষ্ণব-সেবাই দণ্ড। উপস্থিত বৈষ্ণবদের দৈ চিঁড়ে দিয়ে মহোৎসব করাও, আমি তোমাকে এই দণ্ডই দিলাম। রঘুনাথ তখন মহোৎসবের আয়োজন করেন। এখনও পর্যন্ত প্রতিবৎসর জৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই গাছতলায় মহোৎসব হয়। এই জায়গাটি তদবধি দণ্ড-মহোৎসবতলা বা মচ্ছোবতলা বলে পরিচিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এই উৎসবে এসে দিব্যভাবে বিভোর হয়েছেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পায়ে-

হেটে এই মহাপ্রভুর স্মৃতি-জড়ান বটগাছ, রাঘবভবন প্রভৃতি দেখতে আসেন। বুড়ো বটগাছটির দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল যেন এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ মাথা নিচু করে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণামরত।

গাছের তলার ঘাট থেকে স্নান করে উঠে আসছিলেন এক ভদ্রলোক; প্রশস্ত বুকের উপর দিয়ে শুভ্র উপবীতটি ঝুলছে। পরিচয় নিয়ে জানলাম, নাম শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় ত্রাননাথ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার মুখে শুনলাম, মুসলমান যুগে এই গ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র ছিল। যশোর জেলায় যে 'পৈনেটি ধানের' আবাদ হয় তার আমদানী হত এখান থেকে। যশোর-খুলনা থেকে স্থল পথে বহু খেজুর গুড় এখানে আমদীন হত। মনে হয়, এই কারণে এই গ্রামের পূর্বনাম ছিল পণ্যহট্ট। অন্য আর একটি মত হলো, এখানে গঙ্গার তীরে এক সময় বৌদ্ধ তান্ত্রিক, পরে শৈব উপাসক, কাপালিক ও নাথপন্থী যোগীদের সাধনার ক্ষেত্র ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এই গ্রাম বৈষ্ণব-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়, এই কারণে গ্রামের নাম হয় পুণ্যহট্ট। বর্তমান নাম পানিহাটী; পণ্যহট্ট বা পুণ্যহট্টের অপভ্রংশ।

ঘাটের পাশেই কলকাতা বড়বাজার-নিবাসী গুরুচরণ সেনমশায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পানিহাটী এলে এখানে থাকতেন।

গঙ্গার ধারের পথ বেয়ে সামান্য একটু উত্তরে এসে আমরা জোড়াসাঁকো নিবাসী, শ্রীনন্দলাল ঝা মশায়ের প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী মন্দিরে ঢুকলাম। কৃষ্ণনগর ও চন্দননগর, পশ্চিম বাংলার এই দু'টো সহরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন খুব বেশী। সহর দুটি জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে যেন মেতে ওঠে। কিন্তু নদীয়া বা হুগলী জেলার কোথাও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী মন্দির, বা জগদ্ধাত্রীর নিত্য-সেবার ব্যবস্থা নেই পানিহাটীর মত। পাঁচিল-ঘেরা মন্দির। প্রাঙ্গণের মধ্যেই প্রসস্ত স্নানের ঘাট। ঘাটের দু'পাশে দুটি শিব মন্দির। একজনের

নাম তারকেশ্বর, অন্যের নাম গঙ্গাধর। জগদ্ধাত্রী মন্দিরের সামনেই সুন্দর নাটমন্দির, দক্ষিণ পাশেই পানিহাটী ও কোন্নগরের মধ্যে পারাপারের খেয়াঘাট। খেয়াঘাটের উপরেই রিকসা ষ্ট্যাণ্ড ও দু-তিনটি চায়ের দোকান।

জগদ্ধাত্রী-মন্দির থেকে বেরিয়ে একটু উত্তরদিকে এগিয়ে আমরা ত্রাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের তৈরী কালীমন্দির ও তিন শিবের মন্দির দেখতে গেলাম। প্রবাদ: খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে বেড়াচাঁপার রাজা চন্দ্রকেতু গড় স্থাপন করে তার ভিতরে ভবানী নামে কালিকা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান আক্রমণের সময় চন্দ্রকেতুর বংশধরেরা নিহত হন। জনৈক ব্রহ্মচারী বিগ্রহ নিয়ে বেড়াচাঁপা থেকে পালিয়ে আসেন গঙ্গাতীরে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রতিষ্ঠা করে মায়ের পূজা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারীর শিষ্য পরম্পরায় ঐ বিগ্রহ পূজিত হচ্ছিল। শেষ ব্রহ্মচারী ত্রাননাথ বাবুর উপর পূজার ভার দিয়ে পরলোক গমন করেন। ত্রাননাথ বাবু তখন এই মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গঙ্গার ধার থেকে গজ পঞ্চাশেক পূবদিকে গিয়ে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিখ্যাত তীর্থ রাঘবভবনে পৌছলাম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে:

"শচীর মন্দির আর নিত্যানন্দের নর্তন,
শ্রীবাস অঙ্গন আর রাঘব ভবন,
এই চারি ঠাই প্রভুর সদা আবির্ভাব"

নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গন গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে, শচীর মন্দির ও নিত্যানন্দের নর্তন সম্প্রতি অপ্রকট, একমাত্র রাঘবভবন বর্তমান। অতএব এযুগে একমাত্র রাঘবভবনেই প্রভুর নিত্য-আবির্ভাব সম্ভব। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনেকেই পানিহাটী রাঘবভবনকে অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ বলে মনে করেন।

"কতোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব মন্দিরে"—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের রাঘবভবনে সেই শুভাগমন উপলক্ষে এখনও প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথির পরের রবিবারে মহাপ্রভু স্মরণ উৎসব হয়।

রাঘব পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ও তারই সেবিত মদনমোহন ঠাকুর ও রাধারমণ বিগ্রহের এখনও এখানে নিত্যপূজা হচ্ছে বটে, কিন্তু মন্দিরের জীর্ণ দশা দেখে ভয় হয়, যে কোন সময়ে মন্দিরের ছাদ মদনমোহনের মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। মন্দিরের দরজা বন্ধ। মন্দির প্রাঙ্গণে পাঁচশ বছরের পুরান মাধবীলতার কুঞ্জে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি। মাধবী গাছটি আজও বেঁচে। গোড়াটি বাঁধান। ফুলে ফুলে গাছটি ঢেকে আছে। তারই তলায় চুপ করে বসে ছিল মেয়েটি। পাশে একটি দশ-বার বছরের ছেলে।

মন্দির কখন খুলবে জিজ্ঞাসা করায়, সে হেসে জবাব দিল, 'আমরাও ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা করার লোক কাউকে না পেয়ে পনের মিনিট বসে আছি।'

কথাবার্তায় অতি সপ্রতিভ। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, 'চারটে বাজে, নিশ্চয়ই মন্দির খোলার দেরী নেই, দেখি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।'

আমরা মাধবীতলায় বসলাম।

কথায় কথায় প্রকাশ পেল, ওরাও আমাদের মত সকালে বেরিয়েছে। খড়দা স্টেশনে নেমে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন, সাঁইবন, খড়দা দেখে এসেছে পানিহাটী। গিয়েছিল আশুতোষ দেবের বাগানবাড়ি দেখতে। এই বাগানবাড়ি ছাতুবাবুর বাগান নামে পরিচিত। বিশ্ববরণ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে কয়েকবার এখানে এসেছেন। ১৮৭২ সালে এগার বছর বয়সে এখানে আসেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। শৈশবের বেশ কয়েকটা দিন

কেটেছিল এই বাগানবাড়িতে। তারপর ১৯১৯, ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে আরও তিনবার তিনি এসেছেন, অবসর কাটিয়েছেন কয়েকদিন এই বাগানবাড়িতে।

মেয়েটি বললে, 'গুরুদেবের স্মৃতিপূত বাগানবাড়িটা দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু দরওয়ান ঢুকতে দিল না। এখন নাকি, বালিগঞ্জের ৮ নম্বর ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন থেকে জাস্টিস জে. পি. মিত্র মশায়ের অনুমতি পত্র না আনলে কাউকে ঐ বাগানবাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'খড়দা ও সাঁইবনে কি কি দেখলেন ?

মেয়েটি উত্তর দিল, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বা অদ্ভুত কিছু দেখতে পাবার জন্যে তো আমাদের বেরনো না, সাঁইবন, খড়দা বা পাণিহাটী দেখতে আসা মানে কোনমতে একদিনের সময় কাটান মাত্র। তবে মোটামুটি ভালই লেগেছে। কলকাতায় 'ইটের উপরে ইট তাহাতে মানুষ কীট' বাইরে এসে তবু একটু নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচা যায়। মেয়েটি বলে চলল, খড়দা স্টেশনে নেমে, স্টেশনের পূর্বদিকে গ্রামের মাঝখান দিয়ে প্রায় চার মাইল রিক্সায় করে যেয়ে সাঁইবন গ্রাম। একসময় হয়ত সাঁই বা বাউল গুরুদের বাস ছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছে সাঁইবন, এখন নন্দদুলাল বিগ্রহের পূজারীরা ছাড়া বৈষ্ণবদের বাস গ্রামে নেই বললেই চলে। নন্দদুলাল বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রবাদ, নিত্যানন্দ প্রভুর ছেলে বীরভদ্র গোস্বামী গৌড়ের নবাবপ্রসাদ থেকে একখণ্ড অতি বৃহৎ কালপাথর নিয়ে আসেন * বৃন্দাবনের এক বিখ্যাত শিল্পী এসে সেই পাথর থেকে তিনটি মূর্তি তৈরী করেন এবং বীরভদ্র গোস্বামীর ইচ্ছায় এই তিন বিগ্রহ তিন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হুগলী জেলার বল্লভপুরের রাধাবল্লভ দ্বিতীয়টি খড়দার শ্যামসুন্দর এবং তৃতীয়টি সাঁইবনের নন্দলাল।

প্রবাদ, একদিনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে পায়ে হেঁটে এই

---

* এ সম্পর্কে অন্যমত এই পুস্তকের একাশি পৃষ্ঠায় ( বল্লভপুর ) দেখুন।

তিন বিগ্রহ-দর্শন করলে জন্মান্তর হয় না। বহু বৈষ্ণব-ভক্ত একই দিনে এই তিন বিগ্রহ দর্শন করে থাকেন।

সাঁইবন থেকে ফিরে আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম খড়দা, গঙ্গার ধারে গোস্বামীপাড়ায় শ্যামসুন্দর দর্শনে। ওখানে গঙ্গার ধারে দেখলাম, রাসমঞ্চ। এই রাসমঞ্চের গঠনশৈলীর বিশেষত্ব, এতে দেশী ও ইংরেজ স্থাপত্যের অদ্ভুত মিলন হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের আদেশে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গার দুই কূলে গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার করতে করতে খড়দহে আসেন ও শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন।

"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন—কথন না যায়।" (চৈতন্যভাগবত)

পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়টি কোথায় খোঁজ করেছিলাম, কেউ হদিস দিতে পরে নি।

বিশ্বাস-ঘাটের ধারে রামহরি ও তার ছেলে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের তৈরী ছাব্বিশ শিব-মন্দির দেখে আমরা গিয়েছিলাম দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের বাড়িটি দেখতে। বিরাট জরাজীর্ণ অট্টালিকা অর্ধেক পরিত্যক্ত। বিশ্বাস-বংশেয় প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তিনি শ্রীক্ষেত্রের মত খড়দায় লক্ষ শালগ্রাম শিলা দিয়ে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অকালে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রত্নবেদী তৈরী করা হয়নি। দেখলাম একতলার একটা বড় ঘরে হাজার হাজার শালগ্রাম ও বণিলিঙ্গ তিনি সংগ্রহ করে রেখে গেছেন। রত্নবেদী তৈরী সম্পূর্ণ না হলেও এই হাজার হাজার শালগ্রামের পূজার ব্যবস্থা আছে।

...পূজারী এসে মন্দির খুললেন।

ওদের বেড়ানর কাহিনী শোনায় বাধা পড়ল। সবাই এসে

মন্দিরের দরজায় দাঁড়ালাম। কষ্টিপাথরের রাধারমণ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে যেন চোখ ফেরান যায় না, এমনই অপূর্ব মাধুরীমণ্ডিত মূর্তি।

মন্দিরের দুর্দশা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। পূজারী বললেন, 'পাণিহাটী অতি প্রাচীন গ্রাম, খোঁজ করলে অন্ততঃ হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাবে। যে কোন নদীর দেখবেন এক কূল ভাঙ্গে অন্য কূল গড়ে। সমস্ত নদীর মত গঙ্গারও দুকূলে সর্বত্র ভাঙ্গা-গড়ার কাহিনী। ব্যতিক্রম শুধু কাশী ও পাণিহাটী। গত দুহাজার বছরেও কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট আর পাণিহাটীর চৈতন্য ঘাটের এক ইঞ্চি মাটিও ভাঙ্গেনি বা স্রোতোধারা সামান্য পরিমাণেও সরে যায়নি। কিন্তু ভেঙ্গেছে:

ভেঙ্গেছে পাণিহাটীর সমাজব্যবস্থা। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পাঁচশ বছর আগে থেকে বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল যে পাণিহাটী, সেই পাণিহাটীতেই আজ মদনমোহনের নিত্য সেবাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আবার গড়েছেও। গড়ে উঠেছে ইংরেজী স্কুল, মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়। ভেঙ্গেছে গ্রাম্য সমাজ, গড়ে উঠেছে পৌর-সভা। যে পাণিহাটী গ্রামের পূর্ব পাড়ায় কায়স্থরাই শুধু বাস করত ঘোষ পাড়ায় ছিল কেবল সদ্গোপের বাস, বামুন পাড়ায় শুধু ব্রহ্মণরাই বাস করতে পারতেন, সেই পাণিহাটী আজ বাঙ্গালী বিহারী পাঞ্জাবী তেলেগু প্রভৃতি বহু জাতি বহু ভাষাভাষির এক মিশ্রিত শিল্পাঞ্চল।

সবই মদনমোহনের ইচ্ছা। যেদিন তার ইচ্ছা হবে, নিজেই ভাঙ্গা ইটের তলায় নিজের সমাধি রচনা করে নেবেন।

দিনের আলো কমে আসতে লাগল। সবাই রাঘবভবন থেকে বেরিয়ে এলাম। সোদপুর ষ্টেশন হয়ে ফিরবে বলে মেয়েটি রিক্সা ভাড়া করে সঙ্গীসহ উঠে বসল।

রিক্সায় উঠে মেয়েটি আমার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করল।

বললাম।' সে বললে, 'শিগগির একদিন আপনার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হব। বিরক্ত হবেন না তো?'

উত্তরে স্মিত হাসলাম শুধু।

'কোন সময়ে থাকেন বাসায়?

বললাম, ছুটির দিনে আমার ছুটোছুটি, বেরিয়ে পড়ি যেদিকে হোক। অন্যদিনে বিকেলের দিকে সাধারণত থাকি।'

'তাই যাব।'

কিন্তু কেন কি দরকার, জিজ্ঞেস করার আগেই রিক্‌সা চলতে সুরু করল। আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন অনুমান করেই কিনা জানিনা, মেয়েটি ঘাড় ফেরাল, দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'সেদিন বলব।'

রিক্‌সা চলে গেল। আমরা বি. টি. রোডের মোড়ে এসে শ্যামবাজারগামী বাস ধরলাম।

## দুই

### এ ড়েদা—দক্ষিণেশ্বর

দিন তিনেক পরের ঘটনা। ঘোষালদার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে কথা বলছি; মেয়েটি এসে হাজির। 'আসুন' বলে তাকে বসতে বলা মাত্র, সে বলে উঠল 'আপনি না তুমি বলবেন—আমার নাম কল্পনা, নাম ধরেই ডাকবেন।

সে একাই এসেছে। তার মুখে এমন একটা স্থির লাবণ্য আছে যে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পঁচিশ হলে মানায়, পঁয়তাল্লিশ হলে বেমানান নয়।

কল্পনা বসল। বললে, 'সেদিন পাণিহাটীতে আপনার বন্ধুদের মুখে শুনলাম আপনি কোনো একটা পত্রিকার ভ্রমণতথ্য সচিব,

কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যেতে হলে প্রয়োজনীয় তথ্য আপনার কাছে পাওয়া যাবে। সেইজন্যে আমার আসা।'

আমি উন্মুখ হয়ে আছি দেখে সে আবার বললে—'অন্য দিনগুলো তবু কাজের মধ্যে দিয়ে কোন মতে কেটে যায়, কিন্তু ছুটির দিন হলে যেন কোনভাবে কাটতে চায় না। আজকাল আবার একেবারে একা বেরুতে ভাল লাগে না, খুব নিরাপদও নয়, আমার এক কাকা বিদেশে থাকতেন, ছুটিতে এসেছেন, কয়েকদিন এখানে থাকবেন, তাঁর ছেলেটিকে পেয়ে তাকেই সঙ্গী করে সেদিন বেরিয়েছিলাম। বলুন না, কাছাকাছি আর কোথায় কি দেখতে আসতে পারি?'

আমি ঘোষালদাকে দেখিয়ে বললাম 'ইনি দক্ষিণেশ্বরের কাছে এঁড়েদার প্রাচীস বাসিন্দা। এঁড়েদায় বহু দর্শনীয় বিষয় আছে। ঘোষালদা, আপনাদের ওখানে কি কি দেখা যায়? এক মিনিট বসুন, আমি আসছি।' বলে বাড়ির ভিতরে চলে গেলাম চায়ের কথা বলতে। বেরিয়ে এসে দেখি, ঘোষালদা একাডেমিক কায়দায় বলে চলেছেন এঁড়েদা-কাহিনী, আর কল্পনা একাগ্র শ্রোতা।

ঘোষালদা বলছিলেন, এড়ু মিশ্রের কারিকায় আছে: 'যমুনা পূর্বসীমায়াং গঙ্গাযস্য পূর্বস্থিতা'—অর্থাৎ যমুনা যার পূর্বসীমায় এবং গঙ্গা যার পশ্চিমে অবস্থিত সেই এড়ুদ্বীপ। আজ কিন্তু এড়ুদ্বীপ বা এঁড়েদা কামারহাটি পৌরঅঞ্চলের একটা সামান্য ওয়ার্ড মাত্র, তবুও এঁড়েদা ভক্তজনের, সাধকের, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর, ঐতিহাসিকের, এমন কি সাধারণ দর্শকের মনের প্রচুর খোরাক বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এঁড়েদার উত্তর সীমান্তে পাটবাড়ি। ওখানেই ছিল চৈতন্যপার্ষদ গদাধর দাসের ভিটা। নিত্যানন্দ প্রভু রাঘবভবন থেকে এখানে আসেন এবং বালগোপালমূর্তি বুকে তুলে নিয়ে নৃত্য করেন। সেই বিগ্রহ রয়েছে পাটবাড়িতে। এই পাটবাড়িতে রয়েছে প্রাচীনকালে আঁকা শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গে ভক্তগণের নগর কীর্তনের একখানি চিত্রপট, যা দেখে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সমাধিস্থ হয়ে যান

পাটবাড়িতে বলাইচাঁদ মল্লিকের মায়ের প্রতিষ্ঠিত গোপেশ্বরজীর বিগ্রহ ও মহাপ্রভু-নিত্যানন্দের বিগ্রহ আছে।

পাটবাড়ির দক্ষিণেই, চৈতন্যপূর্বযুগের তান্ত্রিক-সাধকদের সাধন-ক্ষেত্র এঁড়েদার শ্মশানে। শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত শিবই দক্ষিণেশ্বর-শিব নামে পরিচিত। প্রবাদ: বুড়ো শিব স্বয়ম্ভু। রাজা হোসেনশাহের আমলে কোন এক ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ ভরদ্বাজ গোত্রের বিবর্তন মুখোপাধ্যায়, স্বপ্ন দেখেন মহাদেব তাঁকে বলেছেন, বহুদিন গঙ্গার ধারে পড়ে আছি জঙ্গলের মধ্যে একটু সেবার ব্যবস্থা কর। পরদিন ব্রাহ্মণ শ্মশানের পাশে গিয়ে দেখেন সত্যিই একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। শোনা যায়, বড়লাট লর্ড-ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির বিবরণ সংগ্রহ করার সময়ে লোকমুখে এই কাহিনী শুনে কৌতূহলী হয়ে শিবলিঙ্গটিকে পরীক্ষা করার জন্য মাটি খোঁড়েন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও লিঙ্গের শেষ পানতিন।

'ওয়ারেণ হেস্টিংস নাকি আসি সে সময়,
সত্যই স্বয়ম্ভু কিনা দেখিবারে চায়।
যত খোঁড়ে দেখে নীচে তত স্থূলকায়,
দেখিয়া ফিরিঙ্গীরাজ মানিলা বিস্ময়।'

শিবের বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন, দেওয়ান ৺হরনাথ ঘোষাল।

বুড়ো শিবের মন্দিরের পূর্বদিকে মুক্তকেশী কালিকা মন্দির ও দক্ষিণদিকে অভয়া কালী।

গঙ্গার ধারে ধারে আরও একটু দক্ষিণে এগিয়ে গেলে হরগৌরী মন্দির। মন্দির সকাল ছটা থেকে বারোটা এবং বিকেল তিনটে থেকে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

হরগৌরী মন্দীরের দক্ষিণ গায়ে, সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য মোহনন্দ ব্রহ্মচারী (সুবোধ মিত্র) প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমাতার মন্দির। মন্দিরে বিশ্বমাতার মূর্তির সঙ্গে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেক এজন্য এই মন্দিরকে গুরুধামও বলেন।

বিশ্বমাতার বিগ্রহ, আগমোক্ত, পরমচৈতন্য, পঞ্চকৃত্যকারী মূর্তি। শয়ান রুদ্রের নাভি উত্থিত পদ্মোপরি শিবের ক্রোড়ে মহাদেবী কালিকা। সম্মুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব।

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ
এতেমঞ্চ খুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্তু পরঃশিবঃ
তস্যোপরি মহাকালো ভুবনেশো বিরাজতে।
যেন সার্দ্ধং মহাদেবী কালিকা রমতে সদা।"

বিশ্বমাতার মন্দিরের দক্ষিণেই গঙ্গার ধারের সুন্দর বাগান বাড়িটি যোগদা মঠ। বিশ্ববিখ্যাত যোগী ও সাধক শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দগিরি (বিষ্ণু ঘোষের অগ্রজ) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই মঠের অধ্যক্ষ যোগানন্দগিরির আমেরিকান শিষ্য স্বামী ভোলানন্দজী।

যোগদামঠ থেকে মাত্র একশ গজ দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, প্রায় ছয় একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, বেলুড় মঠের মহিলা-সংস্থা সারদা-মঠ। এই মঠে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। বর্তমান সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

বাড়ির মধ্য থেকে চা ও চিড়েভাজা এল। কাপে একটা চুমুক দিয়ে ঘোষালদা বলে চললেন, 'বর্তমানে এঁড়েদা-দক্ষিণেশ্বরের প্রধান আকর্ষণ আদ্যাপীঠ। ডি. ডি. মণ্ডল ঘাটরোডে আদ্যাপীঠ অবস্থিত। শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর বাংলা ১৩২৮ সালে দক্ষিণেশ্বরে এসে আদ্যামূর্তি স্থাপন করেন। শ্বেতমর্মরে মণ্ডিত মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জগজ্জননী শ্রীশ্রীআদ্যাশক্তি ও প্রণবমধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। শত শত ভক্তের কাছে আদ্যাপীঠ এক মহাতীর্থ।

মূল মন্দিরের পিছনে ছটি শিব মন্দির ও আদ্যাশক্তির এক পটমন্দির আছে। দুপুরে সাড়ে দশটায় ভোগ আরতি সময় আধঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় শীতল-আরতির সময় আধঘণ্টা দর্শনমন্দিরে দাঁড়িয়ে ভক্তেরা দর্শন করতে পারেন। অন্য সময় মন্দির সম্পূর্ণ

বন্ধ থাকে। বৎসরে বাহান্ন দিন প্রায় উদয়স্তই খোলা থাকে। ঐ বাহান্ন দিন্ হোল : প্রতি মাসের সংক্রান্তি, প্রতি শুক্লানবমী, প্রতি কৃষ্ণা একাদশী, শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার দিনগুলি, ঝুলন, কোজাগরী, রাস ও দোলপূর্ণিমা, মহালয়া, কালীপূজা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, শ্রীপঞ্চমী ও নাগপঞ্চমীর দিন। এই মন্দিরে বিরাট অন্নভোগের ব্যবস্থা আছে। তার কিছু অংশ উপস্থিত দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে বিলি করা হয়। সকাল সাড়ে নটার আগে এসে দু-টাকা দিয়ে নাম লেখালে প্রসাদ পাওয়া যায়।

আদ্যাপীঠের সেবক-সমিতি মন্দিরের পূজাপাঠ ব্যতীত দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃ আশ্রম, বালিকাশ্রম মণিকুন্তলা বালিকা-বিদ্যালয়, সংস্কৃতবিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করেন।

আদ্যাপীঠের মন্দিরের ভোগের বিরাট পরিমাণ চালের সংস্থান করার জন্যে নদীয়া জেলার বাদকুল্লায় ও বর্ধমান জেলার মশাগড়িয়া গ্রামে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে চাল, সব্জী ও ঘি এসে মন্দিরের ভোগের সাশ্রয় করে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির বলতে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরকেই বোঝায়। বাংলা ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ( ৩১শে মে ১৮৫৫ খ্রীঃ ) স্নানযাত্রার দিন রাণী রাসমণি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাণীর জামাতা মথুর বাবু উপযুক্ত পুরোহিত খোঁজ করতে থাকেন।

ভগবানের অদ্ভুত লীলা! হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ( ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ) ১৭৫৬ শকে ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়ার দিন এক সন্তান জন্মায়। বাল্যকালে তার নাম ছিল গদাধর। গদাধর পাঠশালায় পড়ার সময় থেকেই গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবা পূজায় অভ্যস্ত ছিলেন। আঠার বৎসর বয়সের সময় গদাধর দাদা রামকুমারের সাথে কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে মিত্রদের বাড়িতে পূজার কাজ নেন।

মথুরবাবু এই দুই ভাইকে তাদের নূতন তৈরী মন্দিরের পূজারী

নিযুক্ত করেন। প্রথমে রামকুমার কালীর পূজা করতেন। গদাধর রাধাকান্ত বিগ্রহের পূজারী হন। কালীমন্দিরে বলি হয় বলে রামকুমারের ভাই গদাধর বা রামকৃষ্ণের সাথে মন্দির বদল করে নিলেন তিনি। রাধাকান্ত মন্দিরের পূজার ভার নিলেন, কালীপূজার ভার পড়ল রামকৃষ্ণের উপর। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটি গ্রামের রামচন্দ্র মুখুজ্যে মশায়ের মেয়ে সারদামণির সাথে রামকৃষ্ণের বিয়ে হয়। বিয়ের পর রামকৃষ্ণ ফিরলেন দক্ষিণেশ্বরে। মাস ছয়েক পূজা করার পর তার প্রেমোন্মাদের ভাব দেখা গেল। তিনি পূজা পাঠ ত্যাগ করে তন্ত্র সাধনায় মগ্ন হলেন এবং পঞ্চবটি স্থাপন করলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সাধক তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এগার মাস তিনি রামকৃষ্ণকে বেদান্ত পাঠ করে শোনাতেন। বেদান্ত শুনতে শুনতে এই দক্ষিণেশ্বরে বহুবার রামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি হয়। তিনি তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আশ্বিনের শুক্লা চতুর্থীর দিন সিমলার নরেন্দ্র দত্ত দক্ষিণেশ্বরে এসে স্নান করেন ও ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঘোষালদা বলে চ'ললেন,...দক্ষিণেশ্বর মন্দির রামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র যেখানে ঠাকুর মায়ের সাথে সাক্ষাৎভাবে কথা বলতেন। বর্তমানে সারা ভারত তথা সারা বিশ্বের শত শত ভক্তের পরম তীর্থ। সেই পঞ্চবটী আজও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সেদিনের তন্ত্রসাধনার নির্জন শান্ত পরিবেশ আজ আর নেই। শত সহস্র ভক্ত, ব্যবসায়ী, দর্শক ও যাত্রীর কোলাহলে মন্দির প্রাঙ্গণ আজ মুখরিত। দক্ষিণা কালিকা ও রাধাকান্ত মন্দির ব্যতীত আরও দ্বাদশ শিব মন্দির রয়েছে। বাসের মোড় থেকে আরম্ভ করে ফটক পেরিয়ে মূল মন্দিরের ধার পর্যন্ত বহু দোকান বসেছে। সব সময়ই মনে হয় যেন একটা মেলার পরিবেশ। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রধান ফটক থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে গেলে রয়েছে ইয়ুথ হোস্টেল ও আন্তর্জাতিক বিশ্রাম ভবন। ফটকের বাইরে বাঁ-দিকে তান্ত্রিক কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত কালীনাথ আশ্রম।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে গঙ্গাতীরে প্রশস্ত বাঁধান স্নানের ঘাট, এই ঘাট থেকে অল্প ভাড়ায় নৌকা পাওয়া যায়। ঐ সকল নৌকা দক্ষিণেশ্বর থেকে শেয়ারে বেলুড়মঠে যাত্রীদের নিয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকাযোগে বেলুড়মঠ যাওয়া যেমন সস্তা তেমনি সুবিধাজনক ও আনন্দদায়ক।

ঘোষালদা দক্ষিণেশ্বরের কালী ও রাধাকান্তের কথা শেষ করেই আরম্ভ করলেন শৈব সাধনার আলোচনা। তিনি বললেন, 'শিব নেই ও শিব মন্দির নেই এমন গ্রাম বোধহয় বাঙলায় নেই; তিনি সর্ব-সম্প্রদায়ের দেবতা। তাঁর এই প্রতিপত্তি ভারতবর্ষে আর্য আগমনের আগে থেকে। বৈদিক আর্যরা পারসিকদের সঙ্গে পৃথক হওয়ার আগে থেকে শিবকেই মহান পিতা বলে পূজা করতেন। পরবর্তীকালে শিব জনতার দেবতা রয়ে গেলেন, রাজন্যমহলে ইন্দ্র বিশিষ্ট দেবতা হলেন। অভিজাত সমাজ ইন্দ্রপূজা করলেও রুদ্র ও শিবকে ভয় করতেন। তাই ভারতীয় সমাজে শিবই আদি পিতা এবং উমা আদি মাতা। তন্ত্রেও দেখা যায়—

"আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃ পরং
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥"

রাণী রাসমণি যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সারা ভারতের বহু পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করেন। তাদেরই বিধি অনুসারে কালী মন্দিরের সাথে সাথে তিনি দ্বাদশটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন। প্রত্যেকটি শিবের আবার বিশিষ্ট নাম আছে; দক্ষিণেশ্বরের বারটি শিব হলেন—নির্জরেশ্বর, নাকেশ্বর, নকুলেশ্বর, জটিলেশ্বর, রত্নেশ্বর, যোগেশ্বর, নরেশ্বর, নন্দীকেশ্বর, নাগেশ্বর, জগদীশ্বর, জলেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর।

---

* শৈব সাধনা ও শিব পূজা সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার জন্য এই লেখকের 'দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন' পড়ুন।

# তিন

বেড়াচাঁপা—হাড়োয়া

ঘোষালদার কথা শেষ হলে কল্পনা বলল, 'উনি এঁড়েদা ও দক্ষিণেশ্বর সম্পর্কে যা বললেন, তাতে আমি একাই যে কোন দিন এঁড়েদা অঞ্চল দেখে আসতে পারব। ঐতিহাসিক রাখালদাস বাড়ুজ্যে মহাশয়ের একটা লেখায় পড়েছিলাম, চন্দ্রকেতুর গড়ে বহু প্রাচীন পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। চলুন কোন একটা ছুটির দিনে চন্দ্রকেতুর গড় দেখে আসি। যদি দিন দশেকের মধ্যে যান, তাহলে আমার পক্ষে সুবিধে হয়। যাবেন?'

কল্পনা ছেলেমানুষের মত অনুরোধ করতে লাগল, 'সামনের মঙ্গলবার জন্মাষ্টমীর ছুটি আছে। ভোরে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। চমৎকার হবে।'

সুন্দর মুখে ছেলেমানুষের মত অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। রসিকতার লোভ সামলাতে পারলাম না। হালকা স্বরে বললাম, 'আমার পক্ষে যে কোন দিনই শুভ, তবে মেয়েরা যেমন একাকী কোথাও যেতে ভয় পায় আমাদেরও তেমনি সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষত, অজ্ঞাত-কুলশীলাদের ক্ষেত্রে। তুমি কোথায় থাক, কি কর, কিবা তব পরিচয় কিছুই তো জানিনা; শাস্ত্রেও বহুবিধ সতর্কবাণী আছে। অশাস্ত্রীয় দুঃসাহস দেখানো সমীচীন কিনা তুমিই বলো, কল্পনা দেবী।'

আমি হাসছি দেখে কল্পনার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল।

বুঝতে পারলাম, ওর মনে লেগেছে। সদ্যোপরিচিতার সঙ্গে ওরকম রসিকতা না করলেই বোধহয় ভালো হোত। কেননা দেখলাম এক টুকরো সাদা কাগজে তড়বড় করে সে তার নাম-ঠিকানা

লিখল, আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমার ঠিকানা রইল। ফোন নম্বরও দিলাম। আমাদের মত গরীবের বাড়িতে টেলিফোন নেই, পাশের বাড়ির ডাক্তারবাবুর ফোন-নম্বর। সজ্জন ব্যক্তি, আমাদের ফোন এলে ডেকে দেন। কোনদিন ওদিকে গেলে, দয়া করে দেখা করবেন। খুব আনন্দ পাব। আজ উঠি। মঙ্গলবার, ভোরবেলা আসছি—'

লঘুতা অপসৃত। সারা মুখে অচপল গাম্ভীর্য। কিন্তু মাধুরী-বিহীন নয়। তার অসীম সৌজন্যবোধের মধ্যেই অপরিসীম আভিজাত্য লুকানো।

দরজার কাছাকাছি গিয়ে সে অকপট সারল্যে বলে উঠল, 'তৈরী থাকবেন কিন্তু—'

বুঝতে পারলাম তার বক্তব্য একটাই এবং সেটা সুদৃঢ়। মঙ্গলবার ভোর ৬টা, ডান হাতে একটা বড় লাল ব্যাগ ও বাঁ হাতে ভাইটির হাত ধরে কল্পনা এসে হাজির। আমি প্রস্তুত ছিলাম। বেরিয়ে পড়লাম।

দ্রুত পায়ে তিনজন এগিয়ে চলেছি শ্যামবাজার খালের ধারে। দূর থেকে কানে আসছিল বাগবাজার মদনমোহন মন্দিরের জন্মাষ্টমীর আরতি ও ঘণ্টাধ্বনি।

৭৯ নম্বর বাসস্ট্যাণ্ডে তখনও লোকের ভীড় তেমন জমেনি।

কিন্তু ৭৯, ৭৯এ ও ৭৯ সি তিনটি রুটেরই বাসগুলি পর পর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। পাশের চায়ের দোকানগুলি পাঞ্জাবী ড্রাইভার ও কনডাকটারদের কলধ্বনিতে মুখরিত। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই তিনটি রুটের যে কোনটির বাসে চেপেই বেড়াচাঁপা যাওয়া যাবে। ৭৯ সি রুটের বাসগুলি বেড়াচাঁপা ছাড়িয়ে আরও দু-মাইল পর্যন্ত টাকী রোড ধরে যাবে তারপর বাঁ দিকের নতুন রাস্তা বরাবর, বাদুড়িয়াতে যাত্রাবিরতি। অন্য দুটি রুটের বাস বসিরহাট বাজার পর্যন্ত যাবে টাকী রোড ধরে। বসিরহাট বাজার থেকে টাকী রোড

ডানদিকে ঘুরবে—ঐ পথে ৭৯ এ রুটের বাসগুলি যাবে হাসনাবাদ পর্যন্ত। ৭৯ রুটের বাসগুলি বসিরহাট বাজারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাবে কাছারী ও জেলখানার পাশ কাটিয়ে। এদের যাত্রা-শেষ বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি ইচ্ছামতী নদীর পাড়ে ইটিণ্ডাঘাটে। ৭৯ বি নামধারী আরও একটি রুটের বাস চলে এই পথে; কিন্তু তাদের যাত্রা সুরু এসপ্লানেড থেকে, বিরতি বারাসাত পৌঁছেই।

৭৯, ৭৯এ ও ৭৯সি রুটের বাসগুলি ভোর পাঁচটা থেকে সাধারণত ছাড়তে সুরু করে। তিনটি রুটের বাসই ছাড়ে পালা করে, একে অন্যের ছ মিনিট পর পর। কেবল, দুপুরবেলায় এই সময়ের ব্যবধান বেড়ে দশ মিনিটে দাঁড়ায়। শেষ বাস শ্যামবাজার ত্যাগ করে রাত্রি সাড়ে সাতটায় এবং ইটিণ্ডাঘাটে পৌঁছোয় রাত সাড়ে এগারোটায়।

শ্যামবাজার থেকে বেড়াচাঁপা বাসের যাত্রাপথের দুধারের দৃশ্যের বৈচিত্র্য আছে, চোখের সঙ্গে মনও ছুটে যায় দিগন্তের পানে। বারাসাতের পর থেকে রাস্তা বেশ খারাপ, বাসের ঝাঁকুনিতে মন অন্তরমুখী হয়ে পড়ছিল। সামনের জোড়া-সিটে কল্পনা ও তার ভাইটি বসে, ঠিক তার পিছনেই জানালার ধারে আমি। পথের পাশে নূতন কিছু দেখলেই কল্পনা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিল। কল্পনা ভোরেই স্নান করে সামান্য প্রসাধন সেরে এলো-খোঁপা বেঁধে এসেছে। 'বায়ুভরে তার কেশের রাশি' গায়ে উড়ে না পড়লেও তার প্রসাধনের মৃদু সুবাস থেকে থেকে বাসের যাত্রীদের উদাস করে তুলছিল।

বেলা ঠিক নটার সময় বাস বেড়াচাঁপা চৌমাথায় থামল।

পথের ধারেই, চব্বিশ পরগণা জেলা-পরিষদ পরিচালিত ডাক-বাংলো, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস, দুটি হোটেল, কয়েকটা পাটের গুদাম ও আড়ৎ, ছোট বড় অনেকগুলো মুদিখানা ও মনোহারী দোকান এবং অনেকগুলো খাবারের দোকান। এই রুটে আসা যাওয়ার পথে বেড়াচাঁপায় বাস থামা মাত্র একদল ফেরীওয়ালা চা, সিঙ্গারা ও ডাব

নিয়ে বাসগুলিকে ঘিরে ধরে। সুরু হয় তারস্বরে চিৎকার। হাসনাবাদ ও ইটিণ্ডাগামী দূর-পথের যাত্রীদেরও বেড়াচাঁপায় চা সিঙ্গারা খাওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস থেকে নেমে প্রথমে গেলাম সামনের খাবারের দোকানে। সেখানে বসে থাকা কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে জানতে পারলাম, স্থানীয় যুবক শ্রীমান দিলীপ কুমার মৈতে কিছু উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় 'গড় চন্দ্রকেতুর কথা' নামে এই এলাকার একখানি স্থানীয় ইতিহাস সম্পাদনা করেছেন। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীসিদ্ধব্রত মুখার্জিও অমায়িক লোক—এদের কোন একজনের সঙ্গে দেখা করলে অনেক কথা জানা যাবে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পোষ্টঅফিস বন্ধ ছিল। সিদ্ধব্রত বাবুর দেখা পেলাম তার কোয়াটার্সে। তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, মাত্র দু মিনিটের পথের দূরত্বে খনা-মিহিরের ঢিপির কাছে।

খনা-মিহিরের ঢিপি—১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজটি আরম্ভ করা হয়। সামনেই একটি সাইনবোর্ডে লেখা "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম কর্তৃক খনিত খনা-মিহিরের ঢিপি সুরক্ষিত চন্দ্রকেতু গড়ের একাংশ। এই স্থানের অধিবসতির বিভিন্ন স্তর মৌর্যপূর্ব যুগ হইতে পাল যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। খনা-মিহিরের ঢিপির বহুভুজ ইষ্টক নির্মিত ইমারতের নিম্নাংশ সম্ভবতঃ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দুইটি উদ্দেশিক (Votive) স্তূপ ও ইষ্টক নির্মিত দীর্ঘ প্রাচীর হইতে অনুমিত হয় যে গুপ্ত পরবর্তী যুগে এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল।"

দেখলাম, খোঁড়ার পর যে দেওয়াল বেরিয়েছে সেগুলির কোন কোনটা চার ফুট চওড়া। বড় ভিতটি কোনো মন্দিরের, মনে হলো, দুটি পৃথক যুগে গড়া হয়েছিল। ভিতটি ৬৩ ফুট লম্বা ৪০ ফুট চওড়া। প্রত্নতাত্ত্বিক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মশায়ের মতে এইটি নাকি পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে পুরাণ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। খোঁড়বার সময়

এখানে অনেক মূর্ত, মুদ্রা, পাত্র ও অন্যান্য প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর কিছুই এখন বেড়াচাঁপায় নেই। সবই রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়মে। আমরা দেখতে পেলাম শুধু মাটির তলায় পাওয়া ভাঙ্গা মন্দিরের ভিত ও বহু প্রাচীন কালের গাঁথনি।

খনা-মিহিরের ঢিপি দেখে, আমরা বেড়াচাঁপা থেকে হাড়োয়া রোড ধরে দক্ষিণ দিকে প্রায় আধমাইল এগোলাম। এখানে অনন্ত বিস্তৃত ধানখেতের মাঝে আগাছায় ঢাকা খুব লম্বা একটা উঁচু ঢিপি দেখা গেল। এইটি চন্দ্রকেতুর গড় নামে পরিচিত। প্রবাদ, এখানে ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদ। ঢিপিটির মোট দৈর্ঘ প্রায় দেড় মাইল। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রায় এক মাইল গিয়ে সমকোণে বেঁকে উত্তর দিকে প্রায় আধ মাইল গিয়ে ধীরে ধীরে নিচু হয়ে ধান খেতে মিশে গেছে। ঢিপিটি প্রায় সব জায়গায় তিন থেকে চারশ ফুট চওড়া ও চাষের জমি থেকে দশ থেকে পনের ফুট উঁচু। বাঁকের মুখে ঢিপিটি প্রায় সাত আটশ' ফুট চওড়া, উচ্চতাও তিরিশ চল্লিশ ফুটের কম না। ঢিপির উপর মাঝে মাঝে বেলগাছ। বাঁকের মুখে চওড়া জায়গাটার উপর একটা গোলাকার ইঁটের গাঁথনির ধ্বংসাবশেষ ঘিরে অনেকগুলো বেলগাছ রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এই জায়গাটিকে সিংদরওয়াজা বলে। সামনে সরকারী প্রত্নতত্ব বিভাগের ফলকে লেখা, চন্দ্রকেতুর গড়। সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশ না মানলে যে অর্থদণ্ড ও কারাবাস হবে সেকথাও লেখা। কিন্তু সরকারী ফতোয়াকে পরোয়া না করে স্থানীয় লোকেরা প্রতি বছরই দু-চার হাত করে ঢিপি কেটে নিজেদের চাষের জমির সীমা বাড়িয়ে নিচ্ছে।

বিগত পঁচিশ বছরে, এই বিরাট চন্দ্রকেতুর গড়ের কোন খনন কার্য আরম্ভ করার চেষ্টা হয়নি। কি সরকারী কি বেসরকারী দু' তরফই উদাসীন।

সিংদরওয়াজার উপর দাঁড়িয়ে দেখা গেল, বহুদূর বিস্তৃত এক

প্রাচীন ঢিপি। এর গহ্বরে যে কত ঐতিহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে তার হদিস পাবার কোন ব্যবস্থা প্রত্নতত্ত্ববিভাগ করেন নি। মনটাকে শুধু ভারাক্রান্ত করল গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া এক যে ছিল রাজার কাহিনী।

ফিরে এলাম বেড়াচাঁপার মোড়ে।

এখানকার দুটি পাইস হোটেলের কোনটাই খুব উন্নত ধরনের নয়। ডাকবাংলোর পাশের হোটেলটিতে বসবার টেবিল চেয়ারগুলো একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে বসা গেল।

অনেকদিন ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে আমার তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্য করলাম, কল্পনা আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। আমি ওঠবার আগেই সে মুখ ধুয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে টাকা মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আমি হাত ধুয়ে, আমার খাবার টাকা কত হয়েছে জিজ্ঞাসা করে মানিব্যাগ বের করামাত্র কল্পনা বলে উঠল, 'ভগবান আমাকে মেরেছেন, নিজের বাড়িতে কোনদিন আপনাকে খেতে ব'লব সে ভাগ্য বোধহয় আমার কখনও হবে না; আজকে...' কথা শেষ হোলো না, ঝর ঝর করে দু-চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল। আমি অপ্রস্তুত। বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। কল্পনা দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। বললে, 'ভাই আসছে, ওর সামনে আর আমাকে অপদস্থ করবেন না। প্লিজ।'

পল্লব ওর দিদির মতোই চটপটে। তাড়াতাড়ি খেয়ে বাইরে হাত ধুতে গিয়েছিল। নূতন জায়গা, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহিঃপ্রকৃতি ও লোকজন দেখছিল। তাকে আমাদের দিকে আসতে দেখে বাধ্য হয়ে চুপ করে গেলাম।

বিস্ময় ও কৌতূহল জমে রইল মনে।

বেড়াচাঁপা থেকেই হাড়োয়াগামী বাস ছাড়ে।

দোকান থেকে একটি করে পান কিনে, চিবুতে চিবুতে এসে সেই

বাসে উঠে বসলাম। সুন্দর পীচঢালা রাস্তা। আধঘণ্টার মধ্যে বাস আমাদের হাড়োয়া পৌঁছে দিল। আমরা হেঁটে চললাম খাসবালন্দ গ্রামে, লাল মসজিদ দেখতে। হাড়োয়া থেকে খাসবালন্দ প্রায় এক মাইল পথ।

গ্রামের শেষ প্রান্তে বিশাল দুটি পুষ্করিণীর মাঝখানে একটি বিরাট প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা আগে কি ছিল। মন্দির, মসজিদ, নাকি কোন বৌদ্ধ মঠ? ছাদ সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে। মাত্র এক দিকের সত্তর আশি ফুট লম্বা ও প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু দাঁড়িয়ে আছে। এই ধ্বংসস্তূপের উপর জমান এক বিশাল বটগাছের ঝুরি অজস্র বাহু প্রসারিত করে আটকে রাখায় দেওয়ালটি পড়েনি, না হলে সেটিও বহুদিন আগে ধূলিলীন হোত। ধ্বংসস্তূপের উচ্চতা ও বিশালতা দেখে বেশ বোঝা যায় পুরানো কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর বর্তমানে দাঁড়ানো দেয়ালগুলি গাঁথবার চেষ্টা হয়েছিল। উপরের দেওয়ালের বয়স অন্ততঃ সাত-আটশ' বছর, কিন্তু নিচের ভিতের গাঁথনির বয়স অনুমান করা কঠিন।

এখানে পাওয়া একটা মুদ্রা দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন: "এটির বয়সকাল মোটামুটি খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃস্টীয় ১ম বা ২য় শতক পর্যন্ত"—( গড় চন্দ্রকেতুর কথা, পৃঃ ৯২ )।

দেওয়ালের গায়ের ইটে চক্রাকার নকশা দেখে এটাকে বৌদ্ধ মঠের অংশ মনে করাই স্বাভাবিক। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় পাথরের নক্সা করা পিলারের অংশ দেখা গেল। সেগুলি এত বড় যে দশ-বার জন জোয়ান লোকও চেষ্টা করে একটুও নাড়াতে পারে নি।

স্থানীয় মুসলমানেরা দাবী করেন এটি একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, নাম—লাল মসজিদ। হিন্দুদের বক্তব্য এটি কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

খাসবালন্দ গ্রামের বৃদ্ধ সরকার মশায় বললেন যে, তাঁর শৈশব

কালে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্শী শিক্ষক মৌলভী খয়র-উল-আনাম ও নৃপেন্দ্রনাথ বোস মশায় পরিদর্শন করতে এসে নাকি মন্তব্য করেছিলেন, এটি অতি প্রাচীন কোনো বৌদ্ধস্তূপ। নির্মাণকাল খৃষ্ট জন্মের কাছাকাছি সময়। পরবর্তীকালে, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে ঐ বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর তারই ভাঙ্গা মালমশলা ও কিছু নূতন ইট দিয়ে মসজিদ গড়ার চেষ্টা হয়েছিল।

লাল মসজিদ দেখে, আরও একটু দক্ষিণে, গ্রাম্য পথ বেয়ে এগিয়ে গেলাম বেড়্‌বাঁশতলায়। এখানে একটা অতি প্রাচীন সমাধি আছে। প্রবাদ, এটিই নাকি পীর গোরাচাঁদের প্রকৃত সমাধি। হাড়োয়া বাজারে যে পীর গোরাচাঁদের সমাধি আছে, সেই জায়গায় এখান থেকে শুধু হাড় নিয়ে সমাধি দেওয়া হয়েছে বলে স্থানের নাম হাড়োয়া।

প্রতি বৎসর বারই ফাল্গুন পীর গোরাচাঁদের মৃত্যুদিবসে হাড়োয়া থেকে একটা মিছিল এখানে এসে, বেড়্‌বাঁশতলার সমাধির পাশে বাতি জ্বালিয়ে সিরণি দেয়। তারপর মিছিল হাড়োয়ায় ফিরে গেলে সেখানের মসজিদে নমাজ পড়া হয়। ঐ একদিন ব্যতীত সমাধিতে বাতি দেওয়া হয় না। সমাধিটি বাঁশতলায় অযত্নে পড়ে আছে, দেখার কেউ নেই।

একই হাঁটা পথে, আমরা খাসবালন্দ থেকে হাড়োয়া বাজারে ফিরলাম।

ভোরে বেরিয়েছি। হাঁটাও কম হলো না। আমি লম্বা লোক, বেশ জোরে হাঁটতে অভ্যস্ত। তবু একটু যেন ক্লান্ত বোধ করছি। কল্পনার খুড়তুতো ভাই পল্লব তো মাঝে মাঝে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। কল্পনা কিন্তু একটুও ক্লান্ত হয়েছে বলে মনে হলো না। সমানভাবে পা ফেলে আমার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। প্রত্যেকটি দর্শনীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিপুল আগ্রহ। প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আমি সাধ্যমত উত্তর দিচ্ছি।

হাড়োয়া ছোট্ট নদীর ধারে সুন্দর একটি গঞ্জ। হাটের প্রান্তে খেয়াঘাটের পাশেই পীর গোরাচাঁদের সমাধি ও মসজিদ। মসজিদটি হাড়োয়া বাজারের ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী ও ঐ অঞ্চলের মুসলমান জোতদারদের অর্থানুকুল্যে খুব জাঁকজমকপূর্ণ। পীর গোরাচাঁদের প্রকৃত নাম হজরতশাহ শৈয়দ আব্বাস আলী। প্রবাদ, পীর গোরাচাঁদ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুন্দরবনের হাতিয়াগড় অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করার সময় হাতিয়াগড়ের রাজার সঙ্গে গোরাচাঁদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজকুমার আকানন্দের দৈবযুক্ত অস্ত্রে গোরাচাঁদ আহত হন। সাতদিন পর তার মৃত্যু হয়। পীর গোরাচাঁদের মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন হাড়োয়ায় বিরাট মেলা বসে। তিন চারদিন থাকে।

বৈকালিক চা-পান পর্ব হাড়োয়া বাজারে সেরে, খেয়া পার হয়ে, নদীর অপর পার থেকে সরাসরি লাউহাটি হয়ে শ্যামবাজারের বাসে ফিরলাম। এ পথে হাড়োয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বাস ভাড়া, একটাকা পাঁচ পয়সা।

বাসে আমরা তিনজন পাশাপাশি বসে আসছিলাম। কল্পনার মুখে কথাটি নেই। সে যেন বাইরের দৃশ্যাবলী গিলে খাচ্ছে। একবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেদিন কি বলবে বলেছিলে।' সে ইসারায় ভাইকে দেখিয়ে ঠোঁটে তর্জনী ঠেকাল।

চুপ করে গেলাম। মন কিন্তু কল্পনাকে একা পাওয়ার জন্যে ও তার জীবনের রহস্য জানার জন্যে ছটফট্ করতে লাগল।

খানিক ইতঃস্তত করে বললাম, 'কল্পনা, সামনের রবিবার আমি ঘুটিয়ারী শরীফ যাচ্ছি, সেখানকার গোলপুকুরে ফুল ভাসিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করব। ফিরে আসব বিকেলের মধ্যে। তোমার সময় হবে?

কল্পনার চোখের দৃষ্টিতেই প্রকাশ পেল সে আগ্রহী। হেসে

জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই যাচ্ছি এবং একা। পল্লব তার আগে মামাবাড়ি চলে যাচ্ছে।'

খুশি হলুম।

## চার

### ঘুটিয়ারী শরীফ

কথামত রবিবার সকাল সকাল আহারাদি সেরে, শিয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে ক্যানিংগামী লোকাল ট্রেনে চেপে বসলাম। ঘুটিয়ারী শরীফ শিয়ালদা থেকে মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার দূরে, গাড়ী ভাড়া পঁচানব্বই পয়সা। গাড়ীতে খুব ভীড়। কারণ খোঁজ করায়, এক ভদ্রলোক জানালেন, সকাল দশটা তিন ও দুপুর বারটা বার মিনিটের ক্যানিং লোকালে ভীড় রোজই থাকে। ক্যানিং অঞ্চল থেকে যত লোক মাছ ও তরকারী নিয়ে কলকাতায় আসে, তাদের ফেরার গাড়ী এই দুটি। উপরন্তু যারাই ক্যানিং থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের যে কোন দিকেই যেতে চান না কেন, তাদের এই দুটি ট্রেনের যে কোন একটিতে যেতে হবে। বিকেলের দিকের কোন ট্রেনে ক্যানিং গেলে দূরগামী লঞ্চ পাওয়া যায় না।

ঘুটিয়ারী শরীফ ট্রেনে না গিয়ে, গড়িয়া থেকে ক্যানিংগামী বাসেও যাওয়া যায়। কিন্তু বাসে গেলে টেঙ্গাবেড়ের মোড়ে নেমে ঘুটিয়ারী শরীফ পর্যন্ত এক মাইল পথ হেঁটে আসতে হয়।

সাড়ে দশটার সময় সোনারপুর জংসন ছাড়বার পরই ট্রেন চলল দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে। ডান দিকে চলে গেল ডায়মণ্ডহারবারগামী রেল লাইন। এগারোটার মধ্যেই ট্রেন ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশনে পৌঁছল। স্টেশন অতি ছোট। বাইরে বাঁ দিকে

সরু পাথরে বাঁধানো পথ। পথের দুধারে দোকানঘরের সারি। মাত্র মিনিট দুয়েকের পথ গিয়েই আমরা পৌঁছলাম হজরত সৈয়দ মোবারক গাজী সাহেবের দরগায়।

এই গাজীসাহেবের দরগাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হিন্দু-মুসলমান সবার কাছে বাবার দরগা বা দরগাশরীফ নামে পরিচিত।

দরগাশরীফের পশ্চিমদিকে, দরগায় ঢুকবার মুখেই একটি ছোট পুষ্করিণী। নাম খুরসিদ পুকুর। মেয়ে ও পুরুষদের ব্যবহারের জন্য দু'টি পৃথক বাঁধান ঘাট। যাত্রীরা দরগায় প্রবেশের আগে, এই পুকুরের জলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে এবং মুসলমান হলে উজু সেরে তবেই দরগায় প্রবেশ করে। পাশে, খুরসিদের সমাধি। প্রবাদ, আগে এই পুকুরে কোন বাঁধান ঘাট ছিল না। কলকাতার এক বিখ্যাত ধনী মুসলমানের একমাত্র ছেলে খুরসিদ, এখানে এসে এই পুকুরে স্নানের জন্যে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় এবং ডুবে মারা যায়। খুরসিদের বাবা ঘাট দুটি বাঁধিয়ে দেন এবং ঘাটের পাশে পাথরের ফলকে ছেলের নাম খোদাই করে দেন।

আজ কল্পনা একাই এসেছে। শিয়ালদা স্টেশনে এসে দেখা হওয়ার পর একটুখানি হেসে বলেছিল, 'চলুন, একটা জানালা নিয়ে বসতে হবে। নতুন জায়গা দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।' ট্রেনে প্রায় একঘণ্টা পাশাপাশি বসে এসেছি। আমি যত কথা জিজ্ঞাসা করেছি, সে অতি সংক্ষেপে হাঁ-না করে কোনোমতে জবাব দিয়েছে। খুরসিদ পুকুরের ঘাটের পাশের পাথরের ফলক দেখে সে প্রথম মুখ খুলল, বললে, 'এইরকম একটা পুকুরের সিঁড়ির উপর থেকে পা পিছলে আমি যদি ডুবে যাই তো বেশ হয়। আঃ কি শান্তিই না পাওয়া যেত!'

বললাম, 'মানুষ বাঁচতেই চায়। বেঁচে থাকার জন্যে তোমার মনে দুঃখ কেন?'

কল্পনা চকিতে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। দৃষ্টির মধ্যে

নানা ভাবের ব্যঞ্জনা। মুখ নিচু করল। এমন আস্তে শ্বাস ফেলল যা দেখে আমার মনে হোল, বুক-ভরা হাহাকার। ওর মনে কী খুব কষ্ট? কিসের কষ্ট? কেন?

অস্ফুট স্বরে, ফিস ফিস করে সে বললে, 'মেজদা, বাইরে থেকে আমরা যা দেখি সব সময় তা সত্যি নয়। কোনো-কোনো বাঁচা মৃত্যুর অধিক। সেইভাবে যাঁরা বেঁচে আছে, মৃত্যু তাদের অবশ্য কাম্য। বাইরে থেকে, সবাই তা দেখতে পায় না।'

'কিন্তু তুমি—'

কল্পনা অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল। 'চলুন ওই দিকটা দেখে আসি—।' ব্যস্তভাবে সে এগিয়ে গেল।

খুরসিদ পুকুরের পুবদিকে নামাজের ঘর। তারপরই পীর গাজী সাহেবের সমাধি। পীর সাহেবের সমাধির পাশের ঘরে চন্দনদহ ফকিরের সমাধি। আশেপাশে পীর সাহেবের খাদেমদেরও সমাধি রয়েছে। সমাধি মন্দিরের গম্বুজে রঙিন কাচ ও পাথরের কারুকাজ, দুপাশে দুটি লম্বা দরদালান। রোগমুক্তির কামনায় প্রতিদিন বহু ভক্ত রোগী এসে ঐ দুটি দরদালানে ধর্না বা হত্যা দেয়।

প্রবাদ, এইভাবে বহু লোক রোগমুক্ত হয়ে এখান থেকে ফিরে গেছে। সমাধির পিছনে একটা বড় নিমগাছ। গোড়াটি বাঁধান। নিমগাছটির কাণ্ডের চারদিকে মোটা লোহার বেড়ী দেওয়া। বহু পাগলকে রোগমুক্তির আশায় এইখানে এনে এই বেড়ীর পাশে বসিয়ে রাখা হয়। কোন কোন উন্মাদকে বেড়ীর সঙ্গে বেঁধে রাখবার দরকারও হয়। স্থানীয় এক বৃদ্ধের মুখে শুনলাম, 'যত পাগল আসে তার মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশজন সুস্থ হয়ে ফিরে যায়।' নিমতলা থেকে আমরা গেলাম গোলপুকুর বা মক্কা পুকুরের পাড়ে। পবিত্র পানীয় জলের আধার হিসাবে এই পুকুরের জল, শত শত যাত্রী মাটির ঘটে ভরে দূর দূরান্তরে নিয়ে যায়।

পুকুরটি সম্পূর্ণ গোলাকার। চারিদিক ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে

বাঁধান। কয়েকজন লোককে, তাদের মনের কামনা নিয়ে পুকুরের সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখা গেল। প্রতিদিনই বহু লোক আসে ও কামনা নিয়ে পুকুরে ফুল ভাসায়। কামনার ফল যে জানতে চায় সে দুহাতের আঁজলার মধ্যে একটা ফুল নিয়ে আঁজলা খোলা অবস্থায় ধীরে ধীরে হাত দুখানি জলের তলায় ডুবিয়ে রেখে চুপ করে বসে থাকে। হাত একটুও নাড়াচাড়া করে না। জলের সাধারণ নড়াচড়াতেই ফুলটি হাতের ভিতর থেকে ভেসে দূরে চলে যায়। যদি ফুল আবার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুরে তারই আঁজলার মধ্যে ফিরে আসে, ধরে নেওয়া হয়, তার সেই কামনা পূর্ণ হবে। ফুল হাতে ফিরে না এলে মনে করা হয়, ঐ কামনা পূর্ণ হবে না।

আমি দুটো জবাফুল কিনলাম। একটা নিজে নিয়ে অন্যটা কল্পনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'ধরো, তোমার কামনা ভগবানকে জানিয়ে ফুলসমেত হাত জলে ডুবিয়ে বসো।'

কল্পনা ফুল নিল না। বললে, 'দরকার নেই।'

'সে কী! কত দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসছে।'

কল্পনা ম্লান হাসল। বললে, 'তাদের আশা আছে, ভবিষ্যৎ আছে। হয়তো ভগবানও আছে। মেজদা, আমার কিছু নেই। আমি কিজন্যে ফুল ভাসাব?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'তাহলে থাক্। কারোরই ফুল ভাসিয়ে দরকার নেই।

আমি ফুল দুটো পুকুরের সিঁড়িতে রেখে উপরে উঠে এলাম।

যদিও ঘুটিয়ারী শরীফ মুসলমানদের তীর্থস্থান এবং গাজীসাহেব এখানে দেহত্যাগ করেছেন, এই দরগা ও সমাধি-মন্দির বারুইপুরের কায়স্থ-জমিদার রায়চৌধুরীদের তৈরী।

গোলপুকুরের চারদিকেই বহু ছোটবড় খড়ের, টালির বা টিনের চালাঘর। সংখ্যায় একশোর বেশী বৈ কম হবে না। এগুলি যাত্রীদের থাকবার চটি। এছাড়াও, স্টেশন থেকে খুরসিদ পুকুর

পর্যন্ত আসবার পথের ধারে ও আশেপাশেও যাত্রীদের থাকবার জন্যে বহু ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার শত শত হিন্দু-মুসলমান যাত্রী আসে এবং পীরের দরগায় ধূপ, মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। সিরণি চড়ায়। তারপর চটিতে বা অন্য কোনো যায়গায় একরাত্রি বাস করে। কেউ কেউ দরগায় কোন কামনা নিয়ে ধর্ণা দেয়। শুক্রবার দুপুরের পর ফিরে আসে। সাধারণতঃ একদিন চালাঘর ও প্রয়োজনীয় রান্নার সরঞ্জামের জন্য এখানকার খাদেম বা স্থানীয় লোকেরা দৈনিক ৪৫ টাকা ভাড়া দাবী করে, তবে নির্দিষ্ট কোন ভাড়ার হার নেই। আমরাও গাজী সাহেবের সমাধির পাশে ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম। হিন্দু-মুসলমান সবারই দরগায় প্রবেশের একই রকম অধিকার, কেবল ঘরের ভিতর ঢুকবার সময় মাথায় টুপি বা রুমাল চাপিয়ে ঢুকতে হয়। প্রধান খাদেম আমাদের হয়ে গাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে দোয়া করলেন, তার ভাষা উর্দু, আরবী বাংলা ও সংস্কৃতের মিশ্রণ। কথা বুঝতে পারলাম না, তবে আল্লা রসুল, বিষ্টু, সালাম, ওঁ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ শুনলাম। বুঝলাম, হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা সমন্বয়ে এসে পৌছেছিল। যেমন সত্যনারায়ণ ও সত্য পীরসাহেব অর্ধশ্রীকৃষ্ণ পয়গম্বরের-ভক্তের রূপ :

'ধবল অর্ধেক হায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।'

প্রবাদ, বারুইপুরের বিখ্যাত জমিদারদের এক পূর্বপুরুষ মদনমোহন রায় বাকি খাজনার দায়ে মুর্শিদকুলী খাঁর হাতে বন্দী হন। পীর গাজী মুর্শিদকুলী খাঁকে স্বপ্নে আদেশ দেন মদনমোহনকে মুক্তি দিতে। রায়চৌধুরীরাও পীরোত্তর জমি মোবারক গাজীকে দান করেন। এখনও প্রতিবছর অম্বুবাচীর সময় এখানে বৃহৎ মেলা হয়—উৎসবে কয়েকলক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়েই দরগায় সিরনি দেন। কিন্তু দরগায় এখনও ঐ দিন রায়চৌধুরীরা প্রথম

সিরনি দেবার পর খাদেম বা অন্তেরা সিরনি দেবার অধিকারী হন। সতেরোই শ্রাবণ বাবার চন্দনের দিনও হাজার হাজার লোকের সমাগমে তীর্থস্থানটি সরগরম হয়ে ওঠে। এখানে তখন কোন জাতিভেদ বা সম্প্রদায় ভেদ থাকে না।

দরগা শরীফ থেকে বেরিয়ে আমরা স্টেশনের দক্ষিণ কোণে 'সুদেবী নিকেতন' নামে একটা বাগানবাড়ীতে এলাম। এই বাগান বাড়ীর মালিক ছিলেন কলকাতার পাঁচ নম্বর মদন দত্ত লেনের বাসিন্দা—গৌরমোহন সেন। তিনি গাজী সাহেবের পরম ভক্ত। বাগানবাড়ীতে এলেই তিনি গাজী সাহেবের দরগায় যেতেন ও সেখানে খাদেমদের সঙ্গে গাজী সাহেবের জীবন নিয়ে আলোচনাদি করতেন। এই বাগানটিও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বাগানের ফুলগাছের পরিচর্যা করতেন। শোনা যায়, মৃত্যুর পূর্বের মহাষ্টমীর দিনে নিজ বাড়ীতে পুত্র-কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের কাছে বলেন যে তিনি শীঘ্রই মারা যাবেন এবং তাঁর মৃতদেহ যেন দাহ না করে, গাজী সাহেবের মত সমাধিস্থ করা হয়। ১৯৫৭ সালে ঈদের দিনে তিনি নিজ-বাগানে রাত্রি দশটায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রাত্রি ১-৩০ মিনিটে মারা যান। সকালেই কলকাতা থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এসে পড়ে এবং তাঁর মৃতদেহের সৎকার নিয়ে মতবিরোধ ঘটে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতে অন্যান্য অনুষ্ঠান করার পর তাঁর দেহ না পুড়িয়ে ঐ বাগানের মধ্যেই সমাধিস্থ করে তার উপর গাজী সাহেবের সমাধির অনুকরণে স্তূপ গাঁথা হয়। সেন মহাশয়ের ছেলেরা সমাধির উপর একটি মন্দির নির্মাণ সুরু করেছেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গাজী সাহেবের দরগার মত তাঁর এই হিন্দু ভক্তের সমাধিতেও বহু লোকের সমাগম হয়।

বর্ষাকালে স্বাভাবিক কারণেই যাত্রীসংখ্যা কিছুটা কম হলেও একেবারে নগণ্য নয়। ভক্তদের থাক্‌বার জন্ত বহু চটী ছাড়াও মোটামুটি ভাল বাজার, দু'একটি খাবারের দোকান ও কয়েকটি চায়ের

দোকান আছে। কিন্তু সেগুলি এত নোংরা যে সেখানে চা বা খাবার খেতে প্রবৃত্তি হলো না। স্টেশনে টি-ষ্টলে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করে বিকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরলাম।

## পাঁচ

### বারাকপুর—শ্যামনগর

আগের সপ্তাহে ঘুটিয়ারী শরীফ থেকে ফেরার সময় কল্পনার সাথে কথা হয়েছিল, গান্ধীঘাট দেখতে যাব। শ্যামবাজার থেকে ৭৮নং বাসে তালপুকুরের মোড়ে নেমে গান্ধীঘাট যাওয়া যায় কিন্তু কল্পনা বাসে যাবার চেয়ে, ট্রেনে যাওয়া বেশী পছন্দ করার জন্যে আমরা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে এসে টিটাগড় স্টেশনে নামলাম। এখানে একটা খুব বড় কাগজ তৈরীর কল আছে। জুট মিলও রয়েছে কয়েকটি। এখানে বহু দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিক আছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বি, টি, রোড পার হয়ে পশ্চিম দিকে রাসমণির ঘাটে পৌছলাম। পথের পাশে একটি মন্দির পড়ল। পূজারী দক্ষিণ-ভারতীয়। মন্দিরের দেবতা চতুর্মুখ, কিন্তু সিঁদুরে এমন ভাবে লেপা যে কার মূর্তি চেনবার উপায় নেই। মন্দির এলাকাকে স্থানীয় লোকে বলে 'বারমাস্থান'। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তেলেগু ও হিন্দিমিশ্রিত ভাষায় যে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন তার মধ্যে থেকে এইটুকুই উদ্ধার করতে পারলাম যে বিগ্রহ ব্রহ্মাদেবের এবং ধুনির আগুন ও সিঁদুর এই দুটিই তার পূজার প্রধান উপকরণ।

রাসমণি ঘাটে গঙ্গা-পারাপারের খেয়া আছে। নদীর অপর পারে কমলাকান্ত পিপলাই প্রতিষ্ঠিত মাহেশের বিখ্যাত মন্দির। রাসমণির ঘাটে একটা শিব মন্দির দেখলাম। মন্দিরটি খুব পুরান নয়, পঞ্চরত্ন

মন্দির, উচ্চতায় কিন্তু সাধারণ মন্দিরের চেয়ে বেশী। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুনলাম। কলকাতা থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গা, রাণী রাসমণির জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঙ্গায় মাছ ধরার জন্যে জেলেদের খাজনা দিতে হোত। জেলেরা দল বেঁধে এলেন রাণীর কাছে, খাজনা কমানোর দরবার করতে। দয়া পরবশ হয়ে রাণী আদেশ দিলেন, 'তার এলাকার মধ্যে মাছ ধরার জন্যে কোন জেলেকে খাজনা দিতে হবে না।' কৃতজ্ঞ জেলেরা রাণীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি বললেন, 'প্রণাম করে কেউ যেন তাকে অপরাধী না করেন। প্রণাম পাবার অধিকারী কেবল মাত্র বিশ্বের যিনি পিতা। সেই বিশ্বনাথের মন্দির তিনি গঙ্গার ধারে প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছেন। জেলেরা ইচ্ছে করলে তাকেই প্রণাম করতে পারে।' মন্দির প্রতিষ্ঠা হোল। এখনও গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম আরম্ভ হলে, সমস্ত জেলেরাই প্রথম যাত্রার দিন এই ঘাটে আসে। বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে পূজো দিয়ে জলে জাল নামায়।

রাসমণির ঘাট থেকে আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দু ফার্লং দূরে গান্ধীঘাট দেখতে গেলাম। জাতির জনকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী এই স্নানের ঘাট কিন্তু এমন জায়গায় তৈরী যে জনসাধারণ ঐ ঘাট ব্যবহার করতে পারে না। যে এলাকায় ঘাটটি তৈরি—তার তিন দিক ঘিরে রয়েছে পশ্চিমবংগ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সংরক্ষিত এলাকা। অন্যদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত। গঙ্গার ধার দিয়ে দুদিকে কাঁটা তারে ঘেরা একটি সরু রাস্তাই গান্ধীঘাটের সঙ্গে শহরের যোগসূত্র। তবে ঘাটটি বহু-ব্যবহৃত হয় নিত্য সকালে। প্রতি সকালে ঘাটের সিঁড়ির উপর দেখা যাবে বহু সংখ্যক আর্মড-পুলিশ ব্যাটেলিয়নের সিপাই সাবান দিয়ে তাদের উর্দি কাচছে। ঘাটের পথের দুধারে সরকারী উদ্যোগে তৈরী নেহেরু বাগান। পাশে, স্মৃতি-সৌধের গায়ে, কালো পাথরের উপর গান্ধীজির জীবনের বিশিষ্ট কাহিনীগুলি খোদাই করা।

নিত্য সন্ধ্যার আগেই বহুলোক এখানে বেড়াতে আসে। ঘাটে দাঁড়িয়ে বিকালে গঙ্গার অপর পারে সূর্যাস্তের দৃশ্য সত্যিই মনোরম। কিছুদিন আগে পর্যন্ত, দুপুরের দিকে, এখানে কাউকে আসতে দেখা যেত না। আজকাল বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের অনেককেই দেখা যায়, দুপুরের নির্জনতায় ঘাটের পাশের নেহেরু উদ্যানে বসে আলাপে মগ্ন।

কল্পনাকে বলছিলাম, 'এই ঘাটের সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস, তীব্র শীত, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, তারই মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক দূর দূরান্তর থেকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গার চড়ায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী এলেন। একখানি লঞ্চ থেকে গন্ধীজির চিতাভস্ম নিক্ষেপ করলেন মাঝ-গঙ্গায়। তিনি এই ঘাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। উদ্বোধক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ঘাট নির্মাণের উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, আর সম্প্রতি ভারত বিখ্যাত আর্কিটেক্ট—

আমার কথা শেষ হোলো না, পাশ থেকে একজন বৃদ্ধ সেপাই মন্তব্য করে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবু! লেকিন কোই নাহি পুঁছতা রুপিয়া কোন দিয়া। ওহি টাইমসে হামলোগকা তলব থা ষাট রুপেয়া ; হর সিপাহিকো তিন-তিন রোজকা তংখা কাট লিয়া থা সরকার গান্ধীঘাট উস্থুল করনে কা লিয়ে।'

সিপাহীজির মন্তব্যে থেমে গিয়েছিলাম। কল্পনা শুধু নিচু গলায় বলল, 'অদ্রিতলে শিলাখণ্ড দৃষ্টি অগোচরে বহে অদ্রিভার।'

গান্ধীঘাট দেখে ফিরে এলাম বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের পাশে বি, টি, রোড়ের মোড়ে। ৭৮ নম্বর বাসে চেপে এসে নামলাম ধোবীঘাট স্টপেজে। সামনেই সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিসৌধ। মঙ্গল-পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল একটা বিরাট বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে। সে বটগাছটি আজও রয়েছে আর্মড-পুলিশ

ব্যাটেলিয়নের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে, গঙ্গার ধারে। জাতীয় সরকার স্মৃতিসৌধটি তৈরী করেছেন মাত্র কয়েক বছর আগে, বড় রাস্তার ধারে। আমরা এগিয়ে গেলাম গঙ্গার ধারের দিকে।

বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট শহর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিশেষ করে রিভার সাইড রোডের মত সুন্দর পথঘাট, প্রশস্ত অঙ্গনওয়ালা ও বাগানঘেরা বাড়ী পশ্চিমবাংলার অন্য কোন শহরে বড় একটা দেখা যায় না।

আমরা হেঁটে দু-তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছলাম তের নম্বর রিভার সাইড রোডে গান্ধী-স্মারকনিধি ভবনের সামনে।

গান্ধী-স্মারকনিধি ভবন গান্ধীজির জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক আদর্শ সংগ্রহশালা। এখানে রয়েছে গান্ধীজির ব্যবহৃত বহু জিনিষ, চিত্রের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে তাঁর জীবন কাহিনী, আছে একটি সাধারণ পাঠাগার, গান্ধী-সাহিত্যের সংগ্রহ ও একটি খাদি বিক্রয় কেন্দ্র। গঙ্গার ধারে শান্তসমাহিত পরিবেশে জাতির জনকের যোগ্য স্মারক সৌধ। এই সংগ্রহশালা সরকারী ছুটির দিন ও বুধবার-গুলিতে বন্ধ থাকে (রবিবার খোলা)। বেলা বারটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

গান্ধী-স্মারকনিধি দেখে আমরা রিক্সা করে চললাম পলতা জলকল দেখতে। পথের পাশে থাকল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী ও স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির আশ্রম ও মহাবিদ্যালয়।

নাম পলতা জলকল হলেও, পলতা রেলওয়েস্টেশন থেকে এখানে আসবার কোন রাস্তা নেই; দূরত্বও অনেক। জায়গাটি বারাকপুর সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে মনিরামপুর মৌজায়। এখানে গঙ্গা থেকে জল এনে, কয়েকটা বড় বড় সেট্লিং ট্যাঙ্কে রাখা হয় এবং পাম্পের সাহায্যে, বাহাত্তর ইঞ্চি ব্যাসের বড় বড় পাইপের মাধ্যমে, টালা ট্যাঙ্কে পাঠান হয়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ত্রিরিশ

লক্ষ লোকের পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্ব বইছে এই পলতা জলকল। এতবড় জল শোধনাগার এশিয়া মহাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রায় দুই বর্গমাইল এলাকা নিয়ে পলতা জলকল। গঙ্গার ধারে একটা ঝোপের পাশে দেখলাম একদল ছেলেমেয়ে পিকনিক করতে এসেছে। শুনলাম কলকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি নিয়ে এখানে অনেকেই পিকনিক করতে আসেন।

গান্ধী-স্মারকনিধি থেকে জলকলের গেট পর্যন্ত যেতে রিক্সা ভাড়া নিয়েছিল আট আনা। ফিরবার সময়ও আট আনা ভাড়ায় আমরা গেট থেকে বারাকপুর কোর্টের কাছে পঁচাশি নম্বর বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছলাম। ৮৫ নম্বর বাস বারাকপুর থেকে ইচ্ছাপুর-শ্যামনগর-নৈহাটী হয়ে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত যায়। সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত, প্রতি আট মিনিট অন্তর এই রুটে নিয়মিত বাস ছাড়ে। যাত্রী সংখ্যা যেমন প্রচুর, তেমনি বাস-সিণ্ডিকেটের সময়নিষ্ঠা ও বাসকর্মীদের সুন্দর ব্যবহারের জন্য সুনাম আছে।

পথে বেঙ্গল-এনামেল কারখানা ও ইছাপুর রাইফেল ও মেটাল ফ্যাক্টরীর সামনে যাত্রীরা অধিকাংশ নেমে গেল। রাইফেল ফ্যাক্টরীর সামনে থেকে যাত্রী উঠলও প্রচুর। মিনিট পঁচিশেকের মধ্যে আমাদের বাস এসে থামল শ্যামনগর রেল স্টেশনের সামনে। আমরা নেমে পড়লাম।

স্টেশনের সামনে তিন-চারটি খাবারের দোকান, চায়ের দোকানও রয়েছে কয়েকটি। কল্পনা আমাকে টেনে নিয়ে ঢুকল একটি দোকানে।

'কী লোক আপনি, খালি টো-টো করে ঘুরছেন। খিদে-তেষ্টা নেই? আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ—'

অতএব চা খেতে হোল। ভালই লাগল।

সঙ্গী নয়, সঙ্গিনী। ঠিক করলাম, এবার থেকে সঙ্গিনীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা স্মরণ রাখতে হবে।

বাস্তবিক, বেড়াতে বেরিয়েছি বলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিহার করা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়।

চা-পানের পর, দেখতে গেলাম ব্রহ্মময়ী কালিকা-মন্দির। স্টেশন থেকে মাত্র এক মিনিটের পথ। গঙ্গাতীরে রাজা গোপীনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কালিকা, দ্বাদশ শিব ও শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। রাজারাম ঠাকুরের দুই ছেলে— দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও নিলমণি ঠাকুর। রাজা গোপীমোহন ঠাকুর হলেন দর্পনারায়ণের বংশধর। নিলমণি ঠাকুরের বংশধর হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজা গোপীমোহন ছিলেন শক্তি-উপাসক। প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশধরেরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

শ্যামনগরের কালিকা মন্দিরে, পৌষে একমাস ব্যাপী মেলা হয়। এই সময়ে যে সব ভক্ত ব্রহ্মময়ী দর্শনে আসেন, তাদের জোড়া-মূলা দিয়ে মায়ের পূজা দিতে দেখা যায়। জোড়া-মূলা দিয়ে কালীপূজা দেওয়ার কারণ কি, কেউ বলতে পারলেন না। প্রথাটি বহুদিন থেকে চলে আসছে। একজন বললেন, এই 'মন্দিরটি যেখানে রয়েছে, এটি মূলাজোড় মৌজায়। হয়ত, মূলাজোড় মৌজার মাকে পূজা দেবেন বলে কোন খেয়ালী ভক্তের খেয়াল হয়েছিল, পূজার উপকরণের সাথে এক জোড়া মূলো দিয়েছিলেন। সেই থেকেই এই প্রথা চলে আসছে।' আমাদের দেশের বহু প্রথার জন্মই তো এই ভাবে।

ব্রহ্মময়ী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ কম না। এক মাস ধরে মেলার সময় ঘর-ভাড়া ও মায়ের পূজার আয়ও খুব কম হয় না। কিন্তু পূজার মন্দিরের ও মন্দির-সংলগ্ন বাগানের একসময় যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল এখন তার কিছুই নেই। জাঁকজমক দূরে থাক, নাটমন্দির ভেঙ্গে পড়েছে, সারানোর চেষ্টা নেই। মায়ের বাড়ীর জাঁকজমক যেমন কমে আসছে, মন্দির কমিটির ম্যানেজারের বাড়ীর জাঁকজমক সেই পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

মন্দিরের উত্তরদিকে একটি ভাঙ্গা বড় দোতলা দালান। এটি মূলাজোড় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। বর্তমানে একরকম বন্ধ হয়ে গেছে

বলা যায়। এক সময় বিখ্যাত পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এরই পাশে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তার জীবনের শেষ অধ্যায় কাটিয়েছেন।

মন্দিরের বারান্দায় এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। তার মুখে কাহিনী শুনলাম: "বর্গীর হাঙ্গামার সময়, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বর্ধমানের মহারাজা বর্গীর আক্রমণের ভয়ে নিজ পরিবারের মেয়েদের ও দুইটি বিগ্রহ, শ্যামকিশোর এবং রাধাকান্তজীকে বর্ধমান থেকে সরিয়ে দেন গঙ্গার পুব পারে। কাউগাছি মৌজায় বর্ধমানের মহারাজা একটি গড়-বেষ্টিত প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং সেইখানে এদের রাখেন নিরাপত্তার জন্যে। ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর পরিবারের লোকজন বর্ধমান ফিরে গেলেন! মহারাজ নিজ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্যামকিশোরের পূজার জন্য পুরোহিতকে ট্রাস্টী করে কাউগাছির এক অংশ ও মূলাজোড় মৌজা দেবোত্তর সম্পত্তি করে দিলেন। তৌজি নং ৩৯-বি, আই অনুসারে কাউগাছির ঐ অংশের নামকরণ হল, শ্যামকিশোরের নাম অনুসারে গড় শ্যামনগর। পরবর্তী কালে সমস্ত অঞ্চলের এমনকি রেল স্টেশনটির নামও শ্যামকিশোরের নাম অনুসারে হয়েছে শ্যামনগর।

১৮০৮ খৃস্টাব্দে রাজা গোপীমোহন ঠাকুর, শ্যামকিশোরের দেবোত্তর জমিদারীর বৃহত্তর অংশ কিনে নেন দেবী ব্রহ্মময়ী কালিকার নামে এবং গঙ্গাতীরে ব্রহ্মময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্যামকিশোরের মন্দির খুঁজে বের করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হোল। যে শ্যামকিশোরের নামে সহরটির নামকরণ করা হয়েছে তাঁর খোঁজ শ্যামনগরবাসীদের অনেকেই রাখেন না। শ্যামকিশোরের সমস্ত সম্পত্তি ও দেবোত্তর জমিদারী পূজারীবংশ বিক্রি করে মদ ও মেয়েমানুষের পিছনে ঢেলে নিঃশেষ করেছে। পূজারী বংশও প্রায় বিলুপ্ত। খুঁজতে খুঁজতে শ্যামকিশোরকে একরকম আবিষ্কার করলামই বলা যায়। শ্যামনগর স্টেশনের গজ পঞ্চাশেক দক্ষিণে,

বি, টি, রোডের পশ্চিম পাশে একটা ভাঙ্গা গুমটি-ঘরে খুঁজে পেলাম শ্যামকিশোর, রাধাকান্তজী ও তাঁদের বর্তমান পূজারীকে।

গঙ্গাচরণ অধিকারী নামে পূজারী বংশের শেষ সলতে এক অর্ধ-উন্মাদ। সংসারে তার এই দুই বিগ্রহ ভিন্ন কেউ নেই। ভাঙ্গা গুমটি ঘরটির দৈর্ঘ, প্রস্থ কোন দিকই ফুট আষ্টেকের বেশী হবে না। দরজা আধভাঙ্গা, পাল্লাবিহীন জানালায় ছেঁড়া চট ঝুলছে। ঘরের মেঝেতে একটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে গঙ্গাচরণ শুয়ে আছেন। ঘরের কোণে দুটি কালপাথরের বিগ্রহ, শ্যামকিশোর ও রাধাকান্তজীর ও একটি অষ্টধাতুর কিশোরী মূর্তি। শুনলাম, রাধাকান্তজীর অষ্টধাতু নির্মিত রাধারাণী মূর্তি ও বাসনপত্র যা-কিছু ছিল বছর দুয়েক আগে চুরি হয়েছে। মূর্তির সামনে এক টুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজের উপর চারখানা বাতাস রাখা আছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, অন্যদিন ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল ফুটিয়ে, কলা পাতায় করে গঙ্গাচরণ ঠাকুরের ভোগ দেন ও সেই প্রসাদে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। জ্বরে দুদিন ভিক্ষায় বেরোতে পারেননি, তাই ভক্ত ও ভগবানের উপবাস চলছে। সকালের দিকে পাড়ার একটা ছেলে গুমটির দিকে এসেছিল তাকে দিয়ে পাঁচ পয়সার বাতাসা এনে ঠাকুরকে দিয়েছেন।

কল্পনা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'শ্যামকিশোর, মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করেও তোমার সাধ মেটেনি, নিজের ভাগ্য নিয়েও খেলা করছ। যাঁর জমিদারীর অধিনস্থ প্রজা রাজা গোপীমোহন ঠাকুর, যাঁর নামে এত বড় শহর শ্যামনগর, যাঁর ভিটে-বাড়ীর প্রজা এখনও অন্ততঃ বিশ জন লক্ষপতি শ্যামনগরে বাস করছে, যাঁর কাছ থেকে একটু জমি ভিক্ষা করে এটর্নি চারুচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষেরা সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন, যার জমিতে প্রতিষ্ঠিত মূলাজোড় পাওয়ার হাউস সারা কলকাতাকে বিজলী বাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করে রেখেছে, তাঁর আজ এই দশা!'

সন্ধ্যা হয়ে এল। শ্যামনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৮৫ পয়সার

টিকিট কেটে শিয়ালদাগামী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধ্যার পর শিয়ালদাগামী ট্রেনে ভীড় ছিল না। দুজনে পাশপাশি বসে ছিলাম। কল্পনা একটানা গল্প করে যাচ্ছিল। হেসে উঠছিল মাঝে মাঝে। সারা কামরা সচকিত হয়ে তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। বাস্তবিক, তার হাসিটি ভারি মিষ্টি। জলতরঙ্গ যেন। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, কল্পনা নিশ্চয় গান গাইতে জানে।

এই হাসি আর গল্পের বিষয়বস্তু হোল, সে কোথায় কি নতুন জিনিস দেখেছে, কোন মন্দিরের সম্পর্কে কি অদ্ভুত কিম্বদন্তী শুনেছে, এই সব।

আমি সায় দিচ্ছিলাম, আর অবকাশ মতো চেষ্টা করছিলাম, ওর অতীত জীবনের রহস্য জেনে নেওয়ার।

সেদিকে কল্পনা খুব সচেতন। শামুক স্বভাব। হাসি গল্পে উচ্ছল বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু অমনি শামুকের মত গুটিয়ে ফেলা। অদ্ভুত দ্রুততায় প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। কয়েকবার চেষ্টা করে শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিলাম: ওর বাবা ছিলেন খুলনার টাউনক্লাবের একদা বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়, খেলার জন্যই রেলে তাঁর জুটেছিল ভাল চাকরী। জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে। কল্পনা যখন বি. এ পড়তে কলেজে ভর্তি হয় তখন তিনি মারা যান। তারপর খানিকটা এলোমেলো জীবন। বর্তমানে ভাড়াবাড়ি, যার ঠিকানা সেদিন সে দিয়েছিল।

কিন্তু এহ বাহ্য। আগে আরো কিছু আছে। সেটা কি?

## ছয়

### হালিসহর—নৈহাটি

ট্রেন শিয়ালদার কাছাকাছি গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'মাকে কদিন আগে চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে শুনেছিলাম :

'প্রভু কহে কুমার হট্টেরে নমস্কার
যেথায় ঈশ্বরপুরী প্রভু অবতার।

'কোথায় সেই কুমারহট্ট' যে গ্রামকে স্বয়ং মহাপ্রভু প্রণাম জানিয়েছেন। সেই পবিত্র তীর্থ দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে বড়, যাবেন একদিন ?'

বললাম, 'যাব।'

বর্তমান জেলা চব্বিশপরগণার উত্তর প্রান্তের হালিসহরেরই পাঠান রাজত্বকালে নাম ছিল, কুমারহট্ট। মুসলমান আমলে নাম হোল হাবেলী সহর (হাবেলী শব্দের অর্থ প্রাসাদ) এবং পরবর্তী কালে হাবেলীসহরের অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালিসহর।

পরের রবিবারেই কলকাতা থেকে ট্রেনে যাত্রা করেছিলাম। যদিও হালিসহর নামে রেল স্টেশন আছে, সেখান থেকে গঙ্গাতীরের শহরের দূরত্ব অন্ততঃ তিন মাইল, যাতায়াতের যানবাহনের সুবিধা কম। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলাম নৈহাটী রেলওয়ে স্টেশনে। নৈহাটী স্টেশনের সামনে থেকেই ৮৫-নম্বর বাসে চেপে আমরা গেলাম হালিসহর ফাঁড়ির কাছে। ফাঁড়ির মোড় থেকে পুব দিকে মিনিট পাঁচেকের পথ রামপ্রসাদের ভিটে। এইখানে ছিল সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের পর্ণকুটির। তার বাড়ীর সামনের প্রাচীন বটগাছটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথায় সেই ভক্ত রামপ্রসাদ, যাঁর ডাকে মেয়ের বেশে এসে ভাঙ্গা ঘরের বেড়া বেঁধেছিলেন স্বয়ং কালিকা মাতা।

পরিবেশ পাল্‌টেছে। ভাঙ্গা খড়ের চালা কবে নষ্ট হয়েছে। সেখানে একালের অর্থশালী ধনী ভক্তদের আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে পাকা নাটমন্দির সমেত মন্দির। জঙ্গলে ঢাকা গঙ্গাতীরের কুমারহট্ট গ্রাম এখন শিল্পাঞ্চলের হালিসহর মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত। তবুও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হোল যেন বটগাছে ঢাকা জায়গাটির কি এক সম্মোহিনী শক্তি আছে, যার টানে এখনও প্রতি শনি-মঙ্গলবারে শত শত ভক্ত এখানে ছুটে আসে। মন হয়ে ওঠে উদাসী।

রামপ্রসাদের ভিটে থেকে হেঁটেই চললাম নিগমানন্দ আশ্রমে। দূরত্ব আধমাইলেরও বেশী। কল্পনা মুখে কিছু না বললেও মনে হোল রিক্‌সায় গেলে ও যেন বেশী খুশী হত।

শান্ত সমাহিত ভাবগম্ভীর আশ্রমিক পরিবেশ। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে মর্মর পাথরে গড়া মন্দির। প্রার্থনা-গৃহের শ্বেতপাথরের মেঝের উপর বসে, দুপুরের রোদে হেঁটে আসার ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হোল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখছিলাম। আশ্রমের স্বামীজীরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। আমাদের দিকে কেউই যেন দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করছেন না। কিন্তু যেইমাত্র কল্পনা জুতো পরে একটা বিশেষ এলাকায় প্রবেশ করছে, অমনি এক স্বামীজী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পাশে দেওয়ালে লেখা নির্দেশের দিকে: 'জুতো খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করুন।'

আশ্রমের চারিদিকেই বহুপ্রকার নির্দেশ ও উপদেশ লেখা রয়েছে।

নিগমানন্দ আশ্রমের উত্তর দিকে মিনিট দুয়েকের পথ গেলেই 'চৈতন্য ডোবা'। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসেরও আদি বাড়ী ছিল এইখানে ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটার পাশেই। পরে শ্রীবাস বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপ-বাসী হন। এই—'হালিসহর নতি গ্রামে নারায়ণী সুত।

দাস বৃন্দাবন নামে জগতে বিদিত...'

প্রবাদ, মহাপ্রভু নীলাচল যাবার পথে গুরুগৃহের আঙিনা থেকে এক মুষ্টি মাটি তুলে চাদরের কোণে বেঁধে নেন। উদ্দেশ্য ঐ মাটি দিয়ে তিলক সেবা করবেন, মহাপ্রভুর দেখাদেখি শত শত ভক্তের দল সেখান থেকে মাটি তুলে নিতে লাগল; ফলে একটি বিরাট গর্ত তৈরী হোল, ঐ গর্ত বা ডোবা 'চৈতন্য ডোবা' নামে খ্যাত। চৈতন্য-ডোবার জল বৈষ্ণব ভক্তের কাছে অতি পবিত্র। এখনও যে কোন বৈষ্ণব-ভক্ত এখানে এলেই পুকুরের খানিকটা মাটি নিয়ে যাবেই তিলক-সেবা করার জন্য।

পরবর্তীকালে ভক্তেরা এখানে মহাপ্রভুর মন্দির তৈরী করে তাতে গৌর-নিতাই-এর পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর আগে ঐ পাথরের বিগ্রহ ছুটি চুরি হয়েছে। বর্তমান যুগল বিগ্রহ মাটির।

চৈতন্য-ডোবা থেকে বাসে করে আমরা সোজা নৈহাটি ফিরলাম। স্টেশনের কাছে নেমে রেল লাইনের পূর্বপারে সামান্য একটু দূরেই, সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বংকিমচন্দ্রের বাড়ী। চারিদিকে রেলওয়ে কোয়াটার্স। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নৈহাটী রেলওয়ে ইয়ার্ড সম্প্রসারণের জন্য বহু জমি রেলওয়ে হুকুম দখল করে। বংকিমচন্দ্রের বাড়ী, রাধাবল্লভজীর মন্দির ও তারই সংলগ্ন কিছুটা জমি জাতীয় সম্পত্তির মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা ক'রে রেলওয়ে দখল করেনি।

হালিসহর থেকে ফিরতে ফিরতে চারটে বেজে গিয়েছিল। বংকিম-ভবনে পৌঁছে দেখি বংকিমচন্দ্র সংগ্রহশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুনলাম, বুধবার সংগ্রহশালা বন্ধ থাকে। অন্যান্য দিন বেলা ১২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত সংগ্রহশালা খোলা। পাশের এক ভদ্রলোক বললেন, 'রাধাবল্লভ মন্দির সংলগ্ন বাড়ীতে সংগ্রহশালার রক্ষণা-বেক্ষণকারী থাকেন, তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি এসে সংগ্রহশালা খুলে দিলেন।

সংগ্রহশালার সংগ্রহের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও তুচ্ছ নয়।

বংকিমচন্দ্রের ব্যবহৃত পাগড়ী, শাল প্রভৃতি রয়েছে, বংকিমচন্দ্রের নিজের হাতে লেখা উইলগুলি এখানে সযত্নে রাখা আছে। সংগ্রহশালার ঘরটিতেই বসে বংকিমচন্দ্র তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজীর অধিকাংশ লিখেছিলেন, এই বংকিমভবনে এক সময়ে প্রভাকর ছাপাখানা ছিল, আজ সেটি একটা ভাঙা ইঁটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। পাশের ভাঙা ইঁটের স্তূপটি দেখিয়ে একজন বললেন, 'ঐখানে ছিল চাটুজ্যেদের বিখ্যাত দুর্গামণ্ডপ, বংকিমচন্দ্র দেশ ও দুর্গাকে এক করে দেখেছিলেন, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী'—ঐখানে বসে।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল। শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনি রাধাবল্লভের আরতিবার্তা ঘোষণা করল। আমরাও ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ৺রঘুদেব ঘোষাল। ইনি বংকিমচন্দ্রের পিতামহের মাতামহ। নৈহাটীর জনসাধারণ রাধাবল্লভকে পুরদেবতা বলে মনে করে। কষ্টিপাথরে গড়া রাধাবল্লভ ও শ্বেতজয়পুরী পাথরের বলরাম বিগ্রহ জীবন্ত মূর্তি বলে মনে হয়। বংকিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময় থেকে রাধাবল্লভের রথযাত্রা হচ্ছে। রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে প্রায় এক পক্ষকাল মেলা হয়।

রাত্রি বেড়ে যাচ্ছিল। কল্পনাকে যেতে হবে অনেকখানি পথ। তার তরফ থেকে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না পেলেও আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বুঝতে পারছিলাম, সব দেখা ও শোনা একদিনে সম্ভব নয়। অতএব ফিরতে হোলো। ট্রেন ধরলাম নৈহাটী স্টেশনে এসে। তবে ক্ষোভ থেকে গেল মনে, একই দিনের মধ্যে নৈহাটী ও হালিসহর দেখা শেষ করার জন্য সবকিছু ভালভাবে দেখা হল না। হালিসহরের খাণ্ডী, বারেন্দ্রগলির প্রাচীন মন্দির সময়াভাবে দেখা হয়নি। দেখা হোল না নৈহাটীর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ী। ভাটপাড়ার বিখ্যাত মন্দিরগুলি।

হিসাবে ভুল হয়েছে। প্রোগ্রাম হওয়া উচিত ছিল : একদিন নৈহাটী ও ভাটপাড়া এবং আর একদিন কুমারহট্ট বা হালিসহর। তাহলে ভালো হোত।

## সাত

**আড়ংঘাটা**

ফেরার পথে কল্পনা কি যেন চিন্তা করছিল। আগের দিনের মত অকারণে হাসি বা গল্প নয়। প্রথমে বললে, 'আজ ফিরতে রাত হয়ে যাবে। মা বসে বসে ভাববে।' পরে বললে, 'এই যে আমি বেড়াতে বেরোই, মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সঙ্গে কে থাকে? আমি বলেছি, 'মেজদা'। মা তো অবাক। আমার কোন সহোদর-ভাই নেই, মেজদা এল কোথা থেকে? তার মনের কথা বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেলে বললাম, উনি সবার মেজদা, তাই আমারও মেজদা। ভারি সুন্দর মানুষ।' মা বললেন, 'তাহলে চল্ তোর মেজদার সঙ্গে একদিন শান্তিপুর ঘুরে আসি। আমার বড় ইচ্ছে শান্তিপুর দেখি—'

চুপ করে শুনছিলাম কল্পনার কথা। সে আবার বললে, 'যাবেন'?

বললাম, 'এখনই বলতে পারছি না। তোমার সঙ্গে প্রত্যেক ছুটির দিন বেরই বলে আমার প্রতিবেশী বন্ধুরা খুঁজতে এসে বাড়ীতে আমাকে পাচ্ছে না। ওদের সঙ্গে দিনকতক ঘোরা দরকার। বরং তুমি বিশ্রাম নাও কিছুদিন, পরে একসময় শান্তিপুর কিংবা অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিও—'

কল্পনা খুশী হোল কিনা জানি না, এমনিতেই মুখ ভার, সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। সারাপথ আর একটিও কথা বললে না।

ওকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।

যা ভেবেছিলাম, তাই। বন্ধুমহলে উষ্মা জমেছে বুঝতে পারছিলুম, প্রকাশ পেল পরদিন বিকেলে।

পরদিনই বিকেলবেলায় সাত-আট জন এসে হাজির। তাদের অভিযোগ, গত দু-মাস যাবৎ ছুটির দিনে আমি কেন আড্ডায় গরহাজির। মৃণ্ময় বললে, 'বেড়াতে যাবার কথায় তুমি সর্বদা দু'পায়ে খাড়া। আমার ভাইকে দিয়ে খবর পাঠালুম, শুনলাম তুমি বাড়ী নেই। অগত্যা আমরা দু'বন্ধু যুগলকিশোর দেখে এলাম।'

'যুগলকিশোর? কোথায় দেখলে?'

মৃণ্ময় বললে, 'আড়ংঘাটা—'

'তুমি আর কে?'

সে এক বন্ধুর নাম করল।

'কি কি দেখলে?'

মৃণ্ময় আরবান ব্যাঙ্কে কাজ করে, ভাল বক্তা। বলতে লাগল:

'দর্শনং যুগলং জৈষ্ঠ্যে ধনায়ুস্য বিবর্দ্ধনম।
কলৌ তপঃ ইদং ভাবং যজ্ঞ দান ফলং লভেৎ।

জৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোর দর্শন করলে ধনবৃদ্ধি, আয়ুবৃদ্ধি হয়; তপস্যার দানযজ্ঞের ফললাভ ঘটে। অথচ বহুদিন জৈষ্ঠ পেরিয়ে গেছে এখন কার্তিক মাস—

মৃণ্ময় বলছিল: 'আপনাকে খোঁজ করছিলাম, কিন্তু আপনি নেই পাত্তা। অনুরোধ জানিয়েছিলাম আর এক বন্ধুকে, তখন তিনি যেতে রাজী হন না। তিনি শান্তিপ্রিয় কবিমানুষ। জৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর মন্দিরের সামনে একমাস ধরে মেলা হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। মন্দির ও চুর্ণী নদীর তীর সবসময়ে কোলাহলমুখর হয়ে থাকে। সে সময়ে না হবে শান্তিতে দেবদর্শন, না হবে তৃপ্তির সাথে চুর্ণী নদীর তীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ।

শনিবার হঠাৎ বন্ধুবরের তাগাদা এলো, তিনি যুগলকিশোর দেখতে যাবেন। রবিবার সাতটা পঁচিশ মিনিটের সময় শিয়ালদা থেকে গেদে লোকাল ট্রেনে চেপে বেলা সাড়ে ন'টার কিছু পরে আড়ংঘাটা স্টেশনে পৌছলাম। কলকাতা থেকে দূরত্ব বিরাশি কিলো-মিটার। আড়ংঘাটা থেকে বাংলাদেশের যশোর-সীমান্ত মাত্র ছ'মাইল।

স্টেশনে নেমে মিনিট চার-পাঁচের পথ পশ্চিম দিকে গেলে, চুর্নী নদীর প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। ঘাটের উপরেই মন্দির। জ্যৈষ্ঠ মাসের মেলার ভীড় এড়ানোর জন্যে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু মন্দিরের কাছে এসে ভক্ত ও পুণ্যার্থীর কোলাহল দেখে বন্ধুবর হতাশ হলেন। শুনলাম, সেদিন অন্নকুট উৎসব। বন্ধুবরকে বললাম, 'তুমি প্রকৃতি-প্রেমিক, তুমি এটাকে দুর্ভাগ্য বলে ভাবতে পার। কিন্তু ভোজন রসিক আমি, অন্নকূট উৎসব আমার বেলায় পরম সৌভাগ্য। আজ প্রসাদ পেতে কোন অসুবিধা হবে না'

একজন ভক্তের মুখে শুনলাম, যুগলকিশোরের প্রতিদিন পাঁচ বার পূজা, আরতি ও ভোগ-রাগের ব্যবস্থা আছে। নিশা শেষ থেকে রাত্রি চার দণ্ড পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। কেবল দুপুরে ভোগা-রতির পর এক দণ্ড (২৪ মিনিট) মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। পাঁচবার নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছাড়া বার মাসই যুগলকিশোরের বিশেষ পর্বানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। তিনি কাব্য ছন্দে শোনালেন:

'বৈশাখেতে ফলদান জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা।
আষাঢ়েতে রথযাত্রা শ্রাবণেতে ঝুলা॥
ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ফাল্গুনেতে দোল।
কার্তিকেতে অন্নকুট আনন্দবহুল॥
আশ্বিনেতে মহা পূজা কি দিব তুলনা।
যে দেখেছে সে মজেছে আর ভক্ত জনা॥
শ্রীরাস পূর্ণিমা হবে অগ্রহায়ণ এলে।
আকাশেতে দীপ জ্বালা প্রতি সন্ধ্যাকালে॥

পৌষের সংক্রান্তি দিনে তিল পর্ব হয়
মাঘের পঞ্চমী সারি ফাল্গুন উদয় ॥
শ্রীরাম নবমী হয় চৈত্র মাস এলে।
এইতো বিশেষ পর্ব শুনুন সকলে ॥

ভক্তমুখে যুগলকিশোরের কাহিনী শুনলাম :

'আজ থেকে তিন'শ বছর আগের ঘটনা, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্বামী শুকদেব দাস ছিলেন বর্ধমান রাজগঞ্জ মন্দিরের সেবাইত। তাঁর শিষ্য ৺গঙ্গারাম দাস বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী গোবিন্দ মন্দিরের সেবা পূজা দর্শন করে তাঁর মনেও গোবিন্দ সেবার বাসনা জাগে। একদিন রাত্রে গঙ্গারাম স্বপ্ন দেখলেন বৃন্দাবনের কিশোর তাঁকে বলছেন, 'গঙ্গারাম, আমি বহুদিন যাবৎ কেশী ঘাটের কাছে যমুনার জলে পড়ে আছি, আমাকে তুলে নিয়ে সেবা পূজা কর, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

গঙ্গারাম স্বপ্নাদিষ্ট জায়গায় গিয়ে যমুনার জলের মধ্যে শ্রীবিগ্রহ পান। মূর্তি নিয়ে গঙ্গারাম ফিরলেন দেশে। নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে স্থাপন করলেন শ্রীবিগ্রহ। আরম্ভ হোল বর্গীর হাঙ্গামা। ভয়ে গঙ্গারাম বিগ্রহ নিয়ে পালিয়ে এলেন ভাগীরথীর পূর্বপারে। কয়েকদিন শান্তিপুর ও উলায় ( বর্তমান নাম বীরনগর ) কাটিয়ে চুর্নী পার হয়ে পূর্ববঙ্গের দিকে এগোবেন বলে মনস্থির করলেন। তখন চুর্নীর পূর্ব পাড়ে বর্তমান আড়ংঘাটার কাছাকাছি কোন গ্রাম ছিলনা বললেই চলে। নদীর ধারে জঙ্গল কেটে নতুন চাষ-আবাদ সুরু করেছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কয়েকজন ভুঁইহার সিপাহী। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সিপাই ছিলেন। নাম, রামপ্রসাদ পাঁড়ে; পরম বৈষ্ণব। তাঁর বাড়ীতে ছিল তার গৃহদেবতা গোপীনাথ। শ্রীবিগ্রহ কাঁধে গঙ্গারাম দুপুর বেলায় এসে পৌছলেন পাঁড়ে-বাড়ীর সামনে। বিশ্রাম করতে বসলেন এক বকুল তলায়। গঙ্গারাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে তাকে কয়েকদিন থাকতে হোলো

রামপ্রসাদ পাঁড়ের বাড়ীতে। রামপ্রসাদ পাঁড়ের আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টায় গঙ্গারাম একটা নতুন চালা তৈরী করে সেখানে কিশোর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ী হলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবগৃহ নির্মাণ ও দেবসেবার জন্য গঙ্গারামকে ষোল বিঘা জমি দান করলেন।

কিছুদিন এইভাবে সেবা পূজা চলল। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হলেন, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর এক প্রাচীন ভাঙা দেওয়ালের নীচে একটি রাধিকা বিগ্রহ রয়েছে। পর দিনই মহারাজ ভাঙা দেওয়াল খনন করলেন। বিগ্রহ পাওয়া গেল। মহারাজা নিজে মূর্তি উঠিয়ে এনে বজরায় করে চূর্ণী নদীর ঘাটে এসে নেমে গেলেন গঙ্গারামের কাছে। মহাসমারোহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে অভিষেক করিয়ে শ্রীরাধিকা মূর্তি গঙ্গারামের হাতে অর্পণ করলেন। সে দিন ছিল বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি। বর্তমান মন্দিরের সামনের বকুলতলায় মহা আড়ম্বরের সাথে কিশোর-কিশোরীর মিলন উৎসব করা হোল। এই সময় থেকে বিগ্রহের নাম হল যুগলকিশোর।

এই যুগলমিলনের আনন্দ উৎসব পালনের জন্য মহারাজ জ্যৈষ্ঠমাস ব্যাপী মেলা বা আড়ংয়ের ( পূর্ববঙ্গে মেলাকে বলে আড়ং ) ব্যবস্থা করেন। যে ঘাটে এসে মহারাজ কিশোরী মূর্তি নিয়ে নেমেছিলেন, চূর্ণীর সেই ঘাট তিনি বাঁধিয়ে দেন। যুগলকিশোরের মিলনের যৌতুক-স্বরূপ সেবাইতকে একশ বিঘার লাখেরাজ সম্পত্তির দানপত্র অর্পণ করেন। সেই সময় থেকে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে একমাস মেলা হয়। মিলন-উৎসবের দিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দু'খানি সুসজ্জিত বরণ ডালা দিয়ে শ্রীবিগ্রহ দুইটিকে বরণ ও প্রণাম করেন।

প্রবাদ, মন্দিরে যে বরণ ডালা রাখা আছে সেই বরণডালা মাথায় নিয়ে শ্রীবিগ্রহের কাছে যে কোন কামনা জানালে সেই কামনা সিদ্ধ হয়।

দেখলাম, বহু ভক্ত একটাকা প্রণামী দিয়ে মন্দিরের বরণডালা

মাথায় করে দেবতাকে প্রণাম জানাচ্ছে। যে বকুল গাছের তলায় যুগল-মিলন হয়েছিল, সে গাছটি আজও সতেজ আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে শত শত ভক্ত যুগলকিশোরের কাছে কামনা জানিয়ে বকুল গাছে ঢেলা বেঁধে দিয়ে যায়। আশা পূরণ হলে আবার তারা আসে, পূজা দেয়, ও ঢেলা খুলে দিয়ে যায়।

যুগলকিশোর মন্দির পাঁচ খিলানওয়ালা দালান। মন্দির পূর্ব-মুখী। সর্বদক্ষিণের খিলানের সামনে সিংহাসনে ৺রামপ্রসাদ পাঁড়ে পূজিত গোপীনাথ বিগ্রহ। দ্বিতীয় দরজার সামনে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ। মাঝের দরজায় যুগলকিশোর। চতুর্থ দরজার সামনে শ্রীশ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ। পঞ্চম দরজায় শ্যামচাঁদ বিগ্রহ। কালাচাঁদ বিগ্রহের পাশে কোন রাধিকা মূর্তি নেই। ইনি চিরদিনই একক বিগ্রহ। অন্যান্য চারটিই যুগলমূর্তি।

মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটি 'চরণ পাদুকা গৃহ' নামে পরিচিতি। এই ঘরে গঙ্গারাম দাস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত সেবাইত ও মোহান্ত ৺যুগলকিশোরের সেবা-পূজা করেছেন, তাদের সকলের ব্যবহৃত খড়ম রাখা আছে। এদের নিত্য পূজারও ব্যবস্থা আছে। বকুল গাছের তলায় বিশাল একখানি শিলা ষষ্ঠীদেবী নামে পরিচিত। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দোতলা ঘরে রয়েছেন সাবিত্রী মাতা। মন্দিরের মধ্যে এই সমস্ত বিগ্রহ ছাড়াও চুর্ণী নদীর বাঁধান ঘাটের পাশে রয়েছে যুগলেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

উৎসবের দিনে চুর্ণীর বাঁধা ঘাট স্নানার্থীর কোলাহলে মুখর। নদীর অপর পারে দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেতের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল যেন সবুজ সাগরে ঢেউ উঠেছে। শরতের পূর্ণ-যৌবনা চুর্ণী কানায় কানায় ভরে রয়েছে। তার স্বচ্ছ হৃদয়ের মাঝে, তিন হাত নিচের মাছের পাখনাটা গোনা যায়। উৎসবের দিন ছাড়া অন্য কোন দিন এলে ভ্রমণার্থীর মন গ্রাম বাংলার ছোট নদীর পাড়ের রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারবে না।

দেশ-বিভাগের আগে যুগলকিশোর মন্দিরের আয় যে কোন মাঝারি জমিদারী স্টেটের চেয়ে কম ছিলনা। এখন সেই অবস্থা পড়ে গেলেও, মন্দিরের মোহান্তদের আয় খুব কম নেই। কিন্তু বহুদিন আগে তৈরী যে মন্দির-সংলগ্ন যাত্রীনিবাস, সেটি সংস্কার অভাবে বাসের অযোগ্য। এখানে যাত্রী বা ভ্রমণার্থীদের থাকবার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। স্টেশনের কাছে একটি মাত্র পাইস হোটেল। কিন্তু একসঙ্গে দশ বার জন খদ্দের হলে আগে থেকে না জানালে তাদের হাঁড়িতে টান পড়ে। খাবারের দোকান গোটা কয়েক আছে, কিন্তু তাদের দাম ও খাবারের গুণ সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল।

একটি দোকানে বসেছিলাম চা খেতে। দোকানের মালিক অল্প-বয়স্ক যুবক, কথাবার্তায় বুঝলাম, বেশ শিক্ষিত এবং মার্জিত, আড়ং-ঘাটাতেই বাড়ী। কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আড়ং-ঘাটায় বেড়াতে আসবার উপযুক্ত সময় কখন? তাতে সে মত প্রকাশ করল: আড়ংঘাটা আসা উচিত তিন রকম ভ্রমণার্থীর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। যাঁরা পুণ্যার্থী তাদের উপযুক্ত দিন, যুগলকিশোরের পর্বানুষ্ঠানের দিনগুলি। যাঁরা প্রকৃতিপ্রেমিক তাদের আসা উচিৎ ভাদ্র মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন দিন। শুধু বাদ দেবেন জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব ও অন্নকূটের তারিখটি। ভাদ্র মাসের ভরা চূর্ণীর শোভা নির্জন বাঁধাঘাটে বসে যদি দেখা যায় তাহলে আশা মিটবে না, কার্তিক মাসে এলে, খেয়া পার হয়ে চূর্ণীর ওপারে শ্যামল ধানক্ষেতের যে শোভা তার তুলনা নেই। আর যাঁরা অনেকে মিলে একটা দিন আনন্দ-মুখর করে তুলতে চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত শীতকালের উৎসব ব্যতীত যে কোন দিন। চূর্ণীতে স্নান, সাঁতার কাটা, আড়ংঘাটার হাটের নতুন খেজুর গুড়ের পাটালি সহযোগে নতুন ধানের চিঁড়ে দিয়ে জলযোগ কিম্বা নির্জন চূর্ণীর ধারে উপযুক্ত পিকনিকের ব্যবস্থার কোন তুলনা

হয় না। গ্রাম্য পরিবেশে পূণ্যতোয়া চূর্ণীর ধারে বেড়ান, মন্দির দর্শন করে দিনান্তে ঘরে ফেরা, স্মৃতির মণিকোঠায় এক অক্ষয় রত্ন হয়ে থাকবে।

বিদায় নেবার সময় দোকানি হেসে বললেন, 'এবার রেলের টাইম টেবল অনুযায়ী গাড়ী আসবার সময় হোল। এ লাইনের গাড়ী আসে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে গেদে সীমান্ত থেকে, কিন্তু যদি গাড়ী সাড়ে তিন ঘণ্টা লেটেও আসে, তবুও মনে করবেন আপনি ভাগ্যবান।'

## আট

### গুপ্তিপাড়া

মৃন্ময়ের কাহিনী শেষ হওয়া মাত্র সজল সেন বলল, বাজে কথায় সময় নষ্ট করে কাজ নেই। আমরা বার-ইয়ার যখন জুটেছি, আগামী রবিবার বার-ইয়ারীর (বারোয়ারী পূজার) জন্মভূমি গুপ্তিপাড়ায় বেড়াতে যেতে হবে।'

বিষ্ণুদা বললেন, 'তোমার প্রোগ্রাম কোন কারণেই যেন ফল না করে। তবে ব্যাপার হচ্ছে সেকালের (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে), বিজয়রাম সেন গুপ্তিপাড়ায় গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীতে বেদধ্বনির মাঝে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। মনে আছে তো, তীর্থ মঙ্গল কাব্যে তিনি কি বলেছেন:

গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত॥
মহাশয়ের আগমন সকলে শুনিয়া।
আশীর্বাদ করিলেন বেদ উচ্চারিয়া॥

কিন্তু একালের সজলরাম সেনকে অভ্যর্থনা করার জন্য একটা

পাইস হোটেলও গুপ্তিপাড়ায় পাওয়া যাবে না। সজল সেন যেন দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা এখান থেকে নিয়ে যায়।'

বিষ্ণুদা বরাবরই ওই রকম। সরস ব্যক্তি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। বহু ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ভারবাহী। ভ্রমণ মানে তো শুধু পেটে ঘুরে বেড়ানো নয়, শরীর মন সুস্থ না থাকলে যে কোন সুন্দর ভ্রমণ নিরানন্দ হতে পারে, এ জ্ঞান তাঁর আছে বলেই এই আগাম সতর্কতা।

সজল সেন ঘাড় পেতে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল। কিন্তু আমি পড়লাম বিপদে। এঁদের কাছে অকপটে সব কথা বলতে সংকোচ হচ্ছিল, কেননা আগামী ছুটির দিন অর্থাৎ রবিবার বিকেলে বাড়ী থাকব বলে কথা দিয়েছিলাম কল্পনাকে। তার সাহচর্যে অদৃশ্য একটা আকর্ষণ আছে। অন্তত আমার পক্ষ থেকে এটা সত্যি. সে বোধ করে কিনা জানিনে। অতএব ক্ষতি আমারই। সে এসে বাড়ীতে আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবে ভাবতে গিয়ে কি-রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলাম।

সজল বললে, 'কিহে, চুপচাপ কেন? গুপ্তিপাড়ার কথায় কোন গুপ্তকাহিনী মনে পড়ে গেল নাকি?'

আমাকে হাসতেই হোল। বললাম, 'যাবনা বললে কি তোমরা ছাড়বে? রবিবারে বাড়ীতে থাকা সত্যি আমার দরকার ছিল—'

'থাক্ থাক্। বাউণ্ডুলে ভবঘুরে মানুষের বাড়ীর ওপর অত টান থাকতে নেই। আগের রবিবারগুলো ফাঁকি দিয়েছো, এবার ছাড়ছিনে। যেতেই হবে, নইলে অনর্থ ঘটবে—'

অগত্যা ওদের চাপে রবিবার সকাল ৬টা ৩৬ মিনিটের সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরলাম হাওড়া স্টেশন থেকে। বিষ্ণুদার সাথে এলেন দুটি মহিলা। পরিচয়ে জানলাম, এরা দূরভাষিণী অর্থাৎ টেলিফোনে চাকুরী করেন। বিষ্ণুদার প্রতিবেশিনী।

ট্রেনে আড়াই ঘণ্টায় পঁচাত্তর কিলোমিটার পথ পার হয়ে গুপ্তি

পাড়ায় পৌঁছল ন'টার একটু পরে। এই পুরো আড়াই ঘণ্টা মহিলা দু'জন যে ভাবে উচ্চকণ্ঠে অনর্গল কথা বলে গেলেন তাতে ওঁদের দূর ভাষিণী, মৃদুভাষিণী বা মঞ্জুভাষিণী কোনটাই বলা সঙ্গত কিনা আমাকে দু'বার ভাবতে হবে।

গুপ্তিপাড়ার স্টেশন থেকে মঠ প্রায় দেড় মাইল। রিক্সা ভাড়া বার আনা হলেও, হেঁটে গেলে চারিদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে বলে আমরা পদযাত্রায় এগোলাম। রাস্তাগুলি সবই পীচঢালা। সেকালের পণ্ডিত-প্রধান প্রগতিশীল গ্রাম এখন এক আধা-সহর মাত্র। এই গুপ্তিপাড়াতেই ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় পণ্ডিতদের উদ্যোগে বাংলার প্রথম বারোয়ারী পূজা হয়।

আমরা প্রথম পৌঁছলাম দেশ কালীমায়ের মন্দিরের কাছে। সেখানে মঠের মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা হোলো। তার মুখে কাহিনী শুনলাম, এই দেশ কালীমায়ের মন্দিরসংলগ্ন বটতলার পাশ দিয়ে এক সময় (আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে) গঙ্গা বয়ে যেত, সে গঙ্গা এখন প্রায় এক মাইল দূরে সরে গেছে। তখন এটা ছিল তান্ত্রিকদের সাধনপীঠ। দেবী শ্মশানকালী রূপে পূজা পেতেন।

মোহান্ত মহারাজের মুখেই গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের চোপার (বাক চাতুর্যের) এক গল্প শুনলাম: গুপ্তিপাড়ার দশনামী সম্প্রদায়ের মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজক সত্যদেব সরস্বতী ঘুরতে ঘুরতে এসে বট-গাছতলায় একখানি ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় দুই তরুণী যাচ্ছিল গঙ্গায় জল আনতে। তাদের এক জন তাঁকে দেখে মন্তব্য করল—'দেখ দিদি, লোকটা সন্ন্যাসী বটে কিন্তু আরামবোধটুকু ঠিক আছে; ইট দিয়ে বালিশের অভাব মেটাচ্ছেন।' কথা শুনে সত্যদেব সরস্বতী ইটখানি মাথার তলা থেকে সরিয়ে দিলেন। ঘাট থেকে ফেরার পথে এই দেখে মেয়েটি আবার মুখর হোল: 'দেখলে দিদি, কেবল আরামবোধটি নয় অভিমানটুকুও পুরোপুরি আছে এখনও।'

দেশকালীমায়ের বর্তমান মন্দির ঘরটি একটি সাধারণ পাকা ঘর, খুব একটা পুরাণ নয়। এখানে প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার দিন নতুন মাটির মূর্তি এনে পূজা করা হয়। পরের শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন ঐ মূর্তির 'কেশ,' 'কাঁকণ,' 'কেউর,' 'কপোল,' প্রভৃতি কাটাকুটি করে বিকৃত মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। খণ্ডিত অংশগুলিকে একটি আধারে রেখে সারা বছর তান্ত্রিক মতে নিত্যপূজা করা হয়।

দেশকালীমাই গুপ্তিপাড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পূজিতা। এখানকার পূজা-আরতি শেষ হলে আমরা মাত্র দু ফার্লং দূরে গুপ্তি-পাড়ার মঠে গেলাম। একটা প্রাচীন পাঁচিল ঘেরা বিরাট প্রাঙ্গনের উত্তর দিকের অংশে কয়েকটি মন্দির। প্রাঙ্গনের দক্ষিণ অংশে ভোগের ঘর, গোশালা, মঠের অধিবাসীদের থাকবার ঘর, যাত্রীদের বিশ্রাম ঘর প্রভৃতি। এক সময়ে এই মঠের অবস্থা খুবই ভাল ছিল বোঝা যায়। বর্তমানে হুগলীর জেলাধীশকে ট্রাস্টী করে সরকারী নাম মাত্র সাহায্যে মঠের ও মন্দিরের সেবাকার্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ চলে। ফলে মন্দিরেরও যাত্রীনিবাসের ঘরগুলির বহুদিন সংস্কার হয় না।

মঠের মধ্যে সুন্দরতম হোল রামচন্দ্র মন্দির। পরিচ্ছন্ন পোড়া-মাটির সজ্জার জন্য এটি পশ্চিম বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দির মধ্যে পরিগণিত। প্রায় সাতফুট উঁচু ভিত্তি বেদীর উপর তৈরী, এক চূড়া-বিশিষ্ট, চারচালা মন্দির। দক্ষিণমুখী তিন খিলান যুক্ত প্রবেশপথের পর ঘেরা বারান্দার পিছনে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে কাঠের দামী রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্তি। দেওয়ালের উত্তরদিকে রামায়ণের গোটা যুদ্ধকাহিনী আঁকা। মঠের মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটি বৃহত্তম। চারশো বছরের প্রাচীন বৃন্দাবন-চন্দ্রের রথযাত্রা উৎসবও গুপ্তিপাড়ার প্রধান উৎসব। মাহেশ ছাড়া এতবড় রথ বর্তমানে পশ্চিম বাংলার কোথাও আর নেই। রথযাত্রা উপলক্ষে মঠ থেকে বাজার পর্যন্ত প্রায় একমাইল পথের দুধারে মেলা বসে। পুনর্যাত্রার আগের দিন এখানকার প্রথামত ভোগ নিবেদন

করার পর, ভক্তেরা ভোগ লুট করে নেয়। একেই বৃন্দাবনচন্দ্রের 'ভাণ্ডারলুট' বলে।

ইঁটের আটচালা শৈলীর অতি উঁচু মন্দির। তার চূড়াটি গঙ্গার অপর পারে শান্তিপুর থেকে দেখা যায়। পুরাণ মন্দিরের ভিত্তিভূমির উপর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরের বিশেষত্ব হোলো, ভিতরের বারান্দায় ও বিগ্রহকক্ষের দেওয়ালগুলি জুড়ে ফ্রেস্কো ধরণের ছবির অলংকরণ। ছবিগুলি রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গোপ-গোপী বিষয়ক। গর্ভগৃহের দরজাতেও নক্সার কাজ আছে। আমার শিল্পজ্ঞান সীমিত হলেও ছবিগুলি এত সুন্দর যে একাগ্র হয়ে দেখছিলাম, সঙ্গিনী শোভাদেবীর কাংস্য-কণ্ঠের তাড়নে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। শোভা দেবী বললেন, 'ছবি দেখলে পেট ভরবে না, বেলা প্রায় দুটো বাজে, আমাদের যে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল।' দেখি, নির্জন মন্দির চত্বরের সুন্দর ঘাসে ঢাকা ঘেরা উঠানের এক পাশে, সঙ্গে করে' আনা খাবার চার ভাগ করে ওরা আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

অতএব বসে পড়া গেল।

গুপ্তিপাড়ার মঠে রথযাত্রা ও দোল-উৎসবের সময় ছাড়া আজকাল যাত্রী বা দর্শক খুব একটা যায় না, কিন্তু পানীয় জল ও অন্যান্য ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে খিদেও যেমন লেগেছিল বেশী, শোভা দেবীর আনা খাদ্যের স্বাদ ও পরিমাণ ছিল ততোধিক। গুরুভোজনের পর মন্দিরের পাশের তিন দিক ঘেরা ঠাণ্ডা বারান্দায় বসামাত্র তৃপ্তিতে চোখ দুটো জুড়ে আসতে লাগল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা মঠের আর দুটো মন্দির কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ও চৈতন্যদেবের মন্দির দর্শন করলাম। চৈতন্যদেবের মন্দিরটি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর রায় তৈরী করান। খাঁটি জোড় বাঙলা স্থাপত্যের মন্দির। অতি মনোরম চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

দর্শন শেষ হলে মোহান্ত মহারাজের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি অনুরোধ করলেন, রাতটা থেকে বৃন্দাবনচন্দ্রের আরতি দর্শন করে যেতে। মঠে থাকবার কোন অসুবিধা হবে না সে কথাও জানালেন। কিন্তু আমাদের পরদিন চাকরী আছে, থাকবার উপায় নেই। উপরন্তু ফেরবার গাড়ীর সময় হচ্ছে জানিয়ে বিদায় চাইলাম। তিনি দুঃখ করে জানালেন, এক সময়ে মঠে যাত্রী এলে প্রসাদ না পেয়ে যেত না, এখন ঠাকুরেরই নিত্যসেবা কঠিন হয়ে উঠেছে, প্রসাদের পরিবর্তে ভক্তদের চরণামৃতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

মোহান্তজীকে প্রণাম জানিয়ে, বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুদা আবেগজড়িত কণ্ঠে ভক্ত কবির কটি লাইন আবৃত্তি করলেন :—

"রাখিয়া গেলাম আঁখির পিয়াসা আরতির দীপে তুলি।
হিয়ার ভকতি রাখিয়া গেলাম পান্থ সলিলে গুলি,
মিশায়ে গেলাম বিদায়ের ক্ষণে,
কাতর কামনা পথ ধূলি সনে,
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ পূর্ণ হয়েছে ঝুলি।"

ধীরে ধীরে আমরা গুপ্তিপাড়া মঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

গুপ্তিপাড়ার মঠ দেখে একদিনের ভ্রমণার্থীরা দর্শনভিখারীর ঝুলি সত্যিই পূর্ণ হয়। আমার মনের তৃষ্ণা অনেকখানি মিটেছিল, সবটা নয়। মন বড় বিচিত্র। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, কল্পনাকে এমন সুন্দর জায়গাটি দেখাতে পারলে সে কত খুশি হোত। সুন্দর জিনিস কখনও একা ভোগ করতে নেই—শাস্ত্রের নির্দেশ। কথাটা যে কত সত্যি, মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। আরও দুঃখ হচ্ছিল এই জন্য যে তাকে বলেছিলাম, বাড়ি থাকব। কথার খেলাপ হোল। সে কি মনে করল কে জানে, আমি যেন মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম, বাড়িতে আমাকে না পেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে সে ফিরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে আমাদের বাড়ির দরজা থেকে ধীরে ধীরে ভ্রমণ-

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বন্দনা :

'মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,'

আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

এলাহাবাদের কাছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিনটি নদী যুক্ত হয়েছে। তারপর প্রায় একহাজার মাইল, ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে সেই যুক্ত ধারা বয়ে এসে ত্রিবেণীতে আবার ত্রিধা বিভক্ত। খণ্ডিত নদী তিনটি পেয়েছে পূর্বনাম। বাঁ দিকের ধারা যমুনা, মূলধারা গঙ্গা ও ডানদিকের নদীটি সরস্বতী। মহাভারতের শান্তি পর্বে এই মুক্তবেণী ত্রিবেণী তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনবতুতার বর্ণনায় দেখা যায়, ফকরুদ্দিন সরস্বতী নদী পথে বিশাল নৌবহর নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। সেদিনের সরস্বতীর ছিল বিশাল রূপ। সমুদ্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তাম্রলিপ্তের কাছে, সমুদ্রগামী জাহাজে সরস্বতী নদীর পথে ত্রিবেণী পর্যন্ত যাতায়াত করা যেত। আজ সেই নদী শীর্ণকায়া একটি নালাতে পরিণত।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দু মিনিটের পথ পূর্বদিকে ত্রিবেণীর বিখ্যাত ঘাট। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজারা, ত্রিবেণী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। প্রবাদ, গঙ্গরাজারাই ত্রিবেণীর ঘাট নির্মাণ করেন। সরস্বতীর দক্ষিণ পাড়ে তিনি একটা রেখদেউলও তৈরী করেছিলেন। বর্তমানে ত্রিবেণীর স্নানঘাটের দক্ষিণ পাশে যে ভাঙ্গা-ঘাটটিতে এখন খেয়া-পারাপার হয়, সম্ভবতঃ সেইটিই গঙ্গরাজাদের তৈরী ত্রিবেণীর জগন্নাথ ঘাট। স্নানের ঘাটটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। স্নানের ঘাটে দুটি জগন্নাথ মূর্তি, পাথরের একটি অতি প্রাচীন গণেশ মূর্তি, ব্রহ্মামূর্তি, একটি হরগৌরী মূর্তি ও একটা গঙ্গাদেবীর পাথরের বিগ্রহ রয়েছে। মূর্তিগুলি অতি প্রাচীন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিগ্রহগুলি সংগ্রহ করে ঘাটের পাশে এনে পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্নানের ঘাটের উত্তর দিকেই ত্রিবেণীর বিখ্যাত শ্মশান ঘাট। সারা

ভারতের সারস্বত ইতিহাসে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা প্রহেলিকা বলে মনে হয়। তিনি তিন শতাব্দীর ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছিলেন, নিজের জীবনে (জন্ম সপ্তদশ শতকে ১৬৯০ খ্রীঃ জীবিতকাল অষ্টাদশ শতক, মৃত্যু উনবিংশ শতকে ১৮০৭ খ্রীঃ)। পণ্ডিত প্রবর জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের ১১৭ বৎসর বয়সে অন্তর্জলী হয় এই শ্মশানে। অন্তিম সময়ে তিনি যখন এই ঘাটে তীরস্থ, তাঁর এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, 'গুরুদেব চল্লেন, ঈশ্বরের রূপ কেমন জানতে পারলাম না, জানতে পারলাম না তিনি কি বস্তু, কি ভাবেই বা তার উপাসনা করা উচিত।' ঈষৎ হাসির সঙ্গে, অন্তর্জলী অবস্থায়, একটি শ্লোক মুখে মুখে রচনা করে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন :

"নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেবচ
বয়ন্তু দীর্ঘ-সম্বন্ধাদ্ নীরাকারাম্‌ উপাস্মহে।"

অর্থাৎ কেউ বলেন, ঈশ্বর নরাকার (মনুষ্যরূপী), কেউ বলেন নিরাকার; আমরা দীর্ঘ সম্বন্ধের জন্য (দীর্ঘদিন গঙ্গাতীরে বাসের জন্য আর্যেরা) নীর (জল) আকারে উপাসনা করেন।

এই পবিত্র মহাশ্মশান দর্শন করে আমরা ফিরে এসে দক্ষিণদিকে সরস্বতী নদীর উপরের পুল পার হয়ে গেলাম জাফরখাঁ গাজীর আস্তানায়। এই অঞ্চলটাই ছিল মুসলমান-পূর্বযুগে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের এক সম্মিলিত তীর্থ। এইখানেই সম্ভবতঃ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির ছিল। আশে পাশে ছিল অন্যান্য অনেকগুলো বৌদ্ধ, জৈন ও সূর্য মন্দির। মুসলমান আক্রমণকারীরা মন্দিরগুলি ভেঙ্গে তারই মালমসলা দিয়ে এই আস্তানা, সমাধিমন্দির ও মসজিদ গড়েছে। বিষ্ণু মন্দিরটির ভূমি পরিকল্পনা অর্থাৎ গ্রাউণ্ডপ্ল্যান ঠিক রেখেই তার উপর সমাধি-মন্দির গড়া হয়েছে। মন্দিরের গর্ভকক্ষকে করা হয়েছে সমাধি কক্ষ। আস্তানাটির দুটি অংশ। পূর্বদিকেরটী জাফরখাঁ গাজী, জাফরখাঁর পুত্র ও পুত্র বধূর সমাধি। পশ্চিমের অংশটি, জাফরখাঁর অগ্রজ বড়খাঁ

গাজীর পরিবারের লোকেদের সমাধি। আস্তানার সামনে, পাশে এবং বাইরেও কয়েকজন খিদমদগারের সমাধি রয়েছে। পশ্চিম দিকে আট গম্বুজওয়ালা জাফরখাঁর মসজিদ, মসজিদটির তিনটি গম্বুজের ছাদ ভেঙ্গে পড়ে গেছে। সমাধি গৃহের চারটি দরজাতেই হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত পাথরগুলি পরিকল্পনাবিহীন ভাবে তাড়াহুড়া করে কোনো মতে গেঁথে দেওয়া। বিষ্ণু, নবগ্রহ প্রভৃতি মূর্তি খোদিত প্যানেলগুলো প্রায় সবই উল্টিয়ে গাঁথা। মসজিদের দেওয়ালে বড় বড় পাথরের দেব-দেবীর মূর্তিগুলি পেছন ফেরানো। কোন কোনটার উপর আরবী ও পার্শীভাষায় লিপি খোদাই করা। মসজিদের ভিতরকার একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের গায়ে দেখলাম, বৌদ্ধমূর্তি খোদিত।

এক ধর্মাবলম্বীর হাতে অন্য ধর্মের ধর্মস্থানের ধ্বংসসাধন। এক ধর্মস্থান ভেঙ্গে তারই উপর নূতন ধর্মের কীর্তি গড়ার নিদর্শন হিসাবে জাফরখাঁ গাজীর দরগার গুরুত্ব ঐতিহাসিকদের কাছে খুব বেশী। জাফরখাঁর মসজিদের অন্য একটা গুরুত্বও আছে। এই মসজিদ নির্মিত হয় ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলাদেশে এর চেয়ে আগে তৈরী কোন মসজিদ নেই।

দূরে দেখা যাচ্ছিল ত্রিবেণী থার্মাল প্লান্ট, পশ্চিম বাংলাকে কৃষি শিল্পে নবরূপে রূপায়িত করার মূলশক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র। জাফরখাঁ গাজীর আস্তানার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন গুলি ভালভাবে দেখতে গিয়ে দিনমণি পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেন। বাধ্য হয়ে থার্মালপ্লান্ট দেখা এবারের মত বন্ধ রেখে আমরা সন্ধ্যা ছটা-চল্লিশ মিনিটের সালার-শিয়ালদা প্যাসেঞ্জারে রাত্রি ন'টায় কলকাতা পৌছলাম।

## দশ

**পাণ্ডুয়া—মহানাদ**

কেটে গেল একটি সপ্তাহ।

আগের বার ত্রিবেণী গিয়ে জাফরখাঁর আস্তানায় ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছিল, আমরা যেন হিন্দুরাজত্বের অবসানে বা মুসলমান শাসনের উষায় কোন এক বিচিত্র চরিত্র নায়কের জীবনালেখ্য দেখছি। দরগায় একজন খিদমদগারের মুখে শুনেছিলাম বিচিত্র কাহিনী :

জীবনের এক অধ্যায়ে জাফরখাঁ হিন্দু মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসকারী কালাপাহাড়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। আবার পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায়

'জাফরখাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে।
গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।'

কখনও সিংহবিক্রম জাফরখাঁ গাজীর কুড়ুল হিন্দু ধর্মের সংহারে উদ্যত, আবার কখনও তারই কণ্ঠে কোরাণের বদলে গঙ্গাস্তব :

'সুরধুনি মুনি কন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সাতরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্ মহত্বম্।"

যে সব কিম্বদন্তী শুনেছিলাম, তাতে জাফরখাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মানরাজা, ভূদেব নৃপতি এবং একটি মুসলমান নাম তিনি, শাহ সুফী।

এই শাহ সুফীর কিম্বদন্তীর উপর ভিত্তি করে কবি মহীউদ্দিন ওস্তাগর গিয়েছিলেন পাণ্ডুয়ায়। সেখানে শাহ সুফীর কীর্তি দেখে লিখে গেছেন :

"আমি বান্দা গোনাগার পাঁড়োয়াতে যাইয়া।
দেখিনু মনুরা ঘর নেহাৎ করিয়া॥
বাদশাহী মকান হেন হয় অনুমান।
দিল জুড়াইয়া যায় দেখিয়া মকান॥"

—( পাণ্ডুয়ার কেচ্ছা )

জাফরখাঁ গাজীর আস্তানায় দাঁড়িয়ে খিদমদগারের মুখের কাহিনী শোনবার সময়েই পাণ্ডুয়ার মকান দেখে দিল-জুড়ানর ইচ্ছা হয়েছিল মনে মনে। ঠিক করেছিলাম সুযোগ পেলেই একবার পাণ্ডুয়ায় যাব।

কল্পনার জন্যে বসে না থেকে বিক্ষিপ্ত মনে, অগত্যা তাই করলাম। বেরিয়ে পড়লাম পাণ্ডুয়ার উদ্দেশ্যে। অনেকেই পাণ্ডুয়া নামটি নিয়ে ভুল করেন। মালদা জেলার, প্রাচীন গৌড়ের পাশে পাণ্ডুয়া আর হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া এক নয়। দুটি জায়গাই মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা কেন্দ্র বিশেষ। মালদা জেলার পাণ্ডুয়া বড় পাণ্ডুয়া বা বড় পেঁড়ো এবং হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া ছোট পেঁড়ো নামে পরিচিত। শাহ সুফীর কীর্তিগুলি রয়েছে ছোট পেঁড়োয়।

হাওড়া থেকে বর্ধমান লোকালে চেপে দেড়ঘটায় পৌছলাম পাণ্ডুয়ায়। ট্রেন স্টেশনে ঢুকবার আগেই ডান দিকে চোখে পড়ল একটা উঁচু মিনার। লাইন থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে জি. টি. রোডের ধারে। স্টেশনে নেমে হেঁটে পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় মিনিট কুড়ি। ১২৬ ফুট উঁচু পাঁচতলা এই মিনারটির ভিতর দিয়ে ঘোরান সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। ১৬৮টি সিঁড়ি। বেশ খাড়াই, উঠতে একটু কষ্ট হয়।

প্রবাদ, চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে এখানে পাণ্ডু নামে এক মহাপ্রতাপশালী হিন্দু রাজা ছিলেন। দিল্লির সম্রাট ফিরোজ শাহের ভাইপো শাহ সুফী তাঁকে হারিয়ে তার রাজ্য ধ্বংস করেন। সেই যুদ্ধ

জয়ের স্মারক হিসাবে শাহ সুফী, জয়স্তম্ভের অনুকরণে এই মিনার তৈরী করান। মিনারে ঢুকবার দরজায় যে পাথরগুলি লাগান, সেগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায়, অন্য কোন হিন্দুমন্দির বা বৌদ্ধমঠের অংশগুলি ভেঙ্গে এনে এখানে লাগান হয়েছে।

পাণ্ডু রাজাকে নিয়ে নানা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, পাণ্ডু রাজার আমলে এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় সবই ছিল হিন্দু। পাণ্ডুয়া সহরে মাত্র পাঁচঘর মুসলমান ছিল। হিন্দুপ্রধান গ্রামে এরা খুব ভয়ে ভয়ে বাস করত। মহীউদ্দীনের কেচ্ছা বলছে :

"কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান।
বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান॥
এছলামের কারবার করিতে নারিত।
করিলে পাণ্ডবরাজা সাজা দোলাইত॥"

একদিন ছেলের জন্মোৎসব উপলক্ষে একজন মুসলমান প্রজা একটা গরু কোরবানী করে। খবর পেয়ে উত্তেজিত হিন্দুরা ছেলেটিকে মেরে ফেলে। ছেলের মৃতদেহ নিয়ে মুসলমানটি দিল্লির সম্রাট ফিরোজশার কাছে যান। ফিরোজশা শাহ সুফীকে ফৌজ সঙ্গে দিয়ে পাঠান পাণ্ডু রাজাকে উচ্ছেদ করার জন্য। পাণ্ডু সামান্য সামন্ত রাজা হলেও বাদশাহী ফৌজ প্রথমে সুবিধা করতে পারেনি, পাণ্ডু রাজার অন্তঃপুরে জীয়তকুণ্ড নামে এক কুণ্ড ছিল। যার জল স্পর্শে মৃত সৈনিকও জীবন-লাভ করত। ফলে যুদ্ধে শাহ সুফী প্রথম দিকে নাজেহাল হয়ে যান।

'এয়ছা কেরামত ছিল সে পানীর গুনি।
মোর্দ্দা দিলে জিন্দা হইত কুদরতে রববানি।'

পরে নগর ঘোষ নামে এক গৃহশত্রু অর্থলোভে যোগীবেশে অন্তঃপুরে ঢুকে জীয়ত কুণ্ডে গোমাংস ফেলে কুণ্ডের মাহাত্ম্য নষ্ট করে দিল। নিরুপায় পাণ্ডু রাজা সপরিবারে ত্রিবেণীর গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন

দিলেন। শাহ সুফী বিরাট এক মসজিদ তৈরী করে পাণ্ডুয়াতে বসবাস করতে থাকেন।

মিনারের মাথায় দাঁড়িয়ে চারিদিক বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। বিষ্ণুবাবু মিনারের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা ফটো নিলেন। মিনারের পাশেই তিনশ বছরের প্রাচীন এক তেঁতুল গাছ। তারই উত্তর দিকে বাইশ দরজা-ওয়ালা পাণ্ডু রাজার সভাগৃহের ধ্বংসাবশেষ। পাথরের বড় বড় পিলার ও বরবুদুরের মত থাক থাক গাঁথনিওয়ালা দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ দেখে মনে হয়, এই সমস্ত পুরাকীর্তি গুপ্তযুগের। মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে একবার ভেঙ্গে নতুন করে গড়া হয়েছিল। জি. টি. রোডের পশ্চিম দিকে হজরত সুফীর মসজিদ ও সমাধিমন্দির। প্রতি বৎসর ৩০শে জানুয়ারী হজরত সুফীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এখানে উৎসব পালিত হয়। পুরো মাঘ মাস মেলা বসে। মেলায় সবচেয়ে বেশী আমদানী হয় মাদুর ও সুটকী মাছ।

রবিবার। মিনারের সামান্য একটু উত্তরদিকে পাণ্ডুয়ার হাটে ভোর থেকেই ভীড় জমতে শুরু করেছিল। বুধবার ও রবিবার পাণ্ডুয়ার হাটে বহু গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল কেনা-বেচা হয়, হুগলী জেলার মধ্যে এইটিই বোধ হয় সবচেয়ে বড় গোহাটা।

হাট ছাড়িয়ে একটু পশ্চিম দিকে যাবার পর, জি. টি. রোড থেকে ডানদিকে বেরিয়েছে, কালনা রোড। পাণ্ডুয়া থেকে কালনার দূরত্ব মাত্র ষোল মাইল। বাসও নিয়মিত যাতায়াত করে। ভাড়া মাত্র আশি পয়সা। আমরা বেড়াতে বেড়াতে কালনা রোড বেয়ে সহরের বাইরে এলাম। একটু দূরেই দামোদর নদী থেকে বেরিয়ে-আসা একটি সেচখালের উপর কালনা রোডের 'পুল', পুলের কাছেই লকগেট। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। একদল স্কুলের ছেলেকে দেখলাম লকগেটের ধারে পিকনিকের বন্দোবস্ত করায় ব্যস্ত।

কালনার দিকে না-এগিয়ে আমরা ফিরলাম স্টেশন অভিমুখে। রেলের লাইন পেরিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে মহানাদের রাস্তা।

স্টেশনের কাছ থেকে আমরা মহানাদ যাবার বাসে চড়লাম। মহানাদ এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। বাসভাড়া ২৫ পয়সা। মহানাদের চৌরাস্তার মোড়ে বাস থেকে নেমে সামনে এক ডাক্তারের ফার্মেসীতে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহানাদে দর্শনীয় কি কি আছে?' ফার্মেসীর কম্পাউণ্ডারবাবু পাশের একটি বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঐটি পাল বাবুর বাড়ি, ওখানে যান, সব জানতে পারবেন।'

জানতে পারলাম, পালবাবু বা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মশায়, এক সময় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে চাকরী করতেন। তাঁর চেষ্টায় মহানাদের কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কলকাতা মিউজিয়ম ও আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে। পাল মশায় আমাদের সঙ্গে করে পাশেই জটেশ্বর মন্দিরের সামনে নিয়ে গেলেন। এখানে শিবরাত্রির সময় বিরাট মেলা হয়। ঐ মেলা মানাদের জাত বলে খ্যাত। মন্দিরের সামনের জায়গাটিও জাততলা বলে পরিচিত। খৃষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত মহানাদ নাথ ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে খ্যাত ছিল। সামনের প্রাঙ্গনে একটা লোহার দণ্ড পোঁতা আছে। সেটিকে সবই মহাকাল বা কালভৈরব বলে পূজা করে। পাশেই আছে বটুক ভৈরব, পাথরের বিরাট ভাঙ্গা মকর মূর্তি ও একপাদ ভৈরব। মন্দিরের উত্তর দিকে একটি বিরাট পুকুর, স্থানীয় লোকেরা বলে বশিষ্ট-গঙ্গা। কাছেই কালীতলা। চারপাশে দেখলাম পাথরের মূর্তির বহু ভাঙ্গা টুকরো পড়ে আছে। বিশেষ করে চোখে পড়ল একখানা ভাঙ্গা গৌরীপট্ট। লম্বায় প্রায় দশ ফুট। এতবড় গৌরীপট্ট ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি। মন্দিরের উত্তর দিকে পথের পাশে, জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল বেশ কিছু বছর আগের প্রত্ন-তাত্ত্বিক খনন কার্যের প্রারম্ভিক চিহ্ন। কিন্তু কেন যে আরব্ধ কাজ বন্ধ হয়েছে সেটি সঠিক জানা গেল না। জঙ্গলের মধ্যে বহু মোহান্তদের সমাধি দেখতে পেলাম।

মন্দিরের পূজারী আমাদের মহানাদ সম্পর্কে এক কিম্বদন্তী

শোনালেন : মহাশঙ্খনাদ থেকে মহানাদ নামের উৎপত্তি। এখনও নাকি কোন কোন অমাবস্যার রাত্রিতে জঙ্গলে ঢাকা এই সব প্রাচীন ভাঙ্গা দেউলের কোন কোনটা থেকে শঙ্খ-মৃদঙ্গের শব্দ শোনা যায়। প্রভাস বাবু কিন্তু জানালেন, মহানাদ দশম ও একাদশ শতকে গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত নাথ ধর্মের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র ছিল। সেইজন্য নাম হয়েছে মহানাদ। তারও আগে ছিল এখানে এক বিরাট বৌদ্ধ মঠ। পরবর্তীকালে নাদ-তত্ত্বের পীঠস্থানের দেবতা জটেশ্বর নাথ, হিন্দু দেবতা জটেশ্বর শিবে পরিবর্তিত হয়েছেন। 'গোরক্ষনাথের কহানী' বলছে :

'শব্দ কহাঁসে আয়া কহো শব্দ কা বিচার
মহী তো মালা তিলক ধরো উতার।'

প্রথমে শব্দের বিচার করা কর্তব্য, তা না হলে তিলকমালা ধারণ করা বৃথা। এই নাদানুসন্ধানের মহাতীর্থ থেকেই মহানাদ নামের উৎপত্তি হলেও হতে পারে।

জটেশ্বর নাথের মন্দিরটি লক্ষ্য করলাম। ভিত পর্যন্ত গঠন দেখে মনে হয়, সে অংশ গুপ্তযুগের অর্থাৎ এখন থেকে অন্ততঃ দেড় হাজার বছর আগে তৈরী। উপরের অংশের নির্মাণ কাল মোগল আমলের বলে মনে হোল।

আমরা যে সময়ে প্রাচীনমূর্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে ব্যস্ত ছিলাম, তখন বিষ্ণুবাবু গিয়েছিলেন আধমাইল দূরে কাজীমন সাহেবের সমাধি ও চন্দ্রদীঘি দেখতে।

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে যেমন ক্লান্ত তেমনি ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। কিন্তু মহানাদে কোন ভাতের হোটেল পাওয়া গেল না। ভাতের অভাব কিন্তু আমাদের মিটিয়ে দিল মহানাদের ছানার মিষ্টি। মহানাদে ছানার খাবার গুণে ভাল দামে সস্তা।

পরিপাটি ভাবে জলযোগ সেরে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম চৌমাথার মোড় থেকে প্রায় দু ফার্লং দক্ষিণে ব্রহ্মময়ী মন্দিরের

দিকে। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে তৈরী পঁচাশি ফুট উঁচু তেতলা এই নবরত্ন মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর এক অতুলনীয় কীর্তি। মন্দিরের ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে আমরা তেতলার সবচেয়ে বড় চূড়াটির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হংসেশ্বর শিবের কাছে পৌঁছলাম। মন্দিরের একতলায় দেবী ব্রহ্মময়ী কালী, পাশে সিংহাসনে বিষ্ণু এবং নিয়োগী বংশের কুলদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন। মন্দিরের চার কোণে চারটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কার্নিসের নিচে ফুল ও লতাপাতা আঁকা। মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত ও বাংলালিপি খোদিত। বাংলা ভাষায় লেখা লিপিটি হচ্ছে :

'ব্রহ্মময়ীর বাস জন্য, নির্মিত নবরত্ন পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত
পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ চারি, ঊর্ধ্বে এক শ্বেত তারি, দেখিবারে অতি
সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম, অশেষ গুণে গুণধাম, সদ্গোপ
কূলে উৎপত্তি ভবসিন্ধু তরিবারে, সুযত্ন করি অন্তরে,
কালীপদে করিয়ে প্রণতি। সন ১২৩৬ সাল।'

ব্রহ্মময়ী মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলাম মহানাদ কর পাড়ায় লালজী মন্দির দেখতে। মন্দিরটি একশ ফুট উঁচু এক চূড়া মন্দির অনেকটা গীর্জার মত। মন্দির দেখতে গিয়ে হতাশ হলাম। মন্দির পরিত্যক্ত। মন্দিরে বিগ্রহ নেই। ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে, মাথায় পড়ার ভয়ে মন্দির থেকে বিগ্রহ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ফিরলাম চৌমাথার মোড়ে। বাসে পোলবা হয়ে পৌঁছলাম ব্যাণ্ডেল স্টেশনে। ফিরবার পথে বিষ্ণুদা জানালেন পরদিনও ছুটি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাছাকাছি কোথাও কি একটা দেখবার মত জায়গা আছে যেখানে একটা ছুটির দিন বেশ কাটিয়ে আসা যায়?'

কাছাকাছি কোন জায়গার নাম চট করে মনে এল না। একটু চুপ করে থেকে হেসে বললাম, 'পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়।

পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।—যে কোন পথ দিয়েই চল না কেন, চোখ খুলে রাখ, দর্শনীয় জিনিসের অভাব হবে না।'

# এগার

## বংশবাটী, ব্যাণ্ডেল দেবানন্দপুর

আমার প্রস্তাবটি বিষ্ণুবাবুর মনে লাগল। তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে তিনি বললেন, 'চমৎকার আইডিয়া। তাহলে আগামীকাল ভোরের কোন ট্রেন,……কি বলো ?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

পরদিন ভোর ছটা ছত্রিশ মিনিটে হাওড়া স্টেশনের চার নম্বর প্লাটফরম থেকে সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করলাম।

বিষ্ণুবাবু আগেই টিকিট কেটে রেখেছিলেন। আমাদের গন্তব্য স্থান বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী। সকাল আটটা বাজবার ঠিক এক মিনিট আগে ট্রেন পৌঁছল। স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্বদিকে হেঁটে চললাম প্রায় কুড়ি মিনিটের পথ। বাঁশবেড়িয়ার প্রাচীন জমিদার দত্তরায় বংশের জীর্ণ বাড়ীর সামনে উপস্থিত হলাম। জমিদারী যাওয়ার আগে থেকেই রায় বংশের অনেকেই কলকাতা গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখন তাঁদের ইতিহাস একদা রাজার কাহিনীর মত। বাড়ির দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকের কিছু অংশ ভেঙে পড়ে ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত। ভারবেনার জঙ্গল আর সাপ-খোপের পাকাপাকি আস্তানা। বাকী অংশগুলিও মনে হয় পরিত্যক্ত হতে দেরী নেই। এই ভেঙে পড়ন্ত জমিদার বাড়ীর পাশেই বিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির। এই মন্দিরটি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের মধ্যে অনন্যসাধারণ। এই মন্দিরটিকে বলা যায়, তান্ত্রিক যোগসাধনার প্রত্যক্ষ স্থাপত্য রূপ।

রাজা নরসিংহ দেবরায় কাশীর এক তান্ত্রিক সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ষটচক্রভেদ প্রণালী অনুযায়ী পরিকল্পনা করে-১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। দুই তলা গাঁথা শেষ হতে না হতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁরই পরিকল্পনা অনুসরণে তের বছর পরে তাঁর ছোটরাণী শঙ্করী দেবী ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ মন্দির নির্মাণকার্য শেষ করেন। মন্দিরটি নির্মাণে তখনকার দিনেই ব্যয় হয়েছিল, পাঁচ লক্ষ টাকা। মন্দিরটি সত্তর ফুট উঁচু ছয়তলা বিশিষ্ট, শিখারকারের তেরটি গম্বুজ। গম্বুজগুলি উচ্চতায় এক নয়। সেগুলি পদ্মের পাপড়ির আকারে গঠিত। মন্দিরের উপরে উঠবার জন্যে তিনটি সিঁড়ি আছে। কেন্দ্রস্থলে পরাশক্তির বিকাশ-স্বরূপ হংসেশ্বরী দেবীর মূর্তি। মন্দিরের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত চোদ্দটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। স্থাপত্যগত রীতি ও ধর্ম আদর্শের মিশ্রণ ও শিল্পগত সৌন্দর্যে অনুপম এই হংসেশ্বরী মন্দিরের কোন তুলনা নেই।

পাশেই, ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর দত্ত প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দির। চারচালা। বহিঃপ্রকার কারুকার্য খচিত টেরাকোটা অলংকরণে নির্মিত। মন্দির গাত্রে দক্ষযজ্ঞ, দশমহাবিদ্যা, হরধনুভঙ্গ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দশাবতার, প্রভৃতি বহু ঘটনার সমাবেশ পর পর চিহ্নিত। ভাস্কর্য এত সুন্দর যে প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু একমাসকাল বাঁশবেড়িয়ায় থেকে বাসুদেব বন্দিরের প্রত্যেকটি ইটের ছবি এঁকে নেন।

এই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখতে দেখতে আমাদের মন চলে গিয়েছিল সুদূর অতীতের মধ্যযুগের গ্রামবাংলায়। বিষ্ণুবাবুর হাতের ক্যামেরার ঘন ঘন ক্লিক্ আওয়াজ আমাদের যেন আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। বেলা ক্রমে বেড়ে উঠছে, আমাদের আরও কয়েকটি জায়গা দেখতে হবে। আমরা মন্দির থেকে ছয় সাত মিনিটের পথ পূর্বদিকে এসে গঙ্গার ধারের রাস্তায় বাস পেলাম। এই

পথ দিয়ে চার নম্বর বাস মগরা থেকে ত্রিবেণী হয়ে চুঁচুড়ায় আসে। ষোল পয়সা ভাড়া দিয়ে এসে নামলাম ব্যাণ্ডেল চার্চের সামনে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোন গীর্জা, ব্যাণ্ডেল চার্চ তৈরী হয়েছিল ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে। এই গীর্জার সাথে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক পুরাণ অধ্যায় জড়িত।

কলকাতার আর্চ-বিসপ, রেভারেণ্ড এলবার্ট ডি সুজা কর্তৃক প্রকাশিত ব্যাণ্ডেল গীর্জার ইতিহাসে লেখা আছেঃ ব্যাণ্ডেল গীর্জার ইতিহাস কেবলমাত্র একটি গীর্জা নির্মাণের ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে বঙ্গদেশে পর্তুগীজ বসতি এবং তাদের উত্থান পতনের ইতিহাস। হয়ত একদিন সমগ্র বঙ্গদেশ পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হয়ে যেত, যদি সম্রাট শাহজাহানের আদেশে মোগল সৈন্যগণ ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ব্যাণ্ডেল ও হুগলী আক্রমণ না করত।

সেদিন বন্দরনগরী হুগলী বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, তারও বহুদিন পর ইংরাজ বণিক জব চার্ণক কয়েকখানা মাটির দেওয়াল দেওয়া চালাঘর তুলে গঙ্গাতীরে এক গণ্ডগ্রামে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। কলকাতা সহর তখনও অনেক দূরে। সে দিনের ঐশ্বর্যমণ্ডিতা বন্দরনগরী আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, শুধু নীরব সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে এই ব্যাণ্ডেল গীর্জা, যার অন্তর ভরে আছে ঐশী কৃপার বিপুল সম্ভারে।

Our lady of voyage নামে গীর্জার ভিতর মেরী মায়ের যে অপরূপ মূর্তি আছে ভারতবর্ষের আর কোন ভজনালয়ে ঐ রকম মনোহর মূর্তি দেখা যায় না। গীর্জার দক্ষিণে পাদ্রী গোমেজ ডা সোটার সমাধির ধারে, একটা জাহাজের মাস্তুল রয়েছে। মাস্তুলটি একটি পর্তুগীজ জাহাজের। ঐ জাহাজটি বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে পড়ে। নাবিকেরা মা মেরীর কৃপা প্রার্থনা করেন। জাহাজটি ভগবৎ কৃপায় রক্ষা পায় এবং জাহাজ এসে এই গীর্জার ঘাটে নোঙর করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

জাহাজের মাস্তুলটি মা মেরীর নামে এই গীর্জায় দান করে যান। জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতিদিন শত শত যাত্রী সমাগম হয় এই গীর্জাটি দেখার জন্যে।

আগে এখানে বহুলোক পিকনিক করতে আসত এবং যেখানে সেখানে রান্না করে স্থানটির পবিত্রতা, রমণীয়তা, গাম্ভীর্য নষ্ট করত; এখন গীর্জার এলাকার মধ্যে রান্না করা নিষেধ! তবে তৈরী খাবার নিয়ে শীতকালে বহু লোক সপরিবারে এখানে বেড়াতে আসে। এক ভদ্রলোক সপরিবারে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার এনে গাছতলায় খেতে বসার আয়োজন করছিলেন। শুনলাম, তিনিও আমাদের মত বাঁশবেড়িয়া নেমে হংসেশ্বরী মন্দির দেখে এসেছেন। তাঁর মুখেই শুনলাম, বাঁশবেড়িয়া রথতলার কাছে আনন্দময়ী কালীতলায় মুখোমুখি দুটি মন্দিরে কালী ও কৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। কালী মূর্তি পঞ্চমুণ্ডি আসনের উপর বসানো। মন্দির দুটি আকারে ছোট হলেও দর্শনযোগ্য।

বেলা প্রায় একটা, তখনও পেটে কিছু পড়েনি। আমরা ব্যাণ্ডেল চার্চ থেকে বেরিয়ে স্টেশনে যাবার রাস্তার মোড়ে পৌঁছলাম। সামান্য পথ হেঁটে আসতে মাত্র মিনিট দুয়েক লাগল। এখান থেকে ব্যাণ্ডেল স্টেশন যাবার বাস পেলাম।

স্টেশন মাত্র আধ মাইল পথ। স্টেশনের কাছে বেশ কয়েকটা হোটেল আছে। হোটেলগুলির চেহারা ও আসবাবপত্র অতি সাধারণ এমন কি নিম্ন স্তরের বলাই চলে। কিন্তু খাবারের আয়োজন বেশ রাজসিক। শুনলাম, ব্যাণ্ডেল রেলওয়ে ইয়ার্ডের দৌলতে এখানে অনেকেরই নাকি ফালতু রোজগার ভালই। হোটেল অতি সাধারণ কিন্তু দরাজ হাতে খরচা করে ফাউলকারি খাবার লোকের অভাব নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দেবানন্দপুর যাব মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু হুগলী ইমামবাড়ি বিকেল পাঁচটার সময় বন্ধ হয়ে যায়, তাই বাধ্য হয়ে আগেই হুগলী ঘাট যাবার জন্যে ট্রেনে উঠতে হোল। একটি

মাত্র স্টেশন, সময় লাগল মাত্র ছ'মিনিট। হুগলী ঘাট স্টেশনের পাশেই গঙ্গা। গঙ্গা পেরলেই গরিফা, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মভূমি। স্টেশন থেকে ইমামবাড়া মাত্র তিন চার মিনিটের পথ। হাজী মহম্মদ মহসীনের দানে তৈরী এই বিরাট ভজনালয় ও পান্থশালা পশ্চিমবাংলার জমকালো ভবনগুলির অন্যতম। বিশাল দোতলা বাড়ীর মাঝখানের আশি ফুট উচু জোড়া গম্বুজের দিকে তাকিয়ে যে কোন মানুষ নিজে যে কত ক্ষুদ্র সে কথা বুঝতে পারে। গম্বুজ তুটির মাঝখানে বিরাট ঘড়ি। ঘড়ির ঘণ্টার ওজন আশি মণ। গম্বুজের ভিতরের ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যায়। উপাসনাগারের দেওয়ালের সামনে সম্পুর্ণ কোরাণশরিফখানি লিপিবদ্ধ করা। উপাসনাগারের গঙ্গার দিকের বাইরের দেওয়ালে ইংরেজীতে হাজী মহম্মদ মহসীনের পুরো দানপত্রটি খোদিত। গঙ্গার ঘাটের কাছে একটি সূর্য ঘড়ি ছায়ার সাহায্যে দিনের বেলায় সঠিক সময় নির্দেশ করে।

বিরাট আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সেই বিরাট প্রাণ মহম্মদ মহসীনের কথা, যাঁর আয় সেদিন ছিল বর্তমান মুদ্রামানে বার্ষিক বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

ইমামবাড়া থেকে বেরিয়ে এলাম গঙ্গার ধারে একটি বাগানের মধ্যে ভাগীরথীতীরে তরুছায়া-সমাছন্নবাগানের মধ্যে একটি সুন্দর জায়গায়। পাশাপাশি শ্বেতপাথরে গাঁথা আড়ম্বরবিহীন ছয়টি সমাধি। প্রত্যেক সমাধির ওপর উর্দুভাষায় পরিচয়-লিপি লেখা। মনে হোলো হাজী মহম্মদ, ভগ্নিপতি সালাউদ্দিন খাঁ, বোন মন্নুবেগম, মা জনাব বেগম, বাবা আগ মহম্মদ মুন্তাহার ও গুরুদেব সৈয়দ কামালুদ্দিন, ঠিক যেন একই বিছানায় শুয়ে চিরনিদ্রায় মগ্ন। সমাধিক্ষেত্রটি আগাছায় ভরে উঠেছে, সমাধিগুলো ধুলো, বালি, পাতা ও বাতাসে উড়ে আসা আবর্জনায় ভরা, অনেক দিনের মধ্যেই কোন বাতি দেওয়া হয়নি। যে দানবীর তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করে গেলেন

মানুষের সেবায়, যাঁর টাকায় তৈরী হয়েছে বিরাট হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়া হাসপাতাল, কয়েকশ স্কুল ও মকতব, যাঁর টাকায় এখনও প্রতি বৎসর সহস্রাধিক মুসলমান ছাত্র বৃত্তি পেয়ে পড়াশুনা করে, তাঁর শেষ স্মৃতিসৌধটি ঝাঁট দেবার বা তাতে মাঝে মাঝে এক আধ দিন বাতি দেবার ক্ষমতাও কি বিশ লক্ষ টাকা আয়ের মহসীন ট্রাষ্ট ফাণ্ডের কর্তাদের নেই!

সমাধি মন্দিরের বাগানের সামনে থেকে দু'নম্বর বাসে আমাদের ফিরতে হোলো ব্যাণ্ডেল স্টেশনে। ব্যাণ্ডেল থেকে দেবানন্দপুর মাত্র দু'মাইল। রিক্‌সা ভাড়া নিল দেড় টাকা। যে সাতটা গ্রাম নিয়ে আদিকালে সপ্তগ্রাম গড়ে উঠেছিল, দেবানন্দপুর তার মধ্যে অন্যতম। এককালে এখানে আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর এসে পারসী ভাষা শিখেছিলেন। ভারতচন্দ্র নিজেই তার পাঁচালীতে লিখেছেন :

"দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দধাম,
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্‌সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে দেশে যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায় পড়াইল পারসী।"

শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে দেবানন্দপুরের পূর্ব গৌরব দূরে থাক্ শিক্ষার দিক থেকে সে আজ এক অবহেলিত গ্রাম। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি, এইটুকুই বর্তমানে দেবানন্দপুরের একমাত্র পরিচয়।

শরৎ স্মৃতিমন্দির ও পাঠাগারটি দেখে, শরৎচন্দ্রের জন্মভিটার সামনের পথ বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। সরস্বতী তীরে শরৎচন্দ্রের বাল্যের বহু স্মৃতি জড়ান। নদীর ধারে এগোতে-না-এগোতে অন্ধকার নেমে এলো। মজে যাওয়া সরস্বতীর কলতান বহুদিন স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু মজা নদীর তীর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে মুখর হয়ে উঠল। রিক্‌সাওয়ালাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আমরা ফিরলাম। ব্যাণ্ডেল স্টেশনে ফিরে দেখি, স্টেশনেই চাঁপা কলা বিক্রির যেন ছোটখাট একটা হাট বসেছে। এখানে কলা পাওয়া যায় প্রচুর, দামও বেশ সস্তা। বিষ্ণুবাবুর দেখাদেখি আমিও এক ছড়া কলা কিনে নিলাম, ট্রেন হাওড়া পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা।

## বার

### বল্লভপুর, মাহেশ

বাড়ী পৌঁছে শুনি, একটি মেয়ে বিকেলে এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। যাবার সময় একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। দেখি, টেবিলের উপর আমারই প্যাডের পাতা ছিঁড়ে লেখা। ছোট্ট চিঠি, মাত্র দুটি লাইনে কল্পনা লিখেছে: 'আগামী রবিবার ঠিক সকাল ন'টার সময় শিয়ালদা স্টেশনে গ্লোব নার্সারির কাছে দাঁড়িয়ে থাকব —কথা আছে। বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে আসবেন, ফিরতে সন্ধ্যা হতে পারে।'

বিক্ষিপ্ত মনটাকে জোর করে বশে রেখেছিলাম। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। কি কথা বলবে কল্পনা? ওর জীবন-কাহিনী জানার আগ্রহ ছিল, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও কোনদিই মুখ খোলেনি। তবে কী করে বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে যেতে বলেছে? কোথায় যাবে? শান্তিপুর? ওর মা সঙ্গে থাকবেন নাকি? ভাবনা-গুলো গড়িয়ে গেল মনের মধ্যে মুহূর্তে।

রবিবার এসে গেল। ঠিক সময়ে তৈরী হয়ে শিয়ালদায় গিয়ে দেখি, কল্পনা একাই দাঁড়িয়ে। দেখা হতেই এগিয়ে এল। হাসিমুখ। বললে, 'যাক তা হলে রাগ করেন নি।'

'রাগ করব কেন?' আমি হাসি ফেরৎ দিলাম।

'বা, আপনি যেতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যাইনি। মানে যেতে পারিনি।'

'কেন পারনি?' মোলায়েম করে বললেও কণ্ঠস্বরে আগ্রহ প্রকাশ পেল।

চকিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল কল্পনা। ক-মুহূর্ত নীরব থেকে মৃদুস্বরে বললে, 'প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে বাদানুবাদ করে লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির খোরাক না হয়ে, চলুন, কোথাও বেড়িয়ে আসি। যেতে যেতে গাড়ীতে গল্প করা যাবে।'

বুঝতে পারলাম, এবারেও সে বুদ্ধি করে আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল। কল্পনা সত্যি বুদ্ধিমতী।

বললাম, 'কোথায় যাবে?'

পরম নিশ্চিন্তে সে বললে, 'যেদিকে নিয়ে যাবেন—' বলে এমন ভাবে তাকাল যেন আমি তার একমাত্র ভরসাস্থল।

'দূরে না কাছে?'

সে বললে, 'কাছাকাছি হলেই ভালো। ফেরা যাবে সন্ধ্যার আগে।'

ভেবে নিলাম, কাছাকাছি এমন স্থান বির্বাচন করতে হবে যে-জায়গাটা নির্জন অথচ গুরুত্ব আছে। নির্জন হলে ওর সঙ্গ পাওয়া যাবে আর গুরুত্ব থাকলে ভ্রমণ-উদ্দেশ্য সফল হবে। এই ভেবে টিটাগড়ের টিকিট কেটে দুজনে ট্রেনে উঠে বসলাম। উদ্দেশ্য, গান্ধীঘাটে নির্জনে বসে কল্পনার কাহিনী শুনব, তারপর বেড়ানো।

কল্পনা আমার মনের খবর আগে কি করে টের পেয়েছিল কে জানে, গাড়ীতে উঠেই সে জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জবাব দিলাম, 'আপাতত গান্ধীঘাটে কিছুক্ষণ বসে তারপর ভাবা যাবে কোথায় যাবো।'

কল্পনা সরাসরি অনিচ্ছা জানিয়ে বললে, 'আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে গান্ধীঘাটে এসেছি এবং ভাল করেই দেখেছি। অন্য কোথাও

চলুন, টীটাগড় থেকে নদী পার হয়ে তো মাহেশ যাওয়া যায়। যায় না?'

'তা যায়।'

'তবে তাই চলুন।'

টিটাগড় স্টেশনে নেমে রিক্সা নিলাম, খেয়াঘাট পর্যন্ত।

খেয়াঘাট পার হয়েই চোখে পড়ল, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার-ওয়ার্কস্-এর ঘেরা-এলাকার মধ্যে বল্লভজীর আদি মন্দির। এটি এখন মার্টিন্‌স প্যাগোডা নামে পরিচিত। মন্দিরটি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তৈরী। পণ্ডিত রুদ্ররাম ব্রহ্মচারী এই মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে গঙ্গার ভাঙ্গন এগিয়ে আসার ফলে মন্দির পরিত্যক্ত হয়। বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য মন্দিরে। নদীর ভাঙ্গন কিন্তু মন্দিরের ঠিক তলায় এসে থেমে যায়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় খৃষ্টান পাদরী হেনরী মার্টিন এই পরিত্যক্ত মন্দির দখল করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। ভারত সরকারের পুরাকীর্তি বিভাগের একটা নোটিশ দেখলাম পাশেই। তাতে লেখা আছে : 'This Building was occupied by the Missonary Henry Martyn 1906.' ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন, এই মন্দির ও সংলগ্ন অলডিন হাউস, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কেনেন এবং বসবাস শুরু করেন।

বল্লভজীর আদি মন্দির বা হেনরী মার্টিন্‌স্ প্যাগোডা দেখে আমরা এগোলাম বর্তমান বল্লভপুরের মন্দিরের দিকে। বল্লভপুরের এই মন্দির ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার নয়নচাঁদ মল্লিক নির্মাণ করে দেন। এটি পশ্চিম বাংলার বৃহদাকার আটচালা মন্দিরগুলির অন্যতম। উঁচু প্রায় ষাট ফুট, লম্বায় পঞ্চাশ ফুট, প্রস্থেও চল্লিশ ফুটের কম হবে না। প্রবেশ পথ দক্ষিণ মুখে, সামনে বিরাট নাট-মন্দির। গর্ভগৃহে রাধাবল্লভজী ও শ্রীরাধা বিগ্রহ। পাশের ঘরে

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি। সমস্ত বিগ্রহেরই নিত্য সেবার সুব্যবস্থা আছে। মন্দিরের গায়ে খোদাই লিপি:

"শ্রীকৃষ্ণ স্মরণার্থ শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৮ । দাতা নয়ন মল্লিক। শিল্পকার শ্রীকৃষ্ণ দাস।"

রাধাবল্লভজীর বিগ্রহ কাল পাথরের। বিগ্রহ সম্পর্কে প্রবাদ: চাতরার পণ্ডিত রুদ্ররাম গৃহত্যাগ করে গঙ্গাতীরে জঙ্গলের মধ্যে এক কুটিরে ইষ্টদেবের আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এক ভিক্ষুকের বেশে তাঁকে দেখা দেন এবং বলেন, 'গৌড়ের নবাবের প্রাসাদের দরজার পাশে বিশাল এক খণ্ড কালো কষ্টিপাথর আছে, তাই দিয়ে বিগ্রহ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করো।'

রুদ্ররাম গৌড় যান এবং নবাবকে পাথরের কথা জানান। নবাবও ঐ বিশাল শিলাখণ্ড তাঁকে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ মন ওজনের শিলা রুদ্ররামের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। রুদ্ররাম অক্ষমতায় কাঁদতে থাকেন। তখন স্বপ্নাদেশ হয়: 'শিলাখণ্ড গৌড়ে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে তুই ফিরে যা।' রুদ্ররাম পাথরখানি বহু কষ্টে লোকজনের সাহায্যে গঙ্গার জলে ফেলে, বল্লভপুর গঙ্গাতীরে (বর্তমানে যেখানে হেনরী মার্টিনস্) ফিরে আসেন। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, শিলাখণ্ড গঙ্গার স্রোতে এসে ঐ ঘাটে লেগেছে। সেই শিলাখণ্ড থেকে তিনটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ তৈরী করা হয়। বর্তমানে ঐ তিনটি বিগ্রহ তিন জায়গায় পূজিত হচ্ছে। বল্লভপুরে রাধাবল্লভ, খড়দায় শ্যামসুন্দর ও সাঁইবনে নন্দদুলাল রূপে। বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর অনেকের ধারণা একই দিনে এই তিন বিগ্রহ দর্শন করলে আর পুনর্জন্মের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। আবার কারও কারও ধারণা, একই দিনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে উপবাসি থেকে এই তিন বিগ্রহ দর্শন করলে কলির তিন প্রভু গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত দর্শনের পূণ্যলাভ হয়।

কল্পনা বললে, 'আমরা খড়দার শ্যামসুন্দরের মন্দিরের পূজারীদের

মুখে শুনেছিলাম, গৌড় থেকে পাথর আনেন খড়দার বীরভদ্র গোস্বামী। এখানে শুনতে পেলাম পাথর আনার কৃতিত্ব বল্লভপুরের রুদ্ররামের। শিলাখণ্ড যিনিই আনুন না কেন, তিন বিগ্রহ দেখলে পুণর্জন্ম হবে না, এটা ঠিক।' এই বলে কল্পনা ছেলেমানুষের মত হুজুক্ তুলল, 'চলুন, আমরা গঙ্গা পার হয়ে শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল দর্শন করে আসি।'

তাকে এবার ধমক দিতে হোল: 'এতখানি এসে মাহেশের জগন্নাথ না দেখে ফেরা যায় না। আর পুণর্জন্মের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এই মাহেশেই আসতে হবে রথের দিন, তিন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। মাহেশের জগন্নাথকে রথে-চড়া অবস্থায় দেখলে পুণর্জন্ম হয় না। শাস্ত্রে আছে:

"রথেতু বামনাং দৃষ্টা পুণর্জন্মং ন বিদ্যতে।"

বল্লভপুরের মন্দিরে যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ দেখলাম তাদের সম্পর্কে শোনা গেল: আগে মাহেশের কমলাকর পিপলাই সেবিত জগন্নাথ বিগ্রহ রথে চড়ে আসতেন বল্লভপুর পর্যন্ত। বল্লভপুরের মন্দিরই ছিল মাহেশের জগন্নাথের গুণ্ডিচা বাড়ী বা মাসি বাড়ী। মাহেশের জগন্নাথ উল্টোরথ পর্যন্ত থাকতেন বল্লভপুরের মন্দিরে। তারপর জগন্নাথ ফিরে যেতেন মাহেশে, নিজ মন্দিরে। রথের সময়ের প্রণামীর টাকা পয়সার ব্যাপারে নাকি দুই মন্দিরের সেবাইতদের মধ্যে হয় মনোমালিন্য। ফলশ্রুতি, বল্লভপুর মন্দিরের সেবাইতরা পৃথক জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

বল্লভপুর থেকে আমরা গেলাম মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে, এই শিখর মন্দিরটিও কলকাতার নয়ন চাঁদ মল্লিক মশায়ের অর্থ সাহায্যে নির্মিত। এটি তৈরী হয়েছে বল্লভপুর মন্দির তৈরীর ন-বছর আগে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে, রাধাবল্লভজীর মত মাহেশের জগন্নাথের আদি মন্দির ছিল গঙ্গার পাড়ে। গঙ্গার ভাঙন এগিয়ে আসার জন্য সে মন্দিরও

পরিত্যক্ত হয়েছে। মাহেশের জগন্নাথ সম্পর্কে প্রবাদ: ভক্ত প্রবর ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী জগন্নাথ দর্শনের জন্যে পুরী যাচ্ছিলেন, পথে স্বপ্নাদিষ্ট হন, 'মাহেশেই থেকে যা, আমি আসছি।' পরদিনই তিনি গঙ্গাবক্ষে একখণ্ড ভারী নিমকাঠ ভেসে আসতে দেখেন। ঐ কাঠ থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ নির্মাণ করে গঙ্গাতীরেই জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত হন।

'নিশা অবসানে দেখিলা স্বপনে বলেন জগতস্বামী
চলে যাও দেশে রহিব মাহেশে রেখে যাও হেথা তুমি।
ঘুম ভেঙ্গে উঠি জুড়ি কর দুটি স্বপনের কথা কয়
শুনে ধ্রুবানন্দ আনন্দে মগন, 'জয় জগন্নাথ জয়॥

বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা: মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁর দ্বাদশ গোপাল বা বারজন পার্শ্বচরের অন্যতম কমলাকর পিপলাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন নীলাচলের পথে। যেদিন তিনি মাহেশে উপস্থিত হলেন সেই দিনই বৃদ্ধ ধ্রুবানন্দের অন্তিম সময় সমাগত। ধ্রুবানন্দ মহাপ্রভুকে অনুরোধ জানালেন, 'জগন্নাথের সেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে অন্তিমকালে আমাকে দায়িত্ব মুক্ত করুন, প্রভু।'

মহাপ্রভু আদেশ দিলেন, কমলাকরকে জগন্নাথ সেবার ভার নেবার। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের আদেশে হিজলীর অন্তর্গত খালিজুলির জমিদার-তনয় কমলাকর পিপলাই থেকে গেলেন মাহেশে জগন্নাথ সেবার দায়িত্ব নিয়ে। তদবধি পিপলাই বংশ পুরুষানুক্রমে জগন্নাথের সেবা করছেন।

মাহেশ বৈষ্ণবদের দ্বাদশ গোপালের পাঠের অন্যতম।

ভারতের বৃহত্তম রথযাত্রা উৎসব হিসাবে পুরী প্রথম, দ্বিতীয় এই মাহেশ। বর্তমানে মাহেশ জগন্নাথের যে বিরাট রথখানি আছে সেটি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র বসু নির্মাণ করান। রথের সময় জি, টি, রোডে রথ-টানা হয়। এই উপলক্ষে মাহেশে প্রায় একমাস ব্যাপী বিরাট

মেলা হয়। স্নানযাত্রা উপলক্ষেও মাহেশে যে মেলা হয় তাতেও লোক সমাগম হয় প্রচুর।

অপরাহ্ণ বেলায় অসময়ে যাবার জন্য জগন্নাথ-মন্দিরে চরণামৃত ভিন্ন অন্য কোন রকম প্রসাদ না জুটলেও, মাহেশের বিখ্যাত গুপো সন্দেশ খেয়ে সন্ধ্যার পর আমরা হাওড়া হয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

## তের

### পালপাড়া

ফেরার পথে কল্পনাকে বললাম, সামনের সপ্তাহে তোমার সঙ্গে বেরতে পারব না। সজল সেন ও গোপালবাবুকে কথা দিয়েছি তাদের সঙ্গে নদীয়া জেলার পালপাড়ায় যাব।

একটু যেন মনক্ষুন্ন ভাবে কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'কটায় ফিরবেন?'

'ঠিক বলতে পারি না, তবে খুব দেরী না হতেও পারে। সন্ধ্যা নাগাদ নিশ্চয়ই ফিরব।'

সেদিন আর কোন কথা হোল না। বুঝলাম, কল্পনা কোন কারণে আশাহত হয়েছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আগেই কথা দেওয়া আছে, সেটা তো খেলাপ করতে পারি না।

রবিবার সকাল সওয়া নটার মধ্যেই তিন বন্ধুর হাজির থাকার কথা ছিল শিয়ালদা স্টেশনের ছ'নম্বর প্লাটফরমে। প্লাটফরমে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। এক বিরাট বাহিনী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সজল সেনের একা যাবার কথা; তার সঙ্গী হয়েছেন সজল গৃহিণী, দুটি পুত্র এবং স-ভর্তা তার শ্যালিকা। গোপাল বাবুরও যাবার কথা একাই, তিনি সপরিবারে এবং সপ্রতিবেশীবর্গ, তার দলে সাতজন। দলের দিকে মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

গুনে দেখলাম, আমাকে নিয়ে চোদ্দজন। এরা কেউই সাজ পোষাকে ও সারঞ্জামে আমার মত বাউণ্ডুলে নয়। কাঁধে কাঁধে ফ্লাস্ক, জলের বোতল, ক্যামেরা, শান্তিনিকেতনি ব্যাগ আর ভ্যানিটি ব্যাগ। ছেলেদের হাতের ব্যাগ ও চুপড়ীর আকৃতি ভয়াবহ। সজল সেনের ছেলে দুটি আমাকে দেখে দৌড়ে এল, হাত ধরে বললে, 'আজ আমরাও বেড়াতে যাচ্ছি!' অবাক হয়ে সজল সেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দল না হয় ভারীই হোল কিন্তু এত জিনিষ? এসব কি হবে? যাব তো মাত্র এক বেলার জন্যে।'

সজল নিরুত্তর। তার প্রতিবেশী ভদ্রলোক, হাতে দশসেরী একটা চুপড়ি। উত্তর দিলেন, 'আপনারা দর্শনার্থী, ভ্রমণার্থী নন; বড়জোর আপনাদের ভ্রমণের বার্তাবহ বলতে পারি। ভ্রমণ একটা বিলাস, তাই ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে কিছু বিলাস-দ্রব্য থাকবেই।'

বুঝতে পারলাম, একসঙ্গে যাত্রা বটে কিন্তু উদ্দেশ্য এক নয়।

নটা পঁচিশ মিনিটে কৃষ্ণনগর লোকাল ছাড়ল। অন্য দিন এই ট্রেনে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ও কাঁচড়াপাড়া কারখানার কর্মীদের জন্যে বেশ ভীড় হয়; রবিবার বলে প্রায় খালি। এ ট্রেনখানি লোকাল হলেও নৈহাটী পর্য্যন্ত যেতে শুধু দমদম ও ব্যারাকপুর থামল। বেলা দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় ট্রেন পালপাড়া স্টেশনে পৌঁছল। অতি ছোট ফ্লাগ স্টেশন, সব গাড়ী থামেনা। কলকাতা থেকে দূরত্ব ষাট কিলোমিটার, ভাড়া একটাকা তিরাশী পয়সা।

স্টেশনের পশ্চিম দিকে এক মিনিটের পথ গেলে, মহেশ পণ্ডিতের পাঠ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বাদশ গোপালের একতম মহেশ পণ্ডিত। মহেশ পণ্ডিত ছিলেন পরিব্রাজক। মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর, মহেশ পণ্ডিত মহাপ্রভু প্রদত্ত নিতাই-গৌর মূর্তি নিয়ে শিমুরালীর পশ্চিমে সুখসাগর নামক জায়গায় বাস করতে থাকেন। ভাগীরথীর গতি-পরিবর্তনের ফলে সুখসাগর গঙ্গাগর্ভে চলে গেলে, মহেশ পণ্ডিত বিগ্রহসহ পালপাড়ায় আসেন। মহেশ পণ্ডিতের

মৃত্যুর পর তার পূজিত বিগ্রহ, গত সাড়ে চারশ বছর বিভিন্ন ভক্তের দ্বারা সেবিত হয়। পালপাড়া গ্রামের ৺বিমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ী থেকে ষোল বছর আগে, কয়েকজন বৈষ্ণবভক্ত ঐ বিগ্রহ এনে বর্তমান প্রাঙ্গণে একটি মন্দির তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করেন।

একদা বহু পণ্ডিতের বাস থাকলেও বর্তমানে পালপাড়া একটা জনবিরল গ্রাম। অতি শান্ত নির্জন পরিবেশে শ্রীপাঠ। পাশেই দুটি অতি প্রাচীন শিবমন্দির। জায়গাটি অতি পবিত্র, আদর্শ ভজনের স্থান। পরিবেশের নির্জনতা ও ভাবগাম্ভীর্যে আমাদের দলের ছেলেগুলোও যেন কেমন নির্বাক হয়ে গেল। পরিবেশ এত শান্ত ও সুন্দর যে পাথরে বাঁধান নাটমন্দির ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।

শ্রীপাঠ থেকে বেরিয়ে আমরা পশ্চিম দিকে নবাবী সড়ক ধরে পালপাড়ার প্রাচীন মন্দির দেখতে গেলাম। এই পথের পাশ দিয়ে এক সময় গঙ্গা বয়ে যেত। গঙ্গা গতি-পরিবর্তন করেছে, এখন গঙ্গার ধারা এখান থেকে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে সরে গেছে। এই রাস্তাটির সাথে ইতিহাসের স্মৃতি জড়ান। এই সড়ক পথে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ থেকে সৈন্য চালনা করে কলকাতা আক্রমণ করেন। রাস্তার একদিকে গাছের সারি, অন্যদিকে প্রায় পনের ফুট নিচু শুকনো গঙ্গার খাদ! মাটির পথ খুব চওড়া কিন্তু একেবারে নির্জন। পথের পাশে গ্রাম্য পাঠশালা। পাঠশালার উঠানে একটা টিউবওয়েল। আর একটু আগেই মন্দির। আমরা সেটি দেখবার জন্যে এগোতে লাগলাম।

এই মন্দিরটি পশ্চিম বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম। সম্ভবতঃ পাল বা সেনযুগের তৈরী। পোড়ামাটির কাজগুলি সুন্দর। প্রথমে কি মূর্তি ছিল জানা যায় না। বহু বৎসর জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকায় মন্দিরে কোন মূর্তি ছিল বলে মনে হয় না। কয়েক বৎসর আগে স্বরূপানন্দ অবধূত নামে এক সন্ন্যাসী মাটির তৈরী এক কালী মূর্তি

এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মন্দিরের কাছে তিনি নিজের বাসের জন্যে একটা আস্তানাও তৈরী করে নিয়েছেন।

আমার সঙ্গীরা মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের কয়েকটা ফটো তুললেন। কাছেই একখণ্ড কৃষিক্ষেত্রের মাঝে মহেশ পণ্ডিতের সমাধি।

আমরা মন্দির দেখা শেষ করে নবাবী সড়ক বেয়ে একটু ফিরে এসে পাঠশালার বারান্দায় বসলাম। রবিবার পাঠশালা বন্ধ, চারিদিক নির্জন। গোপালবাবু তার ব্যাগের ভিতর থেকে সতরঞ্চি বের করে তার উপর গা ছড়িয়ে দিলেন। পাশে বকুলতলায় ছেলেপিলেরা ফুল কুড়ুতে আরম্ভ করল। গোপালবাবুর স্ত্রী, সজল গৃহিণী ও গোপালবাবুর প্রতিবেশী পত্নী নিজ নিজ খাবারের ঝোড়া খুললেন। অত সকালে বেরোতে হয়েছে, কেউই ডান হাতের কাজ সেরে আসতে পারেনি। কিন্তু তিন গৃহিণীর আনা খাবার আমরা সবাই মিলে শেষ করতে পারলাম না। বাকিটা ফেরার পথে গাড়ীতে সদ্ব্যবহারের জন্য রাখা থাকল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা পালপাড়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে হাঁটা সুরু করলাম, বাওড়ের (প্রাচীন মজে-যাওয়া গঙ্গার ধারা) ধারে ধারে। তিন সরু পায়ে চলা পথে একের পিছে এক হেঁটে চলেছি। ছোট বড় নারীশিশুর চোদ্দ জনের এক মিছিল। চারিদিকে আরণ্যক শোভা, সবারই মন এমন ভাবে ভরে গিয়েছে যে কারও মুখে কথা নেই। প্রাচীন ভাঙ্গা জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়ে, মাইল খানেক হেঁটে আমরা পৌছলাম যশোড়ার জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠ।

যশোড়া একসময় কায়স্থ জমিদার-প্রধান গ্রাম ছিল। প্রবাদ, মহাপ্রভুর নীলচলে অবস্থানের সময় একবার জগন্নাথ নবকলেবর ধারণ করেন। আগের পরিত্যক্ত জগন্নাথের দারুময় বিগ্রহ, জগদীশ পণ্ডিত গ্রহণ করে নিয়ে চলেন শ্রীক্ষেত্র থেকে নবদ্বীপের পথে। উদ্দেশ্য অভিষেক করে বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। বিশাল বিগ্রহ

দণ্ডে ঝুলিয়ে দুজনে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন। পথিমধ্যে যশোড়ায় রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জগন্নাথকে কাঁধে তুলবার সময় আর ওঠাতে পারলেন না দারু-মুর্তি শিলার চেয়ে বেশী ভারী বোধ হোল। দৈবাদেশ হোল, 'আমি এইখানেই অবস্থান করব। তদবধি জগন্নাথ এখানে আছেন। জগদীশ পণ্ডিত বাকি জীবন এইখানেই বসবাস করে জগন্নাথের সেবা করে যান। জগদীশ পণ্ডিতের বংশধরেরা যদিও আছেন, তবু বর্তমানে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা করছেন গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীরা। যশোড়া মন্দিরের যদিও বহুদিন সংস্কার করা হয়নি তবুও একসময় যে মন্দিরের জাঁকজমক ছিল সেটা এখনও বোঝা যায়। মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহ ছাড়াও আছেন গৌরগোপাল। মন্দিরের বাইরে গাছতলায় মেলা ক্ষেত্র ও রাসমঞ্চ। রাস ও স্নান যাত্রা উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। গঙ্গা এক সময়ে মন্দিরের খুব কাছে ছিল। বর্তমানে কিছুটা সরে গেছে। কাছাকাছি পাকা রাস্তা চাকদা স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছে। এই পথে চাকদা স্টেশন প্রায় দেড় মাইল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে রিক্সা করে আমরা চাকদা স্টেশনে এলাম। ভাড়া নিল প্রতি রিক্সা, পচাত্তর পয়সা। চাকদা থেকে ট্রেনে শিয়ালদা পৌঁছলাম দেড় ঘণ্টায়।

## চোদ্দ

উত্তরপাড়া

বাড়ি পৌঁছতে রাত্রি নটা বেজে গেল।

ক্লান্ত ছিলাম, অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আমার ঘরে আলো জ্বলছে। আর কে-যেন পিছন ফিরে বসে, তার মাথার এলো চুল চেয়ারের পিঠ ছাপিয়ে ঢলের মতো প্রায় মেঝে অবধি নামানো। এই ধরণের রাশিকৃত চুল দেখেই কি কবি লিখেছিলেন, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা?' হঠাৎ ওই লাইনটা আমার মনে পড়ল। বাস্তবিক, যেন একখানি ছবি। সেই সুঠাম বরতনু পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, তার ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছা হোল না। পা টিপে টিপে ফিরে যাচ্ছিলাম।. মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধ হয় সত্যি আছে, নইলে আমার নিঃশব্দ উপস্থিতি সে টের পেল কি করে?

কল্পনা মুখ ফেরাতেই আমাকে দেখতে পেল। ওর যা স্বভাব, তড়বড় করে বললে, 'বাব্বা, এতক্ষণে ফেরা হোল! আমি তো উঠে পড়তাম এখনি, সেই সন্ধ্যা ছ'টা থেকে বসে আছি। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়ে আসুন, নো টাইম। বাড়ি ফিরতে হবে সাড়ে ন'টার মধ্যে।'

হেসে বললাম, 'তাহলে তোমার কথাই আগে শুনি। বলো, কি খবর?'

ঘরে ঢুকে ওর কাছাকাছি বসলাম।

'না, খবর কিছু নয়। এমনি।' সে কেমন লজ্জা পেল।

'তা কি হয়? নিশ্চয় কোন দরকারে এসেছো। কোথাও বেড়াতে যাবার তাগিদ?'

ওকে সেই ধরিয়ে দিতেই ওর মনের বাধা দূর হয়ে গেল। সে বললে, 'বাস্তবিক যারা ভ্রমণের স্বাদ পেয়েছে তাদের পক্ষে বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা এক নিদারুণ যন্ত্রণা। আগামীকালও ছুটির দিন, বন্ধুদের নিয়ে খুব তো দেশ দেশান্তর ঘুরলেন, এবার আমার পালা। কোন কথা শুনছিনে, আগামীকাল মধ্যাহ্নআহার সেরেই আমি এখানে এসে উপস্থিত হচ্ছি ঠিক দুপুরবেলা, আপনি তৈরি থাকবেন।'

'বড্ড জুলুম হয়ে যাচ্ছে না?' আমি রসিকতা করতে গেলাম।

কল্পনা বললে, 'নারীসঙ্গ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করতে হয়। চলি।'

অত্যন্ত চতুর, আমাকে কথা বলবার সুযোগ না-দিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন একখানি হিল্লোলিনী বিদ্যুৎ!

পরদিন তখনও সাড়ে দশটা বাজেনি, আহারাদি দূরে থাক, স্নান পর্যন্ত করিনি, কল্পনা এসে হাজির। তাকে বসতে বলে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলাম।

বেরবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবে ঠিক করেছো?'

একগাল হেসে কল্পনা বললে, 'তা তো জানিনে। আপনি যেদিকে নিয়ে যাবেন।'

সেই নির্ভরতা এবং সেই বিশ্বস্ততা। অথচ এখনও পরিচয় জানিনা ভালো, ঘনিষ্ঠতা খুব একটা হয়নি। তবুও বেরিয়ে পড়লাম। আপাতত উদ্দেশ্যবিহীন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনস্থ করলাম, উত্তরপাড়া যাওয়া যাক। তাই হোল। বারটা দশ মিনিটের ট্রেনে চেপে ঠিক সাড়ে বারটার মধ্যে উত্তরপাড়া পৌঁছে গেলাম। প্রথম আকর্ষণ রাজা প্যারীমোহন কলেজ। সুন্দর বাড়ি। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। ছুটির দিন থাকায় কলেজ বন্ধ। সৌম্যদর্শন দু'জন ভদ্রলোক কলেজের গেটের কাছে বসে নিজেদের মধ্যে গল্পে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের কাছে

কলেজের ইতিহাস জানতে চাইলাম। বৃদ্ধ অতি রসিক, আমাদের বসতে ইংগিত করে তিনি আরম্ভ করলেন :

"ভাই, এখানকার সবই উল্টো, সব জায়গায় দেখবে ছেলে স্কুল কলেজ গড়ে নামকরণ করে বাবার নামে। এই যেখানে বসে আছি এখানে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্কুলের উন্নতি হয়ে এটি কলেজ হয়। প্রতিষ্ঠা বুড়ো বাবার হাতে, কিন্তু উল্টো পাড়ার উল্টো লোকেরা কলেজের নাম দিয়েছে, জয়কৃষ্ণের মেজ ছেলে রাজা প্যারীমোহনের নামে।'

উল্টোপাড়া কেন জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ যা বললেন তার মর্মার্থ হোল, কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় রাঢ়ী মুখোপাধ্যায় বংশীয়েরা তিনটি বিখ্যাত জমিদার বংশ প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিম বাংলায়, একটা উত্তরপাড়ায়, একটি গোবরডাঙায় আর তৃতীয়টি উলার জমিদার বংশ। এদের মধ্যে যাদের বাস সর্ব দক্ষিণে, তারা হলেন উত্তর পাড়ার বংশ। আবার ভাই দেখ, হুগলী জেলার যে পাড়া সবচেয়ে দক্ষিণে তার নাম উত্তরপাড়া, এর দক্ষিণে যেতে হলে সুরু হবে হাওড়া জেলা। সেইজন্যেই আমি আমার গ্রামকে উত্তরপাড়া না বলে উল্টোপাড়া বলি। এখানকার জনচরিত্রও একটু উল্টো, সব জায়গায় প্রজার রক্ত শোষণ করে নিজের সখ মেটান ফুর্তি করেন জমিদার, আমাদের মুকুট-হীন জমিদাররা প্রজাশোষক নন। শহরের যেদিকে তাকাবেন, চোখে পড়বে তাঁদের বদান্যতার নিদর্শন।

রসিক বৃদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে এগোলাম ভাগীরথীর তীরে জয়কৃষ্ণ পাঠাগার দেখার উদ্দেশে। সুরম্য অট্টালিকাই বলব। কলকাতার বাহিরে পশ্চিম বাংলায় যতগুলি পাঠাগার আছে তার মধ্যে এটা শুধু বৃহত্তম নয়, শ্রেষ্ঠতম বলা যায়। বর্তমানে এটির পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে একটি সরকার মনোনীত কমিটির উপর। এই প্রাচীন পাঠাগারের সঙ্গে বহু স্মৃতি জড়ান। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কবি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন গ্রন্থাগার ভবনের একটি কক্ষে বাস করেন। গঙ্গার ধারে প্রশস্ত সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করলাম, এই সেই পবিত্র স্থান যেখানে আলিপুর জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শন সম্পর্কে প্রথম অভিভাষণ দেন। গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এ নিয়ে ইতিহাস রচিত হতে পারে।

ধীরে ধীরে এগোলাম মাণিকপীরের দরগার দিকে। হিন্দু-মুসলমান কামনার্থীর ভীড় সেখানে। এরা নিজ নিজ কামনা পূরণের আশায় সিন্নি চড়াতে এসেছে। ছুটির দিন বিভিন্ন চটকল এলাকার লোকের ভীড়ই বেশী।

উত্তরপাড়ার রাস্তায় এত রিক্‌সা যে হর্ণের শব্দে পথচারীরা বিরক্ত না হয়ে পারে না। কিন্তু খুশী হলাম, যখন মাত্র চল্লিশ পয়সা চাইল দু'জনকে ভদ্রকালী পর্যন্ত নিয়ে যেতে। হাজার বছরেরও প্রাচীন বুড়ো শিব ও ভদ্রকালী এই অঞ্চলের সকলেরই ভোলা বাবা ও মা নামে পরিচিত। বর্তমানের ভদ্রকালীর মন্দিরটি বাংলা ১১১০ সালে শেওড়াফুলির রাজা মনোহর রায় নির্মাণ করান। দেবীর নামেই পাড়ার নামও ভদ্রকালী।

পাথরের চতুর্ভূজা মুর্তি। শিবের শায়িত দেহের উপর উপবিষ্টা। দেহ সম্পূর্ণ নিরাভরণ। বাঁ হাতে খড়গ ও নরমুণ্ড, ডান হাত দুটি বর ও অভয় প্রদান করছে। পাথরের মূর্তি কিন্তু এত কোমল এত সজীবতাপূর্ণ, ভীষণতা ও মাধুর্যের এমন সমন্বয়, কোন কালীমূর্তিতে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। আমাদের আগ্রহের সঙ্গে মন্দির দর্শন করতে দেখে একজন অবাঙ্গালী ভক্ত এসে আমাদের কপালে প্রসাদী সিন্দুর লাগিয়ে দিল। সাধারণ মন্দিরের পুজারী বা সেবাইতের মত মনে করে তাকে দক্ষিণা দিতে গেলে সে হাত জোড় করে বললে, আমিও এসেছি পূজা দিতে, সুদূর বিহারের দুমকা জেলা থেকে।'

'এত দূর থেকে?' প্রশ্ন করল কল্পনা।

উত্তরে ভক্তটি যে কথা বলল তার মর্মার্থ : আদ্যাশক্তি মহামায়া চার অংশে বিভক্ত হয়ে চার রূপে ভারতের চার বিখ্যাত তীর্থে বিরাজমান ছিলেন :

'কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া, মথুরায়াং মহেশ্বরী।

দেড় হাজার বছর আগে ভক্ত প্রবর কুমারস্বামী এসেছিলেন গঙ্গাসাগরে মকরসংক্রান্তির স্নান করতে। ফিরবার পথে বৃদ্ধ সাধক আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন এই গঙ্গার তীরে চলৎশক্তি রহিত হয়ে। বৃদ্ধ সাধকের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভদ্রকালী তাকে স্বপ্নে দর্শন দেন, 'আমি এখানে তোর কাছেই থাকব। তোর আর কুরুক্ষেত্রে ফেরার দরকার নেই।' পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে জলের মধ্যে ভক্তপ্রবর বিগ্রহটি পান এবং এনে প্রতিষ্ঠা করেন। অবাঙ্গালী ভদ্রলোক বৃন্দাবনে গিয়ে কাত্যায়নী, দ্বারকায় মহামায়া এবং মথুরায় গিয়ে মহেশ্বরী দর্শন করে এসেছেন এখন ভদ্রকালী দর্শনের জন্য কুরুক্ষেত্র না গিয়ে এসেছেন উত্তরপাড়ায়। তার ধারণা কলিযুগে ভদ্রকালীর অবস্থান গঙ্গাতীরে।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে এলাম সহরের কেন্দ্রস্থলে। চা পিপাসু আমরা। এখানে চা কিম্বা ভাল খাবারের দোকানের অভাব নেই। পাইস হোটেলও দুটি চোখে পড়ল। কিন্তু খাবারের দাম কলকাতার চেয়ে কম না, বরং মিষ্টির আকার যেন কিছুটা ছোট। বিভিন্ন রুটের বাস যেতে দেখলাম উত্তরপাড়ার উপর দিয়ে।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলো উত্তরপাড়া রেলওয়ে লাইনের ধারে হিন্দমোটরের কারখানার এলাকার মধ্যে বিড়লা ট্রাষ্ট ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়ণজীর আধুনিক স্থাপত্যের মন্দির দর্শনের ইচ্ছা এবারের মত বাতিল করলেও ওয়েষ্ট বেঙ্গল টুরিষ্ট এসোসিয়েসনের নবনির্মিত নিজস্ব বাড়ি ও ভ্রমণ-সাহিত্যের পাঠাগার দেখে ফিরব

মনস্থ করলাম। একটা অপেশাদার ভ্রমণার্থী সংস্থার নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করার নজীর পশ্চিম বাংলায় এই প্রথম। নিছক কয়েকটা ভ্রমণ-রসিক যুবকের উৎসাহ ও ভ্রমণের মাধ্যমে গড়ে তোলা এই সংস্থা ভ্রমণ-রসিকের কাছে একটা ছোটখাট তীর্থস্থান বিশেষ বলা চলে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য :

"আমরা যেদিন এলেম সেদিন দীপ জ্বলে না ঘরে।"

সাধারণত ছুটির দিন নাকি পাঠাগারটি কোলাহলমুখর থাকে। সেদিন সভ্যদের অনেকেই কোন একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ায় তখনও কেউ এসে ঘর খোলেনি। দরজার বাইরে থেকে ভ্রমণার্থীর তীর্থকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে দুজনে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম। মনে আশা রইল, ওয়েষ্ট বেঙ্গল টুরিষ্ট এসোসিয়েসনের নতুন পাঠাগার ও বাড়িটা একদিন ভাল করে দেখব।

## পনের

### বেলুড়—বালী

কদিন ধরে ভাইপো বিজু আর বাপ্পার তাড়না : যেহেতু পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। অক্ষয়দা ইন্ধন যোগালেন : 'চল কাছে কোথাও ঘুরে আসি, আমার ছেলেমেয়ে দুটোকেও নিয়ে যাব।' ঠিক করলাম বেলুড় ও বালী এলাকায় ঘুরে আসব।

সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে কোনমতে আহারাদি সেরে, এগার-বার বছরের দুটি ছেলের হাত ধরে হাওড়া স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম। অক্ষয়দার দেখা নেই। এদিকে প্রতি দশ-বার মিনিট অন্তর বেলুড়গামী একখানা করে লোকাল ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। ন'টার সময় দেখি দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে প্লাটফর্মে ঢুকছেন অক্ষয়দা, তাঁর পিছনে এক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ অন্য হাতে একটা মস্ত বড়

প্লাস্টিকের চুপড়ি নিয়ে অক্ষয় বৌদি। দাদার কৈফিয়ৎ: তোমার বৌদি বায়না ধরল সঙ্গে যাবেন। একালের সতীরা পতির পুণ্যে বিশেষ নির্ভর করেন না কিনা…আর জানোই তো, তাঁদের সাজের জন্যে মিনিমাম এক ঘণ্টা গ্রেস দিতেই হয় তাই—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৌদি বলে উঠলেন; 'থাক থাক। চার চারটে দুধের শিশু নিয়ে বেরোচ্ছেন, কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই, একটু জলখাবার তৈরী না করে বেরুই কি করে?'

স্বামী স্ত্রীর চাপানোত্তর শুনতে শুনতে ট্রেনে চেপে বসলাম। মাত্র বার মিনিট সময়ের মধ্যে সাত কিলোমিটার দূরে বেলুড় স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

সামান্য পথ। সবাই কথা বলতে বলতে বেলুড়মঠের দিকে এগোলাম। বলা বাহুল্য বৌদির সাড়ে চার কেজি ওজনের টিফিন-চুপড়ি আমার ঘাড়ে চেপেছে। বাইরে জুতো জমা রেখে আমরা প্রথমেই উঠলাম রামকৃষ্ণ মন্দিরে। রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে। তাঁর সাধনক্ষেত্র গঙ্গার পূর্ব পারে দক্ষিণেশ্বর। বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে তার প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। এই রামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে পরমহংস দেবের জন্ম শত বার্ষিকীতে। মন্দিরের উদ্বোধন হয় আরো দু বছর পর ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে। মন্দির নির্মাণের ব্যয় হয় আট লক্ষাধিক টাকা। মন্দির নির্মাণের ব্যয়ের অধিকাংশই বহন করেন দু'জন আমেরিকাবাসী। বেলুড়ের এই রামকৃষ্ণ মন্দির আধুনিক মন্দির-শিল্পের উচ্চতম নিদর্শন। এর ভিতরের পরিবেশও অত্যন্ত ভাবগম্ভীর। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম (ক) আদি মন্দির—যেখানে বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যরা উপাসনা করতেন। (খ) বিবেকানন্দ গৃহ—যে ঘরে বিবেকানন্দ বেলুড় থাকাকালীন অবস্থান করতেন এবং যে ঘরে স্বামীজি ১৯০১ সালের ৪ঠা জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (গ) ব্রহ্মানন্দ

মন্দির—এই মন্দিরে রয়েছে মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের (১৮৯৯-১৯১২) শ্বেত পাথরের মূর্তি॥ মন্দিরের নির্মাণকাল ১৯২৪। (ঘ) সারদা মাতার মন্দির, এটি তৈরী হয়েছে ১৯২০ খৃস্টাব্দে (ঙ) বিবেকানন্দ মন্দির যেখানে স্বামীজির দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হয়।

বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে আমরা বাসে করে মাত্র আধ মাইল উত্তরে লালবাবা কলেজের কাছে নেমে চললাম গঙ্গার ধারে। প্রথমে পৌছলাম গঙ্গাতীরে মহাপ্রভু মন্দিরে। বাংলা ১৩২১ সালে কাশীনাথ মল্লিকের সহধর্মিনী রঙ্গনামণি দাসী প্রতিষ্ঠা করেন। পাশেই ১০৮ প্রভুজীর সমাধি মন্দির ও লালবাবা মঠ। ১০৮ প্রভুজী মুর্শিদাবাদের গণেশচন্দ্র দে মহাশয়ের ভ্রাতৃবধু। ইনি ছিলেন অপূর্ব-রূপসী এবং পরমা ভক্তিমতী। ইনি সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে এমন বিভোর হয়ে থাকতেন যে, তিনি লেডি গৌরাঙ্গ নামে জনসাধারণে পরিচিত হন। এর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর সমাধির উপর এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। একটি ট্রাস্টি সংস্থা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ২৯শে চৈত্র ১০৮প্রভু মাতাজীর তিরোভাব উৎসব হয়।

লেডি গৌরাঙ্গ মন্দিরের উত্তর পাশেই, লালবাবা মন্দির ও মঠ; মন্দির সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও যাত্রীনিবাস। গঙ্গার ঠিক উপরে তৈরী এই যাত্রীনিবাসে বহু সাধু মোহান্ত বাস করছেন। এরা সবাই পূজা আরাধনা নিয়ে ব্যস্ত; আমাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজনও এরা কেউ বোধ করলেন না। শুনলাম, শুধু থাকা নয় এদের আহারাদির ব্যবস্থাও করা হয় লালবাবা মঠের তরফ থেকে।

লালবাবা মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম রাধারমণজীর মন্দিরে। স্থানীয় লোকেরা একে রাসবাড়ী বলে। রাসের সময় এখানে চারদিনব্যাপী উৎসব ও মেলা হয়। গঙ্গার উপর বিশাল প্রশস্ত বাগানের মধ্যে রাসমঞ্চ ও রাধারমণ মন্দির। রাধারমণ মন্দিরের ছ'পাশে ছটি শিব মন্দির। রাধারমণ মন্দির সকাল ছ'টা থেকে বারটা

এবং বিকালে চারটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত খোলা থাকে। বাংলা ১২৯৭ সালে এই মন্দির ও উদ্যানবাটি তৈরী করান জোড়াসাঁকোর দাঁ পরিবার। একসময় রাসবাড়ী গঙ্গাতীরের সুন্দরতম মন্দির উদ্যান-গুলির অন্যতম ছিল। বর্তমানে অযত্নে এর সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। তবে এতবড় মন্দির-এলাকার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য।

রাসবাড়ীর পাঁচিলের উত্তর গায়েই গঙ্গার ধারে কঙ্কেশ্বর শিবতলা। বর্তমানে অতি অবজ্ঞাত অবস্থায় এক ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে মাথাভাঙ্গা কঙ্কেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত। এই শিব কতকাল এখানে আছেন তার ইতিহাস জানা যায় না। তবে কিম্বদন্তী, কালাপাহাড় স্বহস্তে এর মাথা তরবারীর আঘাতে ভেঙ্গে দেন। বৈশাখ মাসে মেয়েরা বহুদূর থেকে কঙ্কেশ্বরের মাথায় জল দিতে আসেন।

বিরক্ত বিজু মন্তব্য করল, 'কি ভাঙ্গা মন্দির দেখছ, এর চেয়ে আমাদের পাড়ার শিববাড়ী অনেক ভাল।' হেসে আমরা পশ্চিম-মুখী রাস্তা ধরলাম। জি. টি. রোড পার হয়ে আরও প্রায় দু-ফার্লং যেয়ে আমরা জাহাজবাড়ীর সামনে পৌঁছলাম। জাহাজবাড়ী সকাল নটা থেকে বারটা এবং দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। রবিবারে অনেকেই দেখতে আসে বলে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। প্রবেশমূল্য দিতে হোল মাথা-পিছু পনের পয়সা। জাহাজবাড়ী কেবল একটি সুন্দর দর্শনীয় নয়, আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের একটা উন্নত নিদর্শন। মাত্র কয়েক বছর আগে এখানে ছিল ঠাকুরদাস সুরেকা ট্রাস্টফাণ্ডের একটি অব্যবহৃত পুরাণ ইটখোলা। এই ট্রাস্টফাণ্ডের সভ্যেরা বিশেষ করে চেয়ারম্যান শ্রীরতনলাল সুরেকা শিল্পরসিক ব্যক্তি। সুরেকা ট্রাস্টফাণ্ড থেকেই বারাণসীর বিখ্যাত সত্যনারায়ণ তুলসী-মানস-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তুলসী-মানস-মন্দিরের গায়ে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমস্ত শ্লোকগুলি পাথরের উপর খোদিত।

জাহাজবাড়ী তৈরীর কল্পনা রতনলাল পেয়েছেন গোয়ালিয়রের

এক উদ্যানবিশারদ কাশীনাথ গান্ধীর কাছ থেকে। বাঙ্গালী ইন্‌জিনিয়ার শ্রী. এস. সি. রায় বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করেন এবং নির্মাণ কাজের পরিদর্শকের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ খৃস্টাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমীতে বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বাড়ীটি তৈরী করতে সময় লাগে এক বছর। একটি পুকুরের জলের মধ্যে দাঁড়ান বাড়ীটাতে প্রবেশ করতে হোল একটি ভাসমান জেটির উপর দিয়ে। নির্মাণ কৌশল এত সুন্দর ও নিখুঁত যে এটা খিদিরপুর ডক-ইয়ার্ডে দাঁড়ান একটা লোহার জাহাজ নয়, এটা যে একটা ইটের বাড়ী, একথা জাহাজ দর্শনে অভিজ্ঞ একজন নাবিকও মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না। পাম্পের সাহায্যে পুকুরের জল সব সময় একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় রাখা থাকে, যেজন্য মনে হয় জাহাজ ঠিক ঐ পর্যন্তই জলের মধ্যে ভেসে আছে। পুকুরের চারপাশে সুন্দর বাগান, কৃত্রিম ফোয়ারা ও পাহাড়। আমাদের দলের চারটি ছেলেমেয়ে আনন্দে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগল।

অক্ষয় বৌদি একটা ফোয়ারার পাশে বসে তার চুপড়ি আলগা করলেন। কৃত্রিম ফোয়ারার পাশের অপূর্ব পরিবেশ, দালদায় ভাজা ঠাণ্ডা লুচি ও আলুরদমকে অমৃততুল্য করে তুলেছিল। জাহাজ-বাড়ীর উদ্যানের মধ্যে রান্না করে পিকনিক করতে দেয়না বটে, তবে তৈরী খাবার এনে খাওয়ার কোন বাধা নেই।

জাহাজবাড়ী থেকে জি. টি. রোডের উপর এসে বাসে অল্প দূরত্বে দু-তিনটি ষ্টপেজ পর, বালী ব্রীজের দিকে পথের পাশেই বিখ্যাত কল্যানেশ্বর শিব ও সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। এদের প্রাচীনত্বের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৩৪১ সালের আগে পর্যন্ত একটি প্রাচীন গাছের তলায়, খড়ের চালার মধ্যে মৃণ্ময়ী মূর্তির পূজা হোত। ঐ বছর নূতন মন্দির তৈরী হয় এবং আগের মাটির মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কল্যানেশ্বর শিব সম্পর্কে কিম্বদন্তী : বাবা কল্যানেশ্বর স্বয়ম্ভু, অনাদিলিঙ্গ। তিন চারশ বছর আগে, যখন বালী অঞ্চল জঙ্গলে ঢাকা ছিল, তখন স্থানীয় এক গোয়ালা প্রথমে শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে তোতাপুরীকে সাথে নিয়ে এসে কল্যানেশ্বরের পূজা দিয়ে যান। সোমবার দিন বাবার বার বলে প্রচলিত। সাধারণের বিশ্বাস সোমবারে উপবাসী থেকে বাবার মাথায় জল ঢেলে যা কিছু কামনা করা যায়, সিদ্ধ হয়। আগের দিনের বাণফোঁড়া ও অন্যান্য জাঁকজমক অনেকটা কমে গেলেও এখনও গাজনের সময় কল্যানেশ্বর মন্দিরের গাজন উৎসবে কয়েক হাজার লোক সমাগম হয়।

বালী শহরের একেবারে উত্তর দিকে, বিবেকানন্দ সেতুর নিচে, বালীখাল যেখানে এসে গঙ্গায় মিশেছে, তারই পাশে রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ডাকাতে কালী। এই খাল দিয়ে বন্দের বিলের সঙ্গে রয়েছে গঙ্গার সংযোগ। প্রবাদ : রত্নাপাখী, বিশে ডাকাত, রোঘো ডাকাত এরা ডাকাতি করতে বেরত ছিপে চড়ে। ছিপগুলি থাকত বন্দের বিলে। ডাকাতি করতে বেরনোর সময় এরা এই কালীর পূজা দিয়ে যেত। রাজা সীতারাম রায়ের শাসনে বিশে, রত্না, রোঘো প্রভৃতি ডাকাতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। মা কালীও ভাঙ্গা দেউলের পূজাহীন দেবতায় পরিণত হন। মাত্র কয়েক বছর আগে পুরাণ মন্দিরের ভিত ৫-৬ ফুট উঁচু করে তার উপর নতুন ছোট একটা পাকা মন্দির তৈরী হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে, মূর্তিটিও নতুন প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু 'ডাকাতে কালী' নামটা রয়ে গেছে।

আমরা কল্যানেশ্বর শিব ও ডাকাতে কালী দেখতে যেতে পারলাম না। সময় ছিলনা। শীতের সন্ধ্যার আঁধার পাঁচটা বাজতে না-বাজতেই নেমে এলো। আমাদের বাড়ীর পথ ধরতে হোল।

# ষোল

## শ্রীরামপুর

বাড়ী ঢুকে দেখি দুই পুরান বন্ধু বসে আছে। বহুদিন আগে গোমুখের পথে এদের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব। ভোলেননি আজও, মাঝে মাঝে আসেন। এদেরই একজনের বৌভাত উপলক্ষে পরদিন শ্রীরামপুর যেতে হবে, নিমন্ত্রণ। এমন শুভ সংবাদে রাজী হলাম সানন্দে। প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছে শ্রীরামপুর, ইয়ূথ হোষ্টেলার্স অ্যাসোসিয়েসনের হুগলী জেলা অফিসে, সন্ধ্যা সাতটায়।

শ্রীরামপুর! জায়গাটার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করলাম। নিমন্ত্রণ যখন আছেই, বাড়ী থেকে সকাল-সকাল বেরিয়ে শহরটা তো একচক্কর ঘোরা যায়। সব ভ্রমণে সঙ্গী পাব এমন কথা নেই, তবু পেয়ে গেলাম একজনকে। তারও নিমন্ত্রণ ছিল আমার মতো। তাকে প্রস্তাব করতেই তিনিও রাজী হয়ে গেলেন এবং পরদিন সকালে আমার সঙ্গী হবেন, কথা দিলেন।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে সকাল নটা পনের মিনিটের নৈহাটী লোকাল ট্রেনে গেলাম ব্যারাকপুর। শ্রীরামপুর যদিও হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের মাঝের একটা স্টেশন, তবুও যেহেতু আমার সঙ্গী থাকেন শিয়ালদার খুব কাছেই সেইজন্য আমার একটু ঘোরা পথ হলেও, ব্যারাকপুর থেকে ধোবীঘাটে খেয়া পার হয়ে শ্রীরামপুর যাওয়া ঠিক করেছিলাম। ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে ধোবীঘাট প্রায় দু মাইল। বাসে গিয়ে যেখানে নামলাম তার পাশেই সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিসৌধ। খেয়াঘাটের অল্পদূরেই গান্ধী স্মারকনিধি, কিন্তু আমরা সেগুলি দেখবার জন্যে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি খেয়ায় চড়লাম। শ্রীরামপুর নেমে প্রথমে গেলাম বাঁদিকে শ্রীরামপুর আদালত ভবন দেখতে। বর্তমানে যেটি শ্রীরামপুরের এস. ডি. ও কোর্ট সেইটিই আগে ছিল দিনেমার

গভর্ণরের প্রাসাদ ( Denish Govt. House )। বর্তমানে দর্শনীয় কিছু নেই। শুধু সামনে বিশাল তোরণদ্বারটি অতীতের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে। তোরণে রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের রাজকীয় চিহ্ন খোদিত। তোরণদ্বারটির একটি ফটো নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সেণ্ট ওলেফ্‌স গীর্জার দিকে। গীর্জাটি দিনেমার আমলের প্রটেসট্যাণ্ট চার্চ। গেটএ সম্রাট ফ্রেডারিকের মনোগ্রাম খোদিত, সামনে একটা ত্রিকোণ পার্ক। শ্রীরামপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় দিনেমারদের ব্যবহৃত কতকগুলি কামান পড়ে ছিল। সবকটি কামানই এনে এই পার্কে সযত্নে রাখা আছে। গুনে দেখলাম সংখ্যায় পনেরটি। গীর্জাটি তৈরী হয়েছে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। কেরী সাহেব কিছুদিন এই গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক হিসাবে কাজ করেন। গীর্জার মধ্যে কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের স্মৃতিফলকে তাদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ খোদাই করা।

ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায় কুড়ি মিনিটের পথ শ্রীরামপুর কলেজ। ১৮১৮ সালে তৈরী বিশাল প্রাসাদ। একশ ছাপ্পান্ন বছর অতীত হয়েছে, এখনও যেন নতুন। কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার ভট্টাচার্য নিজে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। একতলা ও দোতলায় দুটি প্রধান হলঘর: লম্বায় প্রত্যেকটি ৯৫ ফুট চওড়ায় ৬৬ ফুট ও উচ্চতায় যথাক্রমে ২০ ও ২৬ ফুট। বিরাট হলঘরগুলির সামনে খানিকটা বিস্ময়-বিমুগ্ধ মনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দু সারি স্তম্ভের উপর গ্রীক স্থাপত্য পদ্ধতিতে গড়া ছাদ। এ ছাড়াও ৩৫ ফুট লম্বা ও ২৭ ফুট চওড়া আটটি হলঘর ও ছোট ছোট বহু ঘর আছে। অধ্যাপক বললেন, 'অন্যান্য কলেজের মত আমাদের স্থানাভাব বা অর্থাভাব নেই, কিন্তু ছাত্র-শৃঙ্খলা আগের মত আর রাখতে পারা যাচ্ছে না। অন্যান্য কলেজের ঢেউ এসে আমাদের কলেজেও লেগেছে।' তবুও মনে হোল, শিল্পাঞ্চলের কলেজের চেয়ে যেন এখানে শৃঙ্খলা ও ছাত্রদের শালীনতাবোধ অপেক্ষাকৃত বেশী।

অধ্যাপক আমাদের নিয়ে গেলেন কলেজ সংলগ্ন সংগ্রহশালায়। সেখানে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কার্যাবলীর বহু নিদর্শন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক সংগ্রহ দেখতে দেখতে বেলা ঘনিয়ে এল। আমরা এসে দাঁড়ালাম কলেজের বিরাট লাইব্রেরীর পাশে গঙ্গার ধারের দরদালানটিতে। গথিক রীতিতে চারটি বিশাল স্তম্ভের উপর দরদালানটি গড়া। অধ্যাপকের নির্দেশে কলেজের একজন কর্মচারী আমাদের চা দিয়ে গেল। গঙ্গার দিকের দরদালানে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকের মুখে শ্রীরামপুরের প্রাচীন ইতিহাস শুনলাম : ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে শেওড়াফুলির রাজা মনোহর রায় শ্রীপুর মৌজায় শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোহনপুর ও গোপীনাথপুর অঞ্চল সমেত জায়গাটি শ্রীরামচন্দ্রের নামে দেবোত্তর করেন। শ্রীরামচন্দ্রের নাম অনুসারে শহরের নাম হয় শ্রীরামপুর। পাঁচ বছর পর দিনেমাররা শহরটি দখল করেন ও রাজার নামে নামকরণ করেন ফ্রেডারিক নগর। কিন্তু লোকমুখে প্রচলিত নামের পাশে সরকারী নাম শেষপর্যন্ত টিকলো না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ইংরেজ অধিকারে আসে। দু'বছর পর, ইংরেজ সরকার, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, মহকুমা সদর বারহাট্টা থেকে সরিয়ে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসে।

শ্রীরামপুরের ঐতিহ্য অনেক। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হয় শ্রীরামপুরে, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণের' জন্মভূমি এখানেই। ভারতের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র নির্মিত হয় শ্রীরামপুরে। এক কথায় বলা যায়, আধুনিক বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুতিকাগৃহ এই শ্রীরামপুর।

অধ্যাপকের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলাম স্টেশনের কাছের এক গলিপথ বেয়ে সমাধিক্ষেত্রের দিকে। এখানে কেরী ও তার পরিবার বর্গ, মার্সম্যান, ওয়ার্ড, ম্যাক, প্রভৃতি মণীষীদের সমাধি আছে। দেখলাম, পণ্ডিতপ্রবর ও দার্শনিক কেরীর নিজের সমাধিফলকের ভাষা নিজেই লিখে রেখে গেছেন :

**"A Wretched Poor And Helpless Worm
On Thy Kind Arms I Fall"**

সমাধিক্ষেত্রের শান্ত পরিবেশে ধীরে ধীরে রাতের আঁধার নেমে এলো। আমরা এগোলাম ক্ষেত্রসার ঠাকুরবাড়ীর দিকে। পথ চিনতে বা খুঁজে নিতে কোন কষ্ট হোল না। ঠাকুরবাড়ীর সন্ধ্যারতির মন্দাক্রান্তা তালে বেজে চলা ঘণ্টার শব্দ দিচ্ছিল পথের নির্দেশ। আরতি দর্শন করে ভরা মন নিয়ে ক্লান্ত শরীরে পৌছলাম নিমন্ত্রণ বাড়ীতে।

## সতের

### শিবনিবাস

বাড়ী ফিরে শুনলাম, কল্পনা আজও ঠিক বেলা দশটার সময় আমাদের বাড়ী এসেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছে। দুঃখ পেলাম। ভাবলাম এবার থেকে তার ভ্রমণের সঙ্গী হব।

কিন্তু পরের রবিবার শুধু নয়, কয়েকটা মাস কেটে গেল, বৃথাই বসে রইলাম তার আগমন প্রত্যাশায়। সে এলনা।

আমার নিজের ভ্রমণের অভ্যাসের জন্যই হোক আর কাছাকাছি বেড়িয়ে আসার ঝোঁকের জন্যই হোক ছুটি-ছাটা পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়ি সকাল বেলাটি কেটে গেলেই। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব এক-আধ জন প্রায়ই থাকে, কিন্তু কল্পনা সঙ্গে থাকলে যেমন মনটা ভরে উঠত, ঠিক তেমন যেন হয় না। বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধ এড়াতে পারি না। ছুটির দিনে তার আগমনের সম্ভাব্য সময়টুকু পার করে দিয়ে বেরোতেই হয়।

বেরিয়ে পড়েছি বন্ধুবর সুশীলবাবুকে সঙ্গী করে। একটু অন্য-মনস্ক ছিলাম, ভাবছিলাম হয়ত কল্পনার কথাই, সুশীলবাবুর প্রশ্নে চমক ভাঙল:

'দাদা, ব্যাগে গামছা আছে নাকি? সাধারণতঃ বাইরে বেরোনর সময় আমি ব্যাগের মধ্যে একখানা গামছা নিয়ে বেরুই। খুব ভোরে বেরতে হয়েছে। গামছাখানা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। নেতিবাচক জবাব পেয়ে সুশীলবাবু একটু হতাশ হলেন।

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম চুর্ণী নদীর খোয়াঘাটের ধারে। খেয়া-নৌকা এপারে এলেই পার হবো। ছোট নদী, দু'পারে গাছের ঝোপ, জল পর্যন্ত ঝুলে আছে, ঘাটের একটু দূরে দুটি গ্রাম্য যুবতী কলসী মাজছে। এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে স্নানে নেমে পরস্পরের গায়ে জল ছিটোচ্ছে। সাতাশ বছর আগে পূর্ব বাংলার ভৈরবের তীরে আমার ফেলে আসা গ্রামখানির কথা মনে পড়ায় হয়ত একটু উদাস হয়েছিলাম। চুর্ণী শীর্ণা হলেও শ্রাবণের ধারায় দেহে তার যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে, তবুও তার জল অতি স্বচ্ছ।

সুশীলবাবু বললেন, পাঁচ হাত তলায় মাছের পাখনা দেখা যায়। আমার সঙ্গে একখানা গামছা আছে, আর একখানা পেলে নেমে ডুব দিতাম। বড় লোভ হচ্ছে।'

ততক্ষণে খেয়ানৌকা কাছে এসে গেছে। সুশীলবাবুকে বললাম, এখন ডুব দেবার লোভ ত্যাগ করে পার হয়ে নি, চলুন। বেলা সাড়ে এগারটা বেজে গেছে, আর দেরী করলে ওদিকে যার দর্শনের আশায় আসা তারই দেখা পাওয়া যাবে না।'

খেয়া পার হয়ে মাত্র দুশ গজের মধ্যে মন্দির-প্রাঙ্গণ। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই। তিনটি মন্দিরের দরজাতেই বড় বড় তালা ঝুলছে। পাশে চার-পাঁচটি চা ও খাবারের দোকান। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আধ ঘণ্টা আগে পুরোহিত পূজা সেরে মন্দির বন্ধ করে গ্রামের মধ্যে মাইল খানেক দূরে নিজের বাড়ী চলে গেছেন।

ভোর পাঁচটা পচিশ মিনিটের গেদে প্যাসেঞ্জারে আমরা শিয়ালদা থেকে বেরিয়েছি। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, সরাসরি মাজদিয়া স্টেশনে

নেমে ন'টার মধ্যে শিবনিবাস পৌঁছব। ট্রেনে আসতে আসতে সুশীল বাবুর ইচ্ছা হোল, আড়ংঘাটায় নেমে যুগলকিশোর দর্শন করা। তার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিলাম। আমরা আড়ংঘাটায় নামি। পরের ট্রেনে মাজদিয়া পৌঁছলাম সাড়ে দশটায়। মাজদিয়া থেকে শিবনিবাস খেয়াঘাট বাসে এলে ১৮ মিনিটের পথ। ভাড়া পনের পয়সা, দূরত্ব তু'মাইলের মত। কিন্তু বাসের জন্যে দেরী না করে রিক্সায় একটাকা ভাড়া দিয়ে তুজনে যখন এসে পৌঁছলাম তখন সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। কারণ রবিবারে মাজদিয়ার হাট থাকায় ঝিঙ্গে, পটলের মধ্য দিয়ে পথ করে এগুতে বেশ সময় লাগল।

সুশীলবাবু তুটি স্থানীয় ছেলেকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে পাঠালেন পুরোহিত মশায়ের বাড়ী, যদি তিনি একবারে আসেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগর-মাজদিয়াগামী বাসে কৃষ্ণনগরের আরও তিনজন যাত্রী (মহিলাসহ) এসে পৌঁছলেন। আমরা ঘুরে ঘুরে মন্দিরের বাইরের গঠন ও শিল্পকলা দেখে আলোচনায় ব্যস্ত, এমন সময় পুরোহিত শ্রীস্বপন ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত। আমাদের আগ্রহ দেখে মন্দিরগুলি খুলে দেবদর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

শিবনিবাস শহর প্রতিষ্ঠা করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ পুত্র শিব চন্দ্রের নাম অনুসারে। বর্গীরা যখন ভাগীরথী তীরবর্তী জনপদগুলি বার বার লুণ্ঠন করছিল, তখন কৃষ্ণনগর থেকে নদীয়ারাজ নিজ রাজধানী শিবনিবাসে সরিয়ে নিয়ে যান। চুর্ণী নদী তিন দিক ঘিরে থাকার জন্যে জায়গাটি অনেকটা নিরাপদ বলে মনে হয়। শিবনিবাসের প্রাচীন রাজবাড়ী আজ এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তিনটি মন্দিরও ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল। বিড়লা ট্রাস্ট ফাণ্ড থেকে ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দিরগুলি ভাল ভাবে সংস্কার সাধিত হয়েছে। তিনটি মন্দিরে তিন রকম ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন।

উত্তর দিকে রামসীতা মন্দির। পাঁচ সারি খিলানের উপর মাটি

থেকে ছ'ফুট উঁচু ভিতের উপর স্থাপিত। মন্দিরশৈলীতে পাশ্চাত্য গথিক শিল্প পরিস্ফুট, গীর্জাকারে চতুষ্কোণ মন্দিরের বহিরঙ্গের ছাদ চ.লু এবং গর্ভকক্ষের ছাদ ঈষৎ ঢেউখেলানো। মন্দিরের পাশেই ভোগ রান্নার ঘর। রামের মূর্তিটি পাথরের, মাথার মুকুটটি খুললে কিন্তু বুদ্ধমূর্তি বলে ভুল হবে। মন্দিরের মধ্যে একপাশে একটি অতি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। শুনলাম, এই মূর্তিটি পালযুগের।···মধ্যে শম্ভু মন্দির। এটি বাংলা চার চালা গঠন। ১৬৮৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া মহিষীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রায় সাতফুট উঁচু।

সর্ব দক্ষিণের মন্দিরটি সুন্দরতম বটেই, উচ্চতমও। এর উচ্চতা ১২০ ফুট। অষ্টকোণ বিশিষ্ট মন্দির। গঠন অনেকটা সুউচ্চ গীর্জার চূড়ার মত। চারিদিকে দরজা। বাইরে অষ্টকোণ-বিশিষ্ট প্রশস্ত চত্বর। মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরের অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পূজারীর মুখে শুনলাম, এইটি নাকি উত্তর ভারতের বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। শুধু উচ্চতায় নয়, পরিধিতেও। প্রায় দশ ফুট উঁচু ও তের ফুট পরিধির শিবলিঙ্গের মাথায় জল ও ফুল এবং গৌরীপট্টে পূজা দেবার জন্যে পাশে সিঁড়ি গাঁথা। ভক্তেরা এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাবার মাথায় জল দেয়।

প্রতি সোমবার দূর-দূরান্তর থেকে অনেকেই বাবার মাথায় জল দিতে আসেন। এজন্য সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। অন্যান্য দিন সচরাচর সকালে ৭টা থেকে ৯টা এবং বিকালে ৪টা থেকে ৭টা খোলা রাখা হয়। বর্তমান পূজারী বয়সে নবীন, কিন্তু অতি সজ্জন। আগে থেকে চিঠি দিলে পূজার ব্যবস্থা করে রাখেন। এখানে সাধারণ পূজার হার ·৫৬ পয়সা, মানত পূজা এক টাকা। কেউ নিজ নামে অন্নভোগ, খিচুড়ি ভোগ বা পরমান্ন ভোগ দিতে ইচ্ছা করলে, দিতে পারেন। প্রতি ভোগের জন্য একটাকা পৃথক দিতে হয়।

শিবনিবাস এক সময় সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। মন্দিরের কাছেই মহানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জন্মভিটা ও তার পাশেই ভাঙা কালী মন্দির অযত্নে ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। চূর্ণীর পাড়ে নাকি শীতকালে অনেকেই পিকনিক করতে আসেন। মাজদিয়ায় বড় বাজার ও হোটেল আছে। কিন্তু শিবনিবাসে মন্দিরের পাশে গোটা চার পাঁচ খাবারের দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই। তারই একটা দোকানের সঙ্গে মুদিখানা। ওখানেই একটা দোকান থেকে নেওয়া মিষ্টি ও সুশীলবাবুর সঙ্গে আনা খাবারে কোন মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম। কলকাতার তুলনায় এখানকার দোকানের চার আনা দামের রসগোল্লা আকারে বেশ বড় এবং সুশীলবাবুর ভাষায়: 'এরা ছানায় ভেজাল দিতে শেখেনি, কিন্তু রসটা ঘন করার জন্যে রং একটু লালচে করে ফেলেছে।'

খেয়া পার হয়ে কৃষ্ণনগর-মাজদিয়া রোডের মোড়ে এসে বাসে উঠলাম। দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল নদীর অপর পারের মন্দিরের চূড়াগুলো। পিছনে পড়ে থাকল শান্ত নির্জন দেবভূমি শিবনিবাস।

## আঠার

### চণ্ডীরামপুর, বিরহী

প্রতিটি ছুটির দিন সকাল বেলায় বসে থাকি খবরের কাগজখানা সামনে নিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে চোখ বোলান শেষ হয়ে যায় কিন্তু বসে থাকি চুপ করে যতক্ষণ না বাড়ীর ভেতর থেকে দুপুরের খাবার তাড়া আসে। চোখ হয়ত থাকে কাগজের পাতায়, মন উড়ে যায় উদাস হয়ে। বৃথাই বসে থাকি কল্পনার আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে। ইতিমধ্যে একদিন তাগাদা এলো বন্ধু অপরেশের কাছ থেকে। যেতে হবে বিরহী।

* * *

'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই-বা হল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ ॥'

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি অবৃত্তি করে এবং অন্দরমহলে ছুঁড়ে দিয়ে রসিক অপরেশ বললে, 'শিপ্রা কুইক। মেজদা এসে গেছেন।'

সংবাদ দেওয়া ছিল আগে থেকেই, সুতরাং আমার উপস্থিতিতে ওরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শিপ্রা দরজার ফাঁকে হাসিমুখে উঁকি মারল। দেখে নিলুম ও বেণী যথারীতি এলিয়েই আছে, সিঁথি কিন্তু এতটুকু বাঁকা নয়, পত্রলেখার কাজ ত কোন মেয়েকে ইদানিং করতে দেখাই যায় না। তবে শিপ্রা যে সুন্দরী, বলাই বাহুল্য।

শিপ্রা বললে, 'একটু বসুন আমি চা নিয়ে এখুনি আসছি।'

ওইটুকু সময়ের মধ্যে শিপ্রা প্রসাধন সেরে নিল এবং আমাদের জন্যে চা আনল। চা-পানের পরই বেরিয়ে পড়লাম।

শিয়ালদা।

একঘন্টার কিছু সময় পরে মদনপুর স্টেশন। মদনপুর স্টেশনের সামনে যে কোন সময় গেলে চোখ পড়ে মাত্র দু তিন খানা যাত্রী-বাহী রিকসা ও খান দশেক মালটানা ট্রলি রিকসা। আমাদের সাথে আর একটি স্থানীয় পরিবার নেমেছিল ট্রেন থেকে। স্বামী, স্ত্রী ও তিনটি শিশু নিয়ে পাঁচজন। একখানা ট্রলি রিকসায় পাঁচজন চেপে তারা তাদের গন্তব্য পথে এগোলো। আমরা কলকাতার বাবু, তিন জনের জন্য দু'খানি রিক্সা নিলাম। ভাড়া চার টাকা।

লাইনের পূর্বদিকে সোজা চলে গেছে পীচঢালা রাস্তা। বাস বা অন্য কোন যাত্রীবাহী গাড়ি এপথে চলে না। রিক্সাই ভরসা। তবে গ্রামের কোন কোন সচ্ছল কৃষি পরিবারের মেয়েদের মাঝে মাঝে এখনও ছই-ঢাকা গরুর গাড়ীতে আসতে দেখা যায়।

দু'রশি পথ চলার পর গ্রাম শেষ হোল। রাস্তা এল ধানক্ষেতের মাঝে। ফুরফুরে বাতাস বইছিল। দুধারে যতদূর দেখা যায় সবুজের সমারোহ। তার উপর থেকে থেকে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু একটি ক্ষেতে কার্তিকশালের শিষ ছেড়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় মিষ্টি গন্ধ আসছিল নাকে।

আমার রিকসায় আমি একা, আগে আগে চলেছি। পিছনের রিকসায় ওরা দুজন। পিছন ফিরে দেখি, অপরেশ গুন গুন করে গান ধরেছে। চোখ তার নিবদ্ধ উত্তর দিকের দিগন্তবিস্তৃত ধান-ক্ষেতের ওপারের ঘন নীলিমায়। মনে হোল বাহ্যজ্ঞান নেই। যেন হুশ নেই তার পাশেই বসে রয়েছে শিপ্রা। মাইলখানেক চলার পর পথের ডানদিকে চোখে পড়ল অর্ধলুপ্ত যমুনার বিচ্ছিন্ন ধারা।

যমুনা ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী থেকে বেরিয়ে গোবরডাঙ্গার পাশ দিয়ে গিয়ে স্বরূপনগরের কাছে ইচ্ছামতীতে মিশেছে। একসময় নাকি এই নদী দিয়ে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের নৌবহর ধূমঘাট থেকে গঙ্গায় যাতায়াত করত। এখন যমুনা মজে এসেছে। মাঝে মাঝে ধারা একরকম শুকিয়ে গেছে। বর্ষা ও শরতে তিন চার মাস যমুনার বুকে কিছুটা জল থাকে। বাকী সময় যমুনার বুকে হয় বোরোধানের চাষ।

আমার রিকসাওয়ালা, বৃদ্ধ মুসলমান, নাম জহরুদ্দি। বাড়ী চণ্ডিরামপুর গ্রামে। সে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য শুনে বলল, 'মদনগোপাল দর্শনের আগে আমাদের গাঁয়ের মা মঙ্গলচণ্ডী দর্শন করে যান।' এবার ফসল কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, 'ফসল মোটামুটি ভাল, তবে হিন্দুদের জমিতে ফসল তেমন ভাল হয়নি, হবেও না।'

তার কথায় হেসে উঠলাম, 'তোমাদের এখানে ফসল হয় কি জাতধর্ম দেখে?'

উত্তরে জহরুদ্দি বলল, 'বাবু, আমি খেটে-খাওয়া মুক্খু মানুষ অত

ব্যাখান জানিনে। মদনগোপালের মন্দিরে তো যাচ্ছেন, শুধোবেন পুরুত ঠাকুরকে। গেল বছর হিন্দু-মেয়েরা মদনগোপালকে ভাই ফোঁটা দেয়নি, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের মোছলমান মেয়েরা সবাই নিয়মমত দেবতাকে ভাইফোঁটা দিয়ে এয়েছে। তাই তো দেখেন না মোছলমানদের ক্ষেতে মা-লক্ষ্মী উপছে পড়ছে। আর ওই দেখেন, ওই একখানা জমি ঘোষেদের, জমিতে কি ধান হয়েছে? ওতো উলুখড়।'

জহরদ্দি যে জমিটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল, দেখলাম সত্যিই সে জমিটায় ধানের গোচ সরু, গাছগুলিও ছোট, রংও বিবর্ণ।

'মদনগোপালকে ভাইফোঁটা দেওয়া কি গো?' জিজ্ঞাসা করলাম জহরদ্দিকে।

কেন জানিনা, জহরদ্দি আমার সে কথার কোন উত্তর দিল না।

স্টেশন থেকে প্রায় চার মাইল আসবার পর, রাস্তার ডান দিকে পড়ল একটা উঁচু লম্বা ঢিবি। ঝোপজঙ্গলে ঢাকা। ঐ ঢিবির সামনে এসে রিকসাওয়ালারা থামল। বলল, 'এই হচ্ছে চণ্ডীরামপুর গ্রামের শেষ। এর পরই আরম্ভ হবে বিরহী মৌজা। সামনে উপরে উঠে গেলে দেখবেন মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির।'

রিকসাওয়ালাদের বিদায় করে দিয়ে আমরা তিন জন ধীরে ধীরে ঢিবির উপরে উঠলাম। ঢিবির উপরটি খুব প্রশস্ত। বড় বড় গাছপালা ও আগাছার ঝোপজঙ্গলে ঢাকা, মাঝখান দিয়ে দুটি সরু পায়ে হাঁটা পথ। ডান দিকে একটু দূরে, চোখ পড়ল ঝোপজঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট খড়ের বাড়ী। সামনে পাশাপাশি দুটি ভাঙ্গা মন্দির। জায়গাটি অতি নির্জন।

ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর খুব সাবধানে পা ফেলে আমরা তিন জন, প্রায় ছ'ফুট উঁচু মন্দিরের ভিতের উপর উঠলাম। মন্দিরটি বহু পুরাণকালের পাতলা ইঁটে তৈরী, সামনে একসময়ে প্রশস্ত বারান্দা ছিল, ছাদটি পড়ে গিয়ে সেখানে একটি ভাঙ্গা ইটের স্তূপ সৃষ্টি করেছে।

মন্দিরের পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক দিয়ে যমুনা বয়ে চলেছে। এখানে যমুনার অবস্থা অনেকটা ভাল, মোটামুটি বেশ চওড়া, জলও খুব বেশী বলে মনে হয়। মন্দিরের কাঠের দরজায় নক্সার কাজ। বাঁদিকের মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। ডানদিকের মন্দিরের বিগ্রহ দেখে কোন্ দেবতার মূর্তি বোঝা গেল না। কাল পাথরের বিগ্রহ মুণ্ডবিহীন। বিগ্রহের ডান দিকে একটি ঘট বসান। ঘটের গায়ে একটি সাপ আঁকা। ভাঙ্গা জীর্ণ মন্দির কিন্তু ভিতরটি সযত্নে ঝাড়পোছ করা এবং বিগ্রহের সামনে একটা বড় তামার থালায় ফুল ও পূজার উপকরণ সাজানো। দেখেই বুঝতে পারলাম পূজার যোগাড় করা হচ্ছে।

আমরা মন্দির দেখছি। একজন শীর্ণদেহ বিগতযৌবন ব্রাহ্মণ ছ'খানি ছোট রেকাবীতে অতি সামান্য নৈবেদ্য নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। পরিচয়ে জানলাম, ইনি পুরোহিত শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশের ঐ জঙ্গলের মধ্যের বাড়ীটিতে থাকেন।

পুরোহিতের মুখে শুনলাম ঐ মুণ্ডকাটা বিগ্রহ চণ্ডীদেবীর, ইনি মঙ্গলচণ্ডী নামে পরিচিত এবং এর নামেই গ্রামের নাম চণ্ডীরামপুর। গ্রামের বাসিন্দাদের বেশীর ভাগই মুসলমান। এই মঙ্গলচণ্ডী সম্পর্কে দুটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একটি, অতি প্রাচীনকালে এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতেরা চণ্ডীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। তারা ডাকাতি করতে যাবার আগে মায়ের পূজা করে বলিদান করত এবং সেই বলির রক্তের তিলক কপালে ধারণ করে যাত্রা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, চণ্ডীর আশীর্বাদে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না কিম্বা ধরা পড়বে না। একবার পূজো দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডাকাতদের দলের প্রায় সবাই ধরা পড়ল। রাগে ডাকাতসর্দার চণ্ডীর মুণ্ড কেটে ফেলে দেয়। ডাকাতের ভয় কমে যাবার পর যমুনার ধারে গ্রাম গড়ে ওঠে। তখন একজন চাষা জঙ্গল কাটতে গিয়ে মুণ্ডহীন বিগ্রহটি পান। গ্রামের লোকেরা পুরাণ মন্দিরের ভিতের উপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদেরই চেষ্টায় নতুন মন্দির গড়ে ওঠে।

অন্য প্রবাদ যেটা প্রচলিত সেটা এই যে, হিন্দু যুগ থেকে এখানে চণ্ডীর মন্দির ছিল। কালাপাহাড় গৌড় থেকে উড়িষ্যা যাবার পথে এই মন্দির দেখে মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেন। গ্রামবাসীরা ভয়ে পলায়ন করে। কালাপাহাড়ের ফৌজ চলে যাবার পর গ্রামবাসীরা ফিরে আসে ও খোঁজ করে ছিন্নমুণ্ড বিগ্রহ পেয়ে সেই বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় জমিদার ঘোষেদের আনুকূল্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ভিতের উপর নতুন মন্দির তৈরী করা হয়।

মূর্তির পাশের ঘটটি দেখিয়ে পুরোহিত বললেন, 'ওটি মনসার ঘট। তিনি যতদূর শুনেছেন দশ বার বছর পর পর ঘট পাল্টানো হয়। কিন্তু নূতন ঘট প্রতিষ্ঠার আগে ঘটের গায়ে ঠিক আগের মত সাপের ছবি আঁকা হয়। মূর্তিবিহীন মন্দিরটি দেখিয়ে পুরোহিত বললেন, ওটি জলেশ্বর শিবের মন্দির। শিবলিঙ্গ মূর্তি সারা বছরই মন্দিরের দক্ষিণদিকে যমুনার জলে ডোবান থাকেন। স্থানীয় লোকাচার, পার্শ্ববর্তী বিরহী গ্রামের যে কোন একজন ঘোষকে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন নীল পূজার মূল সন্ন্যাসী হতে হবে। তিনি জল থেকে মূর্তি তুলে নিয়ে এসে মন্দিরে বসিয়ে দেবেন। নীলপূজা ও গাজন হয়ে যাবার পর মূল সন্ন্যাসীই আবার শিবলিঙ্গ জলে ডুবিয়ে রেখে আসবেন।

শিপ্রা বারান্দার দুটো পিলারের গায়ে আঁকা দুটি নক্সার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পুরোহিত বললেন, ঐগুলি নাকি চণ্ডীদেবীর মুখের নক্সা। লক্ষ্য করে দেখে মনে হোল, দুটি মুখই এক রকম। মুণ্ডকাটা বিগ্রহের উপর বসালে অনেকটা চতুর্ভুজা দেবীমূর্তির মত হতে পারে।

অপরেশ কবি হলেও মূর্তিশিল্প সম্বন্ধে তার আগ্রহ আছে। সে মন্তব্য করল, 'আমার মনে হয় চণ্ডী সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ সত্য হওয়াই সম্ভব। বিগ্রহগুলি হিন্দু পালযুগের কিন্তু চণ্ডী মন্দির মুসলমান যুগের বলে মনে হয়। শিব মন্দিরের বয়স দুশ বছরের বেশী হবে না।

অপরেশ বিগ্রহের পায়ের কাছে বাঁকা মত একটা চিহ্ন দেখিয়ে বলল, 'ওটা গোসাপের মূর্তি। দশম শতকের আগে বাংলায় যত চণ্ডীমূর্তি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে গোসাপ বা গোধিকার মূর্তি দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুযুগে বাংলার কৌম সমাজে সাপ ছিল প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং ঘটের গায়ে সাপ আঁকা মনসা পূজা কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা থেকে উদ্ভূত। এ থেকেই বলা যায় এই গ্রামের মনসা, চণ্ডী ও শিব আদি হিন্দু যুগের। ডাকাতরা হিন্দু, রাগ হলেও তারা বিগ্রহের গায়ে আঘাত করবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কালাপাহাড়ের হাতে বিগ্রহের মুণ্ডচ্ছেদ স্বাভাবিক। শিবও বোধহয় কালাপাহাড় কর্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত হয়। বিগ্রহের মুণ্ড না পাওয়া গেলেও, বিগ্রহের পূর্ণ মূর্তি দেখেছে এমন কোন শিল্পী নূতন মন্দির তৈরীর সময় বেঁচে ছিল যে পিলারের গায়ে ঐ মুখটি খোদাই করেছে। এর থেকে মনে হয় কালাপাহাড় মন্দির ভাঙ্গবার কিছুকাল পরেই নূতন করে ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতের উপর মন্দির তৈরী হয়েছিল। মন্দিরের আকৃতি দেখেই বোঝা যায় ধনী বা জমিদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার উপর ঘোষেদের মূল সন্ন্যাসী হয়ে প্রতি বৎসর শিবকে জল থেকে তুলে আনা ও আবার জলে ডোবানর প্রথার ভিতর কালাপাহাড়ের কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়।'

অপরেশের বক্তৃতা হয়ত আরও দীর্ঘ হোত। শিপ্রা বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, 'কোথাও বেড়াতে গেলে কেবল ওনার পণ্ডিতি শুনতে হবে। বাড়ী গিয়ে আলোচনা করলে কি চলে না? এখানে চোখ ভরে দেখে নাও।'

পুরোহিতের মুখে শুনলাম: মন্দিরের কোন আয় নেই। ছুটির দিন বলে তিনি আছেন। অন্যদিন অতি ভোরে উঠে কোনমতে মায়ের পায়ে একটা ফুল দিয়ে তাকে চলে যেতে হয় রাণাঘাট। সেখানে একটা সরকারী দপ্তরে অতি সামান্য চাকরী করে তাকে সংসার নির্বাহ করতে হয়। প্রতিদিন নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব

নয় বলে তিনি কেবল প্রতি অমাবস্যার দিন মায়ের ভোগ দেন। তবে প্রায় প্রতি মঙ্গলবারেই দু' চারজন ভক্ত মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিতে আসেন। পুরোহিত মশায়ের অল্পবয়স্ক ছেলেই সে পূজা মায়ের সামনে নিবেদন করে দেয়।

পুরোহিত মশায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মা যেমন রেখেছেন তেমনি করেই দিন চালাচ্ছি। ভোরে উঠে যমুনায় ডুব দিয়ে মার সামনে একটু বসি। পূজো কি হয়? কোনমতে জলের সাথে মায়ের সামনে একটা ফুল ফেলে দি, একটু আলোচালের নৈবেদ্য, তাও জোটাতে পারি না। বিনা উপাচারে মাকে ডাকা আর কি।'

আমি বললাম, 'উপাচার না থাক ভক্তি তো আছে।'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তাও নেই। অভাবের তাড়নায়, দাসত্বের চাপে নিশ্চিন্তে বসে দু'দণ্ড যে মাকে ডাকবো তাও হয় না। কোনমতে বেগার দেওয়ার মত ফুলটা ফেলে দিয়ে ছুটতে হয় চার মাইল দূরে মদনপুর, আটটা উনপঞ্চাশের গাড়ী ধরার জন্য।' পুরোহিত বলে চললেন, 'সামনের ঐ যে ইটের ঢিবি দেখছেন, আমার ছেলেবেলায় দেখেছি ওখানে ছিল নাটমন্দির। শিবরাত্রির দিন, নীলের দিন সারাদিন-রাত লোকারণ্য হয়ে থাকত। নীল পূজোর সময় এখনও বহুলোক আসে কিন্তু দাঁড়ানোর জায়গাটুকুও নেই।'

মাকে প্রণাম করে পুরোহিতের কাছে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে এগোলাম মদনগোপাল মন্দিরের দিকে।

মদনগোপালের মন্দির একটু বেশী উঁচু একতলা পাকা-ঘর বিশেষ। মন্দিরশৈলী বলতে কিছু নেই। মন্দিরের অবস্থান অতি মনোরম স্বর্গীয় পরিবেশে। চারিদিক নির্জন। দুপুরের তীব্র রোদের মধ্যে পৌঁছে দেখি, মন্দিরের দরজা বন্ধ। সামনে বেশ কয়েক বিঘা খোলা জমি, ছোট-খাট একটা খেলার মাঠের মত, তার পরেই টল টল করে বয়ে চলেছে যমুনা। মন্দিরের সোজা মাঠের পরেই অতি প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। ঘাটে জনপ্রাণী নেই, এক পাশে অতি প্রাচীন অশ্বথ

অন্য পাশে বৃদ্ধ বকুল। অশ্বত্থের দীর্ঘ শাখাগুলি ঘাটের সিঁড়িগুলোর উপর যেন চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে রেখেছে। ত্রিবেণীর কাছ থেকে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত যমুনা মজে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রায় শুকিয়ে গেলেও, এখানে প্রায় মাইল খানেক বেশ চওড়া ও গভীর। জল অতি স্বচ্ছ। আমরা দুই বন্ধু ছায়াঢাকা সিঁড়ির উপর বসে পড়লাম।

সামনে যমুনার কাকচক্ষু জলের উপর দিয়ে দক্ষিণা বাতাস বয়ে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে সিঁড়ির গায়ে লেগে একটানা ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলছে। যমুনার ওপারে ভোগপুর গ্রামের সবুজ ক্ষেতের উপর যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বকুল গাছে বসে একটা পাখী একটানা বলে চলেছে 'বৌ কথা কও' 'বৌ কথা কও'। ঝরা বকুলের গন্ধ যেন এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যমুনার উপর দিয়ে ভেসে আসা ভেজা-দক্ষিণা বাতাস শ্রান্ত দেহে যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

শিপ্রা চটি খুলে রেখে জলের মধ্যে একধাপ নেমে দু' হাতে আঁচলা করে চোখ, মুখ ও হাতের কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিল, তারপর দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে পা নাড়তে নাড়তে বলল, আঃ যেন ফ্রিজের জল।'

অপরেশ বলে উঠল, 'বিধাতা এখানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বকের অপর্যাপ্ত খোরাক ছড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু পঞ্চম ইন্দ্রিয় জিহ্বার জন্যে কি বেতের ঝোড়ায় কোন বন্দোবস্ত আছে? যদি থাকে, তবে দেবী, বরদানে উদার হোন। নইলে ব্রহ্মাদেবের তাড়নে স্থান ত্যাগ না করে পারা যাবে না!' বন্ধুর কথা বলার ভঙ্গিমায় হেসে উঠলাম।

শিপ্রা ঝোড়া থেকে তার সম্পত্তি বের করতে করতে বললে, 'নাও অন্ততঃ মুখে-হাতে জল দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।' শোভন হাতের সেবামাধুর্যে ভরা দীর্ঘ পরবর্তী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হোলো হাতের আঁচলায় মন্দিরের পাশের টিউবওয়েলের জল খেয়ে।

সেই নির্জন সুন্দর পরিবেশে হাসি-গল্পের ভিতর দিয়ে সময় ছুটে

চলছিল। আমার মন কিন্তু সব সময় একটা অভাব অনুভব করছিল। আজ সঙ্গে যদি কল্পনা থাকত।

শিপ্রা অনুযোগ করলে, এমন কাজল কালো জল, এমন সুন্দর বাঁধান সিড়ি, নির্জন পরিবেশ আগে যদি বলতেন আমি এক বস্ত্রে না এসে চান করার জন্যে অন্ততঃ আরো একখানা শাড়ী নিয়ে আসতাম। প্রাণ ভরে অবগাহন স্নান করতাম।

অপরেশ মন্তব্য করল, 'তাহলে আমরাও মন্দিরের দুয়ার বন্ধ বলে মদনগোপাল দর্শনের অভাব ভুলে যেতাম, মদন-বিজয়িনীকে দেখতে পেয়ে দেখতাম :

সোপানে সোপানে তীরে উঠিত রূপসী,
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি যেত খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরংগ উচ্ছল,
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল।
পড়িত মধ্যাহ্ন রৌদ্র ললাটে অধরে,
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়—

'তোমার রসিকতা থামাও।' সহাস্য ধমকে কাব্যস্রোত রুদ্ধ হোল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সাড়ে তিনটে বেজেছে। আমরা মন্দিরের বন্ধ দুয়ারের কাছে এসে দেখি, একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। ভিতরে লক্ষ্য করে দেখা গেল, মন্দিরের মধ্যের সিংহাসন খালি, বিগ্রহ নেই। সামনে একটা ছোট পিতলের সিংহাসনে নারায়ণ শিলা, পাশের আসনে ছোট একটি গণেশ মূর্তি। আমরা বাধ্য হয়ে পথে নামলাম। সামান্য একটু পুবদিকে এগিয়ে পথের ডান পাশে কয়েকটা বেশ বড় পুরাণ দোতলা বাড়ী। একটির বারান্দায় বসে এক বৃদ্ধ। মন্দিরের বিষয়ে খোঁজ করায় তিনি পাশের একটা বাংলো গোছের বাড়ীতে সুধারঞ্জন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

রায় মশায় ভার্গব গোত্রীয় কনৌজী ব্রাহ্মণ। সজ্জন ব্যক্তি। নিজে সঙ্গে করে আবার আমাদের মদনগোপাল মন্দিরে নিয়ে এলেন। বললেন, 'নদীয়া জেলায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য-মধ্যে বারটি প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছে। মদনগোপাল তার একতম। অন্যান্য বিগ্রহ হোল, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, তেহট্টের কৃষ্ণরায় প্রভৃতি।'

মদনগোপাল সম্বন্ধে প্রবাদ: বহুকাল আগে এখানে মুকুন্দ ঘোষ নামে একজন ধনী কৃষক ছিল। তার গোয়াল ভরা গরু, প্রচুর জমি, ক্ষেত ভরা ধান। একদিন মুকুন্দ ঘোষের বাড়ীতে একটি অতি সুদর্শন ছেলে এসে হাজির। পরিচয় দিল—পিতৃহীন, নাম মদন, যমুনার ওপারে বনের ধারের গ্রামের নন্দ ঘোষের বাড়ী গরু রাখত। বর্তমানে নিরাশ্রয়। মুকুন্দ তাকে আশ্রয় দিল, কাজ দিল গরু চরানোর। রোজ সকালে মদন গরুর পাল নিয়ে যায় চরাতে, দিনান্তে ফেরে। গরুগুলির খেয়ে পেট হয় টইটুম্বুর। ছেলেটির চেহারা যেমন সুন্দর ব্যবহার তেমনি মধুর। মুকুন্দ ঘোষের স্ত্রীকে ডাকে মা বলে। ক্রমে ক্রমে ছেলেটি মুকুন্দ ঘোষের ছেলের মত হয়ে গেল। মুকুন্দ ঘোষের ছেলে নেই, তার মেয়েরা মদনকে ডাকে ভাই বলে, ভাই এর মত আদর করে।

কিছুদিন পর গ্রামের অন্যান্য ঘোষেরা নালিশ করল মুকুন্দর কাছে, 'তোমাদের মদন গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়, নিজে গাছের ডালে বসে বসে বাঁশী বাজায় আর ইচ্ছে করে গরুগুলোকে ঢুকিয়ে দেয় ধান খেতে ধান খাওয়ানোর জন্যে। মুকুন্দ ঘোষ মদনকে সাবধান করে দিল কিন্তু সে কোন কথায় কান দেয় না। বিরক্ত হয়ে ঘোষেরা একদিন মদনকে মারবার জন্যে লাঠি নিয়ে তাড়া করল। মদন দৌড়ে একটা মোটা কাঁঠাল গাছের ধারে যাওয়া মাত্র গাছটি ফাঁক হোল, মদন গাছের ভিতর ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গাছটি যেমন ছিল ঠিক তেমনটি হয়ে গেল। সবাই এই আশ্চর্য কাহিনী শুনল, মুকুন্দ ঘোষের মেয়েরা ভাই ভাই বলে কাঁদতে লাগল। মুকুন্দ ঘোষ সব শুনে

হুকুম দিলেন, কাঁঠাল গাছটি কেটে করাতি দিয়ে চিরে ফেলে দাও।

গাছের কাণ্ড ফাড়া হলে তার মধ্যে পাওয়া গেল কাল পাথরে গড়া মদনগোপাল মূর্তি। মুকুন্দ ঘোষ বিগ্রহটি এনে যমুনার পাড়ে মন্দির তৈরী করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণ সে মন্দির বহুদিন আগে পড়ে গেছে, বর্তমান মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছেন সতীবালা দেব্যা। মুকুন্দ ঘোষ সোনাখালির চাটুজ্যেদের নিযুক্ত করেছিলেন পূজারী।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল। পূজারী স্বপ্ন দেখলেন: মদনগোপাল বলছেন, 'বহুদিন বৃন্দাবনের নন্দ গৃহ ছেড়ে এসেছি, প্রিয়াজী বিরহে দিন কাটছে, মথুরা জেলার যাবট গ্রাম থেকে এক খণ্ড নিমকাঠ ভেসে আসছে, সেই কাঠে রাধিকা মূর্তি তৈরী করে আমার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবি।' সত্যে সত্যই পক্ষকাল পরে একটা নিমগাছ জলে ভেসে এসে ঘাটে থামল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন পরম ভাগবত, তার কানে এই সংবাদ পৌছতেই তিনি নিজে শিল্পী ডেকে ঐ কাঠে শ্রীরাধা বিগ্রহ তৈরী করলেন। মন্দিরে মদনগোপালের পাশে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁকে। কৃষ্ণচন্দ্র দেবসেবার জন্যে যমুনার অপর পারে একটি গ্রাম দেবোত্তর করে দিলেন। ভোগের চাল ঐ গ্রাম থেকে আসত বলে গ্রামের নাম হোলো, ভোগপুর। মদনগোপাল এই গ্রামে এসে প্রথমে প্রিয়াজী বিরহে ছিলেন বলে গ্রামের নাম হয় বিরহী।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মুকুন্দ ঘোষের মেয়েরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এসে মদনগোপালের বিগ্রহের কপালে ভাইফোঁটা দিয়ে যেত। এখনও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বিরহীর ঘোষেদের বাড়ী থেকে এসে বিগ্রহকে ভাইফোঁটা দেয় তারপর সমস্ত অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা এসে মদনগোপালকে ভাইফোঁটা দেয় ও বিগ্রহকে মিষ্টি খাওয়ায়।

ভাইফোঁটার দিন মন্দিরের সামনে ভোরবেলা থেকে মেলা বসে। মুখ্যত মেয়েদের মেলা।

রায় মশায় বললেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বৈষ্ণবেরা বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চার রসের যে কোনো রসে সিক্ত প্রাণে বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। কিন্তু ভ্রাতৃভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বিরহী ছাড়া আর কোথাও হয় না। এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেবতাকে এমন আপন করে প্রিয়তম ভাই বলে ভাবতে বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না।'

রায় মশায় জানালেন, প্রতি বৎসর বার দোলের মেলার সময় নদীয়ার এই দ্বাদশ গোপাল বিগ্রহ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে যায় এবং দোলের পর নিজ নিজ জায়গায় ফেরৎ আসে। আগের বছর তেহট্টের লোকেরা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে তাদের বিগ্রহ কৃষ্ণ রায়কে পাঠায়নি বলে আমাদের বিগ্রহ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী থেকে দোলের পর ফেরৎ দেয়নি। যার ফলে এবার ভাইফোঁটা হয়নি, গ্রামের মেয়েরা মদন-গোপালকে ফোঁটা দিতে না পেরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে গেছে। চাষীরা তো মুষড়ে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস মদনগোপালকে ভাইফোঁটা না দিলে অমঙ্গল হয়, মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে যায়।

আমি বললাম, 'রিক্সাওয়ালা বলছিল মুসলমানেরা নাকি ভাই-ফোঁটা দিয়েছে।'

রায় মশায় জবাব দিলেন, 'হাঁ, বিগ্রহ নেই বলে সবাই ভাইফোঁটা না দিয়ে চলে গিয়েছিল। শুনেছি, মুসলমান পাড়ার সবাই নাকি পরে পরামর্শ করে এসে সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরের দেওয়ালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গিয়েছিল।'

মন্দিরের কাছে কাঁঠালতলায় একটা বেদীর উপর বীর হনুমানের পাথর নামে একখণ্ড বড় পাথর রয়েছে। মন্দির থেকে ৩।৪ মিনিটের পথ গেলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের মোড়। ওখান থেকে হাবড়া-চাকদা রেলস্টেশন ও কল্যাণীতে যাবার বাস পাওয়া যায়। ঐ মোড়ের ধারে কয়েকটি ভাল ভাল দোকানও আছে।

আমরা রায় মশায়ের সাথে আলাপে ব্যস্ত। সূর্য তখন আবির মেখে যমুনার অপর পারে দূর ধানক্ষেতের আড়ালে চলে যাবার পথ ধরেছে। ফিরতে হবে বলে শিপ্রাকে ডাকতে গিয়ে দেখি, সে যমুনার এক হাঁটু জলে নেমে নিজের মনে দু'হাতে জল তুলে খেলা করছে। যেন বাহ্যজ্ঞান নেই।

"যমুনা জলে সোপান পরে উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া জলের পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া করিছে পরিহাস।"

তার তন্ময় ভাব ভাঙতে সংকোচ হ'ল। এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকতেও লজ্জা হল। তাকালাম দূর পশ্চিম আকাশের দিকে, সেখানে তখন শাশ্বত চিত্রকর একটার পর একটা নোতুন রংয়ের তুলির পোঁচ দিয়ে চলেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে কতক্ষণ চেয়েছিলাম জানিনা ঘোর ভাঙল অপরেশের কথায়, 'সুন্দর! এক জল দেখা কবিকে ডাকতে যাকে পাঠালাম তিনি আকাশ দেখা কবি হয়ে গেলেন। বলি, বাড়ী ফিরতে হবে না কি সারারাত এই মজা নদীর ঘাটে বসে কাটবে? ফেরার সময় রিক্সা পাওয়া যাবে না।'

পরবর্তী অধ্যায়, রায় মশায়ের সাথে কথা বলতে বলতে বিরহীর মোড়। সেখান থেকে বাস পেলাম চাকদার। উল্টোপথে হলেও সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চাকদা স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে শিয়ালদহ হয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম রাত্রি দশটা।

## উনিশ

### পাক বিড়া

বিরহী থেকে ফিরে শরীর ভাল না থাকায় পুরো দুদিন বাড়ী বসে ছিলাম। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সজল সেন এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই কড়া আদেশের সুরে নির্দেশ দিল, 'মালপত্র এক্ষুনি গুছিয়ে নাও, আগামী কাল ভোরের ট্রেনেই পুরুলিয়া যেতে হবে।'

'পুরুলিয়া টাউনে, কি কাজে ?'

'না না, টাউনে নয়। শহর থেকে বহু দূরে—সে জায়গার নাম তোমরা শোননি। বর্তমানে সেটি এক অবজ্ঞাত গ্রাম, লোকে বলে পাক বিড়ড়া। কিন্তু এক সময়ে বোধ হয় সেখানে ছিল এক রাজার রাজধানী, যাকে ইতিহাস ভুলে গেছে'। উত্তর দেয় সজল।

যেমন ঝড়ের বেগে ঢুকেছিল তেমনি বেগেই বেরিয়ে গেল, শুধু আর একবার মনে করিয়ে দিল ভোর পাঁচটার সময় তৈরী থাকতে।

পরদিন সকালে হাওড়া থেকে ব্লাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে উঠলাম সজলের সঙ্গে। তৃতীয় সঙ্গী হোল আদর্শ বিদ্যানিকেতনের কেরাণী তরুণ যুবক বিজয়। আসনসোলে গাড়ী বদল করে আদ্রাগামী লোকাল ট্রেনে গিয়ে নামলাম জয়চণ্ডী স্টেশনে, বেলা তখন সাড়ে এগারটা।

স্টেশনের অদূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে জয়চণ্ডীর থান। পাশ দিয়ে একটি সরু জলের ধারা বয়ে চলেছে। পাহাড়টি খুব উঁচু না হলেও বেশ খাড়া। কোন কোন কলকাতার পর্বতারোহী-সংস্থা এখানে এসে নোতুন পর্বতারোহীদের পর্বতারোহণের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পাহাড়ের নিচেই ক্যাম্প করবার উপযুক্ত জায়গা আছে। স্টেশনের মাত্র এক মাইল দূরে পুরুলিয়া জেলার প্রস্তাবিত মহকুমা শহর রঘুনাথপুর। রঘুনাথপুর থানার সামনে সালতোড়া, বাঁকুড়া, কলকাতা, পুরুলিয়া, সাঁওতালডি প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের রাস্তা এসে মিশেছে। পাশেই দু' তিনটি পাইস হোটেল। শহরের পাশে ছোট ছোট পাঁচটি পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জায়গাটিকে খুব বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রঘুনাথপুর জায়গাটিও খুব স্বাস্থ্যকর। রঘুনাথপুর কলেজ, নবগঠিত বিশাল মহকুমা হাসপাতাল শহরটিকে বেশ শোভন ও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে।

আমরা রঘুনাথপুরের হোটেলে আহারাদি সেরে পুরুলিয়াগামী বাসে চড়লাম।

যারা কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যেতে চান তারা শহীদ মিনারের

কাছ থেকে সরাসরি পুরুলিয়াগামী বাসে কিম্বা রাত্রে হাওড়া থেকে আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেয়ে থাকেন। বর্ধমান থেকেও পুরুলিয়ার দ্রুতগামী বাস আছে, কিন্তু সজল যে কেন আমাদের এ পথে আনল প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম জয়চণ্ডী পাহাড়ের সাথে সজলের এক পুরোনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সেজন্য সে সুযোগ পেলেই জয়চণ্ডী পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে থাকে।

পুরুলিয়ায় গিয়ে আমরা উঠলাম বাজারের মধ্যে কালিবাড়ীর কাছে একটি হোটেলে।

পুরুলিয়া হোটেলে ঘর ঠিক করে আমাদের বাইরে বেরুতে নিষেধ করে সজল ছুটল আবার বাস-ষ্ট্যাণ্ডে। যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ওর হাতে চিড়ে, কলা, রুটি—প্রায় তিন জনের একদিনের পুরো খোরাক।

পরদিন ভোরে উঠেই সব কিছু নিয়েই গিয়ে হাজির হলাম পুঞ্চাগামী বাস-স্ট্যাণ্ডে। বাস ছাড়তে তখনও আধ ঘণ্টা দেরী। কিন্তু এর মধ্যেই বাসের প্রায় সব সিটই ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আমরা কোন মতে তিনটি বসার আসন জোগাড় ক'রলাম। বাস ছাড়বার আগেই বাসের ভিতর দূরে থাক্ উপরেও তিল ধারণের জায়গাটি রইল না। পুরুলিয়া স্টেশনের পাশের লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করে বাস পূর্ব দিকে ছুটে চলল।

পুরো দেড় ঘণ্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বাস ইনপুরের মোড়ে থামল। আমরা নেমে পড়লাম।

মাত্র আধ মাইল পায়ে হাটা পথে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম একটি ছোট্ট আদিবাসী পাড়ায়, নাম পাক্ বিড়ড়া। স্থানীয় ভাষায় যার অর্থ 'দেবতার বিচরণ ভূমি।'

পায়ে হাটা মেঠো পথের ধারে বিশ পঁচিশ ঘর লোকের বাস। পাড়ার বা গ্রামের প্রান্তে একটি বড় ঢিপি, পাশেই একটি নলকূপ অল্পদিন আগে বসান হয়েছে। ঢিপিটির তিনদিকে অশ্বখুরাকৃতি নিচু

জমি। দেখে বেশ বোঝা যায় এখানে এক সময়ে কোন পাহাড়ী নদীর বাঁক ছিল। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে জলস্রোত লুপ্ত হয়েছে।

টিপির উপর বড় বড় পাথরের চাঁই চারিদিকে ছড়ান। এই সব পাথরের অনেকগুলিই পুরাণ মন্দিরের আমলকের অংশ বা মন্দির শীর্ষের কলস। দেখলাম পুরো টিপিটির একটি দিক খানিকটা খোঁড়া হয়েছে। টিপির ওপর গোটা পাঁচেক অতি পুরাণ পাথরের মন্দির, যার নিচের দিকটায় পাথরের উপর সুন্দর খোঁদাইএর কাজ। কিন্তু উপরের দিক অতি কাচা হতে কোন মতে পাথরের উপর সিমেন্ট দিয়ে পাথর বসিয়ে মন্দিরের আকৃতি দেবার চেষ্টা হয়েছে। শুনলাম বছর দুয়েক আগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ও পূর্ত বিভাগের সহযোগীতায় এখানে কিছুটা খনন কার্য চালান হয়েছিল। তার ফলে তিন শতাধিক দিগম্বর জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। আরও কয়েক শ মূর্তির ভাঙ্গা অংশ চারিদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। বহু মূর্তির অংশ ভেঙ্গে পথ তৈরীর খোয়া হয়েছে। বহু মন্দিরের ভাঙ্গা অংশ এর গুর বাড়ির পৈঠে বা জমির দেওয়াল হয়েছে। পূর্তবিভাগ সংগৃহীত মূর্তিগুলি দুটি পাকা ঘর তৈরী করে রেখে গেছেন। মঞ্জুরীকৃত অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে গেছে। একটি দিগম্বর মূর্তি, উচ্চতায় প্রায় দশ ফুট, এটি স্থানীয় লোকেরা ভৈরব বলে পূজা করেন। অল্প দূরে একটি ভাঙ্গা মন্দিরের ভিত্তির উপর কাল পাথরের মহাবীর মূর্তিকে (দু' পাশে মৎসকন্যা শোভিত) স্থানীয় লোকেরা দেওতা নামে নিত্য ফুল জল দেয়।

সমস্ত বিগ্রহগুলি কাল পাথরের। সেগুলির কোনটির স্থাপত্য-শৈলী খণ্ডগিরি উদয়গিরির স্থাপত্যকৌশলকেও লজ্জা দেয়। বহু ভাঙ্গা মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের পাথরের অংশ চারিদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। কোনটির রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। পুরো পাক্ বিড়্ড়া অঞ্চল দেখে বেশ বোঝা গেল সহস্রাধিক বছর আগে

এখানে ছিল এক মন্দির ও প্রাসাদময় জনপদ। কোন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও চেষ্টা ভিন্ন এত বড় দেবস্থান গড়ে উঠতে পারে না।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে দেখে নলকূপের পাশে বসে সঙ্গে নিয়ে আসা শুকনো খাবারে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া শেষ করে পাকবিড়ড়ার প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে করতে এক বুড়ো আদিবাসীর ঘরে হাজির হলাম। তিনি এখানকার এক পুরোনো কিম্বদন্তী শোনালেন। তার মুখে শোনা কাহিনী শুদ্ধ ভাষায় বললে কাহিনীটি হচ্ছে—

বিহারের কুন্দগ্রাম। গ্রামটি ছোট। গ্রামের ক্ষত্রিয় পাড়া আরও ছোট। কয়েক দিন হোল এ'পাড়া একেবারে নিশ্চুপ হয়ে আছে পাড়ায় সমর্থ পুরুষ একজনও নেই। বৈশালীর রাজার সঙ্গে রাজগৃহের চলেছে সংঘাত। কুন্দগ্রামের ক্ষত্রিয়েরা সবাই জ্ঞাত্রিক বংশের লোক। তারা বৈশালী রাজের সগোত্র। সেজন্য সবাই রাজার সাহায্যে এগিয়ে গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সমস্ত পাড়াটার উপর নেমে এসেছে একটি উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা আরও বেশী ক্ষত্রিয় সর্দার সিদ্ধার্থের বাড়িতে। সিদ্ধার্থ সৈন্য চালনার দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে বৈশালীর রক্ষাকার্যে।

যুদ্ধের কি ফলাফল হয়, সিদ্ধার্থের জীবন বা মৃত্যু এগুলি এই উৎকণ্ঠার কারণ নয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ। ক্ষত্রিয় নারীপুরুষ জয়, পরাজয়, জীবন, মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে নিয়েছে, সেইজন্য যুদ্ধের খবর সম্পর্কে তাদের চিত্ত কিছুটা ভাবনাহীন।

উৎকণ্ঠার প্রথম কারণ সিদ্ধার্থের বৃদ্ধ পিতা চলৎশক্তিহীন হয়ে বিছানায় প'ড়ে আছেন। তার মহাযাত্রার সময় আগত। কিন্তু পুত্রেরা কেউ কাছে নেই, তার উপর সিদ্ধার্থের স্ত্রী ত্রিশলা আসন্নপ্রসবা। সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ত্রিশলার স্বাস্থ্যবান সুন্দর কান্তি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হোল এবং তারই এক দণ্ড পরে নবজাতকের পিতামহ মাটির মায়া কাটালেন।

পুত্র জন্মের আনন্দ সংবাদ দেবার জন্যে নয়, অশৌচ অবস্থায় একমাত্র পুত্রবধূ শ্বশুরের মুখাগ্নি করতে পারবে না। যদি সম্ভব হয় পুত্র যেন একবার এসে পিতার মুখাগ্নি করে যায়, এই খবর দিয়ে ত্রিশলা একজন দাসীকে পাঠাল বৈশালী রাজপ্রাসাদে।

যুদ্ধের সময় কোথায় গিয়ে সেনাপতির দেখা পাওয়া যাবে ? তার উপর মেয়েদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাওয়া যেমন শোভন নয় তেমনি নিরাপদও নয়। দাসী বুদ্ধিমতী। সে সোজা রাজপ্রাসাদের দরজায় গিয়ে দ্বাররক্ষীকে বলল, 'আমি সেনাপতির বাড়ী থেকে আসছি, রাজাকে খবর দিন আমি তার সঙ্গে দেখা করব। বর্তমান যুদ্ধের সম্পর্কে জরুরী গোপন সংবাদ আছে, সে সংবাদ একমাত্র রাজা ছাড়া কাউকে জানান যাবে না।'

দ্বাররক্ষীর মুখে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজা দাসীকে তার গোপন পরামর্শগৃহে ডেকে পাঠালেন।

দাসী রাজাকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করে। সেনাপতির পিতৃ-বিয়োগের সংবাদের সঙ্গে সেনাপতির পুত্রলাভের সংবাদটিও সে রাজাকে জানায়। রাজা নবজাতকের চেহারা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। দাসী হেসে উত্তর দেয়, 'আমাদের সেনাপতি বীর কিন্তু তার পুত্রের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দেখে মনে হয় সে হবে মহাবীর।'

এই সময়েই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়ের সংবাদ এল। রাজাও দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে সেনাপতি সিদ্ধার্থকে নিজগৃহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং ঐ দূতমুখেই জানিয়ে দিলেন, 'তোমার মহাবীর পুত্র জন্মেছে।'

নবজাতকের শেষপর্যন্ত ঐ নামই স্থায়ী হয়ে গেল।

অপূর্ব সুন্দর চেহারা, মধুর কণ্ঠস্বর এবং জন্মকালীন জাতির যুদ্ধ-জয়ের স্মৃতি বিজড়িত থাকায় বালক মহাবীর জ্ঞাতিক গোষ্ঠির প্রতিটি মানুষের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠল। পাঠশালায় মহাবীর সবচেয়ে মেধাবী ও শান্ত ছাত্র. ক্রীড়া প্রাঙ্গণে সবচেয়ে চঞ্চল আবার শিকার করতে গেলে মহাবীর সবচেয়ে সাহসী ও তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ।

একদিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে মহাবীরের চোখে পড়ল রাজার ভ্রাতুস্পুত্রী যশোদার প্রতি। যশোদাও ফিরে তাকায় মহাবীরের দিকে। কি ছিল সে চোখে কেউ বুঝি জানেনা, এর পরই চির চঞ্চল মহাবীর হয়ে উঠল চিন্তাশীল। । ক্ষণিকের দেখা মুখখানির প্রতি আসক্তি বেড়েই চলে। ত্রিশলার চোখে ধরা পড়ে পুত্রের এই ভাবান্তর তিনি খুঁজে বের করেন পুত্রের ব্যাধির মুল। একদিন শেষপর্যন্ত যশোদা এসে পৌছয় ত্রিশলার পুত্রবধূরূপে।

মাত্র দু-বৎসর কাল মহাবীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যশোদার প্রেমে। আবার ঘটে সেই ভাবান্তর।

আসক্তির মোহে একদিন মনে হয়েছিল যশোদার মাঝেই বুঝি আছে পরমা প্রাপ্তি, এখন মনে হচ্ছে বুঝি সমস্ত আসক্তিকে ছুড়ে দূরে ফেলে দেবার মাঝে আছে পরমা গতি। কোথায় আছে চরম সুখ, পরম প্রাপ্তি। এই মুহূর্তে যা কিছু চাই পর মুহূর্তে মনে হয় বুঝি ভুল করে চেয়েছি, যা পেয়েছি তাকে বুঝি চাইনি। যশোদা নিয়ত চেষ্টা করে মহাবীরকে এই সব চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে ভোগসুখের মাঝে ডুবিয়ে রাখতে।

যশোদার কোলে এল মল্লিকা ফুলের মত এক সুন্দরী কন্যা।

কন্যার মুখের দিকে চেয়ে মহাবীরের মনে হয় এ আর একটি দুঃখময় মায়ার বাঁধন। ঘর ছেড়ে মহাবীর বেরিয়ে পড়লেন সত্যের সন্ধানে।

চলল সুদীর্ঘকাল তপস্যার মাঝে ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনকে সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত করবার চেষ্টা।

দীর্ঘ তপস্যার পর মনে হোল তিনি জয় করেছেন ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাকে, হয়েছেন জিতেন্দ্রিয় বা জিন, সামনে দেখতে পাচ্ছেন এক ক্ষীণ আলোকে ঢাকা মুক্তি ও শান্তির পথ। তিনি ত্যাগ করলেন সব কিছুর উপর আসক্তি ও আকর্ষণ, এমনকি পরনের কৌপিনখানির প্রয়োজনও তিনি ত্যাগ করলেন। দীর্ঘকাল সুমেত গিরির নির্জন

শিখরে বসে আত্মসমালোচনার পর মহাবীর বেরিয়ে পড়লেন নিজের উপলব্ধি বিশ্ববাসীকে জানাতে ও তাদের অনুপ্রাণিত করতে অহিংসা ও অনাসক্তির পথে চলার জন্যে।

দিগম্বর সন্ন্যাসী মহাবীর এগিয়ে চলেছেন রাঢ়ভূমির পথ দিয়ে, কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তখনও রাঢ় ও পূর্ব ভারতে পুরোপুরি আর্যীকরণ হয় নি। আর্যপূর্ব কৌম সমাজের লোকেরাই প্রধান জনগোষ্ঠি হলেও তাদের মধ্যে মহাতপা ঋষি ও তার পরবর্তী কালের অনেকেরই চেষ্টায় বৈদিক প্রভাব কিছুটা ঢুকে পড়েছে। তারা বেদ বিরোধী মহাবীরের দিকে কুকুর লেলিয়ে দিল।

পরেশনাথ পাহাড়ের সমাধিশিখর, যেখানে মহাবীরের পূর্বতন অন্তত বিশ জন তীর্থংকর নির্বান লাভ করেছেন সেখানে দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে যিনি সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও ইন্দ্রিয় বোধ জয় করেছেন। তিনি কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহ হলেও হাসিমুখে রাঢ়ভূমির ( বাঁকুড়া ) সীমানা ছেড়ে এগিয়ে যান খর্বাটের-জঙ্গলমহলের দিকে। জঙ্গলমহলের পাথুরে মাটির অংশ ( বর্তমান পুরুলিয়া জেলা ) বা অযোধ্যা, পঞ্চকোট, গোর গোমরু, দলমা প্রভৃতি পাহাড় ও তাদের পাদদেশের উপত্যকা ভূমিকে ব'লত বজ্রপনিত ভূমি। সেখানে তখন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অজিবিকী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মছলিপুত্র গোসালের প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

দীর্ঘ বংশদণ্ডধারী অজিবিকী সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষু পথিপার্শ্ব থেকে কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহ জ্বরাক্রান্ত মহাবীরের অর্ধচেতন দেহ তুলে নিয়ে গেল এক আদিবাসী সর্দারের গৃহে। খর্বাটের জঙ্গলে বা বর্তমান পুঞ্চার নিকটবর্তী সেই সর্দারের গৃহে ভিক্ষুর চিকিৎসা ও গৃহবাসীদের সেবায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন দিগম্বর শ্রমন মহাবীর। সুস্থ হয়ে মহাবীর প্রথমেই যান গোসালের আশ্রমে। গোসাল ও মহাবীর পরস্পর পরস্পরের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানষিক উদারতায় মুগ্ধ হন। খর্বাটের জঙ্গলমহলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে দিগম্বর

শ্রমনের প্রভাব বাড়তে থাকে। বহু লোক মহাবীরের অনাসক্ত অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করে ও একদল দিগম্বর সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। এরাই জৈনদের ধর্বা ভূয়া শাখা-নামে পরিচিত হয়। যে সর্দারের গৃহে মহাবীর চিকিৎসিত হয়েছিলেন তাদের চোখে মহাবীর ভগবান হয়ে রইলেন।

সম্রাট অশোক সারা ভারতে বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধ ধর্মমত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একমাত্র ব্যতিক্রম হোল কলিঙ্গ। কলিঙ্গের লোকেরা বৌদ্ধধর্মমত গ্রহণ করলেও তারা কলিঙ্গ জয়ের প্রাক্ কালীন অশোকের নিষ্ঠুরতাকে বুঝি ভুলতে পারেনি। সেইজন্য অশোকের মৃত্যুর পরই যেইমাত্র কলিঙ্গে মৌর্য শাসনের অবসানের পর চেদী বংশীয় রাজা খারবেল কলিঙ্গের অধিপতি হলেন দিগম্বর জৈন মতবাদ কলিঙ্গ থেকে বৌদ্ধধর্মকে হটিয়ে দিতে আরম্ভ করল।

খৃষ্টিয় শতকের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে চেদী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। কলিঙ্গ কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন সামন্ত রাজ্যে পরিণত হোল। ময়ূরভঞ্জের খিচিংয়ে চেদী বংশের রাজত্ব টিকে ছিল চতুর্থ শতক পর্যন্ত। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কলিঙ্গ অভিযান করলেন খিচিং এর চেদী রাজ স্বপরিবারে নিহত হল। একমাত্র তরুণ রাজপুত্র আহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন জঙ্গলমহলের অরণ্য মধ্যের এক আদিবাসী সর্দারের গৃহে।

এই আদিবাসী পরিবারের মধ্যে কাহিনী প্রচলিত ছিল : সাতশ বছর আগে এই গৃহেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন আহত ভগবান মহাবীর।

বর্তমান সর্দারও আহত রাজপুত্রকে ভগবানতুল্য শ্রদ্ধা নিয়ে গৃহে আশ্রয় দিলেন। সর্দারের কিশোরী কন্যা চন্দ্রপ্রভার আপ্রাণ সেবা-যত্নে আহত রাজপুত্র ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। সিংহবিক্রম রাজপুত্র আপন পরিচয় গোপন করে সর্দারগৃহে বাস করতে লাগল। আদিবাসীদের মধ্যে সে সিংহদেবতা নামে পরিচিত হোল (সিংদেও)।

সর্দারের মৃত্যুর পর সিংদেও নিজ চেষ্টায় পুঞ্চার বনমধ্যে রাজধানী করে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। আদিবাসীদের ভাষায় রাজধানীর নাম দেবতার বিচরণ-ভূমি বা পাকৃবিড়া বলে পরিচিত হোল। রাজা সিংদেও নিজে ছিলেন দিগম্বর জৈন ধর্মে বিশ্বাসী। একদিন তিনি সর্দারকন্যা চন্দ্রপ্রভাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিলেন। চন্দ্রপ্রভা কিন্তু স্বামীকে মনে করতেন, তাদের বংশের পূর্বপুরুষদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী স্বয়ং ভগবান মহাবীরের অবতার। সিংদেও এর মৃত্যুর পর চন্দ্রপ্রভা নিজেকে স্বামী ও মহাবীরের সেবায় নিযুক্ত করলেন এবং তারই চেষ্টায় পাকৃবিড়া হয়ে উঠল জৈন মন্দিরময় তীর্থ।

পূর্ব ভারতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোল। ধর্মপালের বিজয় অভিযানের সঙ্গে চলল জৈনদের উপর রাজধর্ম বৌদ্ধ মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের সাঁড়াশী অভিযান। পাকবিড়া, সিংদেও রাজত্ব সহ মাটিতে মিশে গেল। ধর্মপালের অধীনে মান রাজা, অল্প দূরে মানবাজার নামে রাজধানী গড়ে তুললেন। পাকবিড়ার ধ্বংসস্তূপ জঙ্গলে চাপা পড়ল।

বিংশ শতকের আগে পর্যন্ত সহস্রাব্দীকাল মাটিচাপা থাকার পর আবার জঙ্গলমহল বা পুরুলিয়ায় জনবৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবি আদিবাসীরা জঙ্গল হাসিল করে পাকবিড়ার কাছে বসতি গড়ল। মাটি খুঁড়তে গিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল এক পাথরের বিশাল দিগম্বর মূর্তি। সে মূর্তিকে আদিবাসীরা ভৈরব নামে পূজা করতেন।

ফেরার বাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে কাহিনী আরও বিস্তারিত ভাবে না শুনে ফিরে এলাম ইনপুরের মোড়ে। বিজয় মন্তব্য করল, আমাদের দেশের ইতিহাসে বলে—পুরুলিয়া চিরকালই সভ্যতা বিবর্জিত জঙ্গলমহল। সেখানে এমন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও কাহিনী পাওয়ার পর, কি সরকার কি বাংলার শিক্ষিত সমাজ, নির্বিকার। অন্য দেশ হলে সেখানকার শিক্ষিত সমাজ ভেঙ্গে পড়ত এর প্রকৃত তথ্য ও রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য।

রাতের ট্রেনে পুরুলিয়া থেকে ফিরলাম ইতিহাসের জিজ্ঞাসা নিয়ে।

## কুড়ি

### শান্তিপুর

টেবিলের উপর হাতে লেখা একখানা চিঠি।

কল্পনা লিখেছে: 'মাকে সঙ্গে করে শান্তিপুর যাবার কথা ভুলে গেছেন নাকি? সেই বিষয়ে আলোচনা করতে আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। আর একটু বলি। একদিন আপনার সঙ্গে উত্তরপাড়া যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, একরকম জোর করেই আপনাকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম; এখন মনে হচ্ছে কাজটা ভাল করিনি, বোধ হয় সেদিন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করেছিলাম। কারণ তারপর কয়েকবার আপনার এখানে এসে দেখা পাইনি। যতবারই এসেছি আপনার বাড়ী থেকে একটি মাত্র জবাব পেয়েছি: 'তিনি তো বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন, ফিরতে দেরী হবে।' আপনার কাছে ঠিকানা ও একটা টেলিফোন নম্বরও দিয়েছিলাম, মনে আছে কি? বার বার এসে ফিরে যাচ্ছি কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে আপনি খবর নেন নি। প্রথম যখন আলাপ হয়, মনে করেছিলাম, আপনার মত ভ্রমণপিপাসু লোকের সঙ্গে যে কেউ বেড়াতে যেতে চাইলে আপনি খুশি হন। এখন মনে হচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে আপনি বেশি খুশি হন।

যাক সে কথা, এবার বলি, আমাদের খুব শিগ্গীই কলকাতার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। যদি দয়া করে একবার আসেন, শেষ বারের মত দেখা হয়। না আসতে পারলে এই সপ্তাহের মধ্যে কবে কখন্ গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে; জানাবেন'। শ্রদ্ধা। ইতি,

কল্পনা।

চিঠির উপরে ওদের বাসার ঠিকানা দেওয়া ছিল। পরদিনই যাব বলে মনস্থ করলাম। সন্ধ্যার আগে যাওয়া যায় না, হাতে অনেক কাজ। কিভাবে কাজগুলো চটপট করে ফেললাম কে জানে, কাজ শেষ হতেই এক অদৃশ্য শক্তি বেলা চারটের মধ্যে আমাকে ওদের বাড়ী টেনে নিয়ে গেল।

মস্ত বড় পুরান বাড়ী। সামনের দিকে একপাশে শোবার ঘর, ভিতরের বারান্দার এক পাশে একটি ছোট্ট রান্নাঘর, এইটুকু কল্পনারা ভাড়া নিয়েছে। বাকী অংশে আরও দু' তিন ঘর ভাড়াটে। বাড়ীওয়ালা তার বৃহৎ পরিবার নিয়ে বাস করেন দোতলায়। বাইরের খোলা রোয়াক থেকে সরাসরি কল্পনাদের শোবার ঘরে ঢুকতে হয়।

নম্বর খুঁজতে খুঁজতে বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কানে এল, কে যেন গান গাইছে

'যে দিন দেখা হোলো মাধবী তরুতলে,
কেন কথা কহিলেনা নীরবে এলে চলে ?
দুজনার আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে,
দোঁহার প্রাণের কথা, প্রাণেতে গেল রয়ে।
অর্ঘ রচিবি শুধু নীরব নয়ন জলে।
যেদিন দেখা হোলো মাধবী তরুতলে ॥

কার গলা ? কে গাইছে ? চমৎকার গায়কী। গান শুনলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর কড়া নাড়লাম। কল্পনা দরজা খুলল। উদ্ভাসিত মুখ। হাসি হাসি মুখে সে বললে, 'আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, আজ আপনি আসবেন। বসুন, মাকে খবর দিই।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম,

'কে গান গাইছিল ?'

সে সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'তোমার গলা বেশ মিষ্টি। শুনতে ভালোই লাগছিল।'

'আপনি কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ?'

'মিনিট চার পাঁচ হবে। গান না থামলে আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম।'

কল্পনার লজ্জা এবার কপট ক্রোধে রূপান্তরিত: 'সাড়া না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গান শোনা!' সে বললে, 'পাড়ার লোকে দেখলে কি ভাবত ?'

হাসলাম। 'এখন তো ঘরে ঢুকেছি, একখানা গান ভাল করে শোনাও দেখি।'

কল্পনা বললে, 'খেলাধূলার মত গানেরও খুব সখ ছিল বাবার, তাঁর কাছেই আমার গানের হাতে খড়ি। তিনি মারা যাবার পর বছর দশেক আর হারমোনিয়াম বের করি নি। আজ ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে কি খেয়াল হোলো, হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটু বসেছিলাম।' '

ঘরখানা বেশ বড়, একপাশে চৌকির উপর বিছানা পাতা। সঙ্গ ভাঁজ ভাঙ্গা বেড কভার। তাতে সুন্দর সীবনকর্ম। একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার, টেবিলে অনেকগুলো বই সযত্নে সাজান। মেঝের উপর গালিচা আর হারমোনিয়াম। পাশে আধ বোনা সুতোর কাজের সরঞ্জাম। কল্পনা সেগুলো গোছাতে গোছাতে বলল, 'মায়ের হাতের কাজ খুব সুন্দর। অবকাশ পেলেই বোনাবুনি নিয়ে বসেন।'

'কই গান শোনাও।'

'এখনি ?'

'বা এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে ?'

'আপনি ভীষণ চালাক। বসুন, মাকে খবর দিয়ে আসি।'

বললাম, 'তিনি যথাসময়ে খবর পাবেন। আমি এমন গুরুতর ব্যক্তি নই যে তাঁকে উজিয়ে খবর দিতে হবে। নাও সুরু করো।'

সে হারমোনিয়াম নিয়ে বসল। নিজের মনে কিছুক্ষণ গুন গুন করে গান ধরল:

'প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে,
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোন খানে কিছু ইশারা কি তার পেলে,
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত আগুনে, প্রাণে মোর জ্বলো জ্বলো
হে পথিক, বলো বলো—

গান শেষ না হতেই কল্পনার মা ঘরে ঢুকলেন। বৈধব্যের কৃচ্ছ্র-সাধনের চিহ্ন শরীরে পরিস্ফুট। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কোন সময়ে তিনি যে সুরূপা ছিলেন আজ তা একেবারে অবলুপ্ত নয়, শ্রদ্ধা জাগে। তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, কন্যার রূপলাবণ্য তার মায়ের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া। সদ্য স্নান করা। সাদা থান, দীর্ঘ-চেহারার মধ্যে অপূর্ব সৌম্য ও সাত্বিক ভাব। প্রণাম করলাম।

তিনি বললেন, 'বস বাবা। তোমাকে তো ঠিক—'

কল্পনা বললে, 'মেজদা। আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি শুনে দেখা করতে এসেছেন।'

'কবে যাচ্ছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ভাদ্র মাসের এই কটা দিন আছি।' উত্তর দিলেন তিনি।

কেন চলে যাচ্ছেন—কোথায় যাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওরা যখন নিজে থেকে কিছু বললেন না, আমি চুপ করে থাকাই সমীচীন মনে করলাম।

পরে বললাম, 'আপনি নাকি শান্তিপুর দেখতে যেতে চেয়েছিলেন, দু' এক দিনের মধ্যে চলুন না? আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

কল্পনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমার প্রস্তাবে কল্পনার মা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বেশতো। এ সাধ অপূর্ণ থাকে কেন? তা হলে পরশুই যাই, কি বলিস? শ্যামচাঁদ যখন ডেকেছেন, এর পর কবে কোথায় থাকি—'

নিশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, 'কখন কোন গাড়ীতে যেতে হবে' ঠিক করে শুনে নে, আমি বরং উনুনে আগুন দিয়ে আসি। বাবা তুমি যেন চা না খেয়ে চলে যেও না।'

তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

*      *      *

সকাল ছটার সময় কল্পনা ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদা থেকে শান্তিপুর লোকালে চেপেছি। ইলেকট্রিক ট্রেন প্রতি স্টেশনে থামলেও গতিবেগ কম না।

তখন ঘড়ির কাটা আটটার দাগ ছোঁয়নি, আমাদের গাড়ী রাণাঘাট স্টেশন ছাড়ল। একটু পরেই লক্ষ্য করলাম, রেললাইন পাশের জমির চেয়ে ক্রমে বেশী উঁচুতে উঠছে, বুঝলাম সামনেই চুর্ণি নদীর পুল। ঝম ঝম শব্দ করে ট্রেন পুলের উপর উঠল। শব্দটি মনে কেমন একটা রোমাঞ্চ আনে। পুবদিকের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বহু নিচে ভাদ্রের পূর্ণ যৌবনা চুর্ণী, তার ঘাটে ভোর বেলাই কয়েকটি গ্রাম্য বধূ স্নানরতা আর রসিক সূর্যদেব যেন সবারই গায়ে লজ্জা-আবির ছিটিয়ে দিচ্ছে। সূর্য ক্রমশ প্রখর হচ্ছিল।

সওয়া আটটা বাজলো। ট্রেন ফুলিয়া পিছনে ফেলে শান্তিপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ফুলিয়া কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি।

রেলপথের দুদিক জলময়। মনে পড়ল বৈষ্ণব-কবির গানের কলিটি—'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আজ নিছক বাস্তবচোখে দেখতে পাচ্ছি আমরা যেন শান্তিপুর নামে একটি দ্বীপে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। চারিদিকে নদীর খাদ, ভরা বর্ষার জলে টলটলে। বর্ষার জলধারা নদীয়ার বহু জায়গা ডুবিয়ে দিয়েছে, শান্তিপুর সত্যি ডুবু ডুবু। এক সহযাত্রীর মুখে শুনলাম, শান্তিপুরের এটা বার্ষিক ঘটনা—বছরের প্রায় চার মাস, জলে ঢাকা না পড়লেও শান্তিপুর জলে ঘেরা থাকে।' আটটা কুড়ি মিনিটে আমাদের ট্রেন এসে থামল শান্তিপুর স্টেশনে।

আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়েই পেলাম এক বৃদ্ধকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'শান্তিপুরের দর্শনীয় কি কি স্থান আছে ও সেগুলি কত দূরে?' বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'শান্তিপুর এমন একটা জায়গা যার ইতিহাস বাংলা ভাষার মত প্রাচীন অর্থাৎ প্রায় হাজার বছরের। এই হাজার বছরের ইতিহাসের নিদর্শনগুলিকে মহাকাল যেমন চূর্ণ করেছে তেমনি ভাগীরথী বার বার গতি পরিবর্তন করে ঐ সব চূর্ণীকৃত উপাদানগুলিকে তার করালস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অব্যাহতি পেয়েছে শান্তিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যটুকু, রক্ষা পেয়েছে শান্তিপুরের প্রাণ। আপনারা আরম্ভ করুন বাবলা থেকে, শেষ করবেন কালনার ঘাটে। দেহটি নেই শান্তিপুরের, দেহ ভস্মে পরিণত হয়ে পড়ে আছে, সেই ছাইগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন কান পেতে শুনবেন। শুনতে পাবেন, শান্তিপুরের মর্মের বাণী আজও সেই ছাইএর মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে!' ভাবুক বৃদ্ধের কথার স্রোত হয়ত আরও দীর্ঘায়িত হোত। কল্পনা অধৈর্য হয়ে আমার হাতে টান দিল, 'আসুন, আমরা আগে বাবলা অদ্বৈতের শ্রীপাট দর্শন করে আসি।'

তিন জন এগিয়ে চললাম স্টেশনের কাছে রিকসা স্ট্যাণ্ডে। রিকসাওয়ালারা বাবলা শ্রীপাটে যেতে-আসতে রিকসা প্রতি দু'টাকা করে চাওয়ায়, আমরা হেঁটেই এগুতে লাগলাম। স্টেশন থেকে আমবাগানের ভিতর দিয়ে প্রায় একমাইল গিয়ে একটা নিচু জমি পার হয়েই বাবলায় পৌঁছলাম। ঐ নিচু জমিটা শুনলাম, একদা প্রবাহিত গঙ্গার চড়া। এইখানে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে, জাহ্নবীতটে বসে, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য, ত্রিতাপ তাপিত জীবের দুঃখ মোচন করার জন্য কঠোর তপস্যায় ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। আর এই আরাধনা ক্ষেত্রেই শচীমাতা তাঁদের পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আশীর্বাদপূত তুলসীমঞ্জরী সেবনেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

"অদ্বৈত হুঙ্কারে সুরধুনী তীরে, আইলা নাগররাজ।
তাহার পিরীতে, আইলা ত্বরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ ॥
জয় সীতানাথ, করল্ল বেকত, নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ (চৈতন্য ভাগবত)

বাবলা শ্রীপাট সেই পরম পবিত্র স্থান, যেখানে ঘটেছিল গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহামিলন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই অদ্বৈত ভবনে মহাপ্রভু দশদিন অবস্থান করেন। এখানেই শচীমাতা প্রাণের দুলাল সন্ন্যাসবেশী গৌরসুন্দরকে স্বহস্তে রান্না করে আহার করান। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদ অধ্যয়ন করে শ্রীগৌরাঙ্গ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন এখানেই। এই পবিত্র ক্ষেত্রেই ব্রহ্মকল্পতরু, মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতাচার্যকে দীক্ষা দান করেন। শ্রীশ্রীহরিদাসের অদ্বৈতপ্রভুর কাছে দীক্ষালাভ এই আশ্রমভূমিতেই। বাবলা শ্রীপাটের প্রতি অনুপরমাণু শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তপঃ প্রভাবে দীপ্তিমান। তিনি প্রভুর চরণরজঃপূত এই ভূমির আকাশ-বাতাস পবিত্র। যে নাম-প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় একদিন নদে ভেসেছিল, শান্তিপুর ডুবু ডুবু হয়েছিল তার উৎসভূমি এই অদ্বৈত পাট এক পবিত্র তীর্থ। নীচু হয়ে তীর্থরজঃ মাথায় নিলাম। দেখি কল্পনার মায়ের দু চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রকটাবস্থায় এই আশ্রমের পাশ দিয়ে গঙ্গা দক্ষিণ মুখে বয়ে চলত। কালক্রমে গঙ্গা দূরে সরে যাওয়ায় লোকালয়ও দূরে চলে যায়। শান্তিপুরের শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশের গোস্বামী সন্তানরাও বহু পরিবারে বিভক্ত হয়ে শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নিজ নিজ সুবিধামত পৃথক পৃথক বাড়ী করে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেছেন। বর্তমানে শ্রীপাট এক বিশাল নির্জন আমবাগানের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দারুময় বিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগোপাল জীউ ও নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সামনে পূর্বমুখী নাটমন্দির। বকুলতলায় ভজন স্থান ও বিশ্রামগৃহ। মন্দির সংলগ্ন

ভোগ রন্ধনশালা ও সেবাইতদের ঘর। পাশে আরও দুটি ঘর সাধু বা ভক্ত দর্শনার্থীদের বাসের জন্য রক্ষিত; সমস্ত নিয়ে বাবলার শ্রীশ্রীঅদ্বৈত পাট নির্জন, পবিত্র, দেবভাবে পুর্ণ। এখানে এসে মনে হচ্ছিল, আমরা বর্তমান যুগের ক্লেদাক্ত পৃথিবী ছেড়ে বহুদূরে যেন কোন এক পবিত্র গ্রহান্তরে পৌছে গিয়েছি।

কাছে কোন দোকানাদি নেই যে ভক্তরা কিছু কিনে ঠাকুরকে নিবেদন করবে। মন্দিরের সেবাইত ( বর্তমান ) আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ীর শান্তিসখা গোস্বামী নিজে শান্তিপুর শহরের বাড়ীতে থাকেন, মন্দিরের ঠাকুরসেবার ভার একজন বৈষ্ণব ভক্তের উপর দেওয়া আছে। তাঁর মুখে শুনলাম শুক্লা মাঘী সপ্তমীতে শ্রীঅদ্বৈতের শুভ জন্মদিনে বহু বৈষ্ণবভক্তের শুভাগমন হয় এখানে। দোল পূর্ণিমার পরের সপ্তমী তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতের দোল উপলক্ষে এবং দোলের আগের একাদশীতে, মাধবেন্দ্রপুরীর স্মরণ মহোৎসব উপলক্ষেও বহু ভক্ত সমাগম হয়। লোক সমাগম বেশী হওয়ায় বহু যাত্রীকে অনাচ্ছাদিত আকাশের তলে রাত্রি যাপন করতে হয়। একটি মাত্র ইঁদারা, জলাভাবেও ভক্তেরা কষ্ট পান। যে অঙ্গনকে একদিন শচীদুলাল নাটুয়া মুরতি গোরারূপে শত ভক্ত সঙ্গে নর্তনে কীর্তনে মুখরিত করে রেখেছিলেন, যে আশ্রমের শ্রীঅদ্বৈত ঘরণী সীতা ঠাকুরাণীর নানা উপাচারে সজ্জিত মহাপ্রভুর ভোগ বর্ণনার ভাষা কবির কণ্ঠে জোগায় না, যে আশ্রমের ঐশ্বর্য দেখে স্বয়ং গোরা আচার্যকে শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেই পবিত্র তীর্থের শোচনীয় অবস্থা আলোচনা করতে করতে আমরা পশ্চিমমুখী পথে এগোলাম বড় গোঁসাই বাড়ীর দিকে।

বড় গোস্বামী বাড়ীর ঠাকুর দালান দুটি। একটি পূর্বমুখী. মাঝখানে নাটমন্দির। শ্রীঅদ্বৈতের প্রপৌত্র, মথুরেশ গোস্বামীর পুত্র রাঘবেন্দ্র হতে বড় গোস্বামী শাখা। বড় গোস্বামী বাড়ীর মূল দেবতা দোলগোবিন্দ বিগ্রহ ( কষ্টি পাথরের কৃষ্ণ মুর্তি ), প্রথমে ছিল

পুরীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদ অভ্যন্তরে। রাজা বসন্ত রায় সেই দোলগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন যশোরে। যশোরের মন্দিরের পুজারী ছিলেন মথুরেশের শিষ্য। মোগল আক্রমণে যশোর বিধ্বস্ত হবার সময় পূজারী বিগ্রহটি শান্তিপুরে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেন। তখন থেকে দোলগোবিন্দ বড়গোঁসাই বাড়ীর মুল গৃহদেবতা। পরবর্তী কালে এই বংশের বিভিন্ন বংশধরেরা অদ্বৈত আচার্য, সীতাদেবী, রঘুনাথ, ষড়ভুজ মহাপ্রভু বিগ্রহ, মদনমোহন, শ্রীগোপাল, সুভদ্রা, বলরাম, জগন্নাথ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

সারাদিন আমরা তিন জন ঘুরে ঘুরে শান্তিপুরের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখছি, আর প্রত্যক্ষ করছি গত পাঁচশ বছরে গঙ্গা যেভাবে বার বার তার গতি পরিবর্তন করে নিয়েছে। কত ঘরবাড়ী, মন্দির মসজিদ ভেঙেছে আর গড়েছে, কিন্তু মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য ষোড়শ শতকে শান্তিপুরে যে বৈষ্ণব সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শান্তিপুরের মানুষ আজও তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। তাই দেখতে পেলাম, শত শত নূতন-পুরাতন ঠাকুরবাড়ী ও মন্দির। যত অর্বাচীনই হোক, এই সব মন্দির ও ঠাকুরবাড়ীর বিগ্রহ প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে বিদ্যমান। হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার নির্দেশ আছে। বৈশাখে তাঁর চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নান যাত্রা, আষাঢ়ে রথ যাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন যাত্রা প্রভৃতি। বিষ্ণুর এই দ্বাদশ যাত্রা শান্তিপুরে বিচিত্র লৌকিক আচার ও শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠানের মধ্যে পালিত হয় প্রায় প্রতি মন্দিরে।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে তার গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে মদনগোপাল বিগ্রহটি পেয়ে শান্তিপুরে এনে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বাবলার আশ্রমে। অদ্বৈতাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণমিশ্র এই বিগ্রহ, নৃসিংহমুর্তি শিলা ও পিতার নিত্যপাঠের ভাগবতখানি নিয়ে বাবলা ত্যাগ করে শান্তিপুর মদনগোপাল পাড়ায় এসে নিজ ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। বহুদিন পর্যন্ত কৃষ্ণমিশ্র বংশের গৃহদেবতা হিসাবে

থাকলেও বর্তমানে মদগোপাল শান্তিপুরের জনগণের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। মন্দিরের দেখাশুনার ভার বোর্ড অব ট্রাস্টের হাতে।

কল্পনার আগ্রহাতিশয্যে আমরা দেখেছিলাম: (১) হাটখোলার গোস্বামী বংশের বিগ্রহ গোকুলচাঁদ। অদ্বৈতের প্রপৌত্র মথুরেশের দ্বিতীয় পুত্র ঘনশ্যাম থেকে মধ্যম গোস্বামী বা হাটখোলার গোঁসাই বংশ। এই বংশের রঘুনন্দন গুপ্তিপাড়া থেকে গোকুলচাঁদ বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দির ১৭৪০ খৃস্টাব্দে বর্ধমান জাম গ্রামের নন্দীদের সাহায্যে তৈরী। গোকুলচাঁদ ছাড়াও এ মন্দিরে রয়েছেন রঘুনাথ, সীতাদ্বৈত, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিগ্রহ।

২। চাকফেরা গোস্বামীদের রাধাবল্লভ—মথুরেশের ছেলে রামেশ্বর থেকে চাকফেরা গোঁসাই বংশ সুরু প্রবাদ: মথুরেশ রাধাবল্লভের দর্শন পেতেন। শান্তিপুরের একটি চলতি কথা আছে, 'দিনে রাস রাতে দোল এই হোল রামেশ্বরের বোল।' রামেশ্বরের আমলে দিনে রাসের ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে শান্তিপুরের অন্যান্য মন্দিরের মত রাধাবল্লভের রাস রাত্রীকালেই হয়। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের ব্যবহৃত অনেকগুলি সামগ্রী সংরক্ষিত রয়েছে।

(৩) রাধাবল্লভ মন্দিরের পাশেই গোস্বামীদের বাঁশবুনিয়া উপশাখার গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর জীউ। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা পরম ভাগবত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

(৪) আউলিয়া গোস্বামীদের কৃষ্ণরায় ও কেশবরায়—আউলিয়া গোঁসাই বংশের আদিপুরুষ কুমুদানন্দ ছিলেন পণ্ডিত ও মহাসাধক। ধন, ঐশ্বর্য ও সুনামের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। কৃষ্ণনগরের রাজারা বিগ্রহ সেবার জন্য সম্পত্তি দানপত্র করে সেই দলিল কুমুদানন্দের কাছে পাঠিয়ে দেন। গোঁসাইজি মুখে 'শুকরী বিষ্ঠাসম প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর—' এই কথা বলতে বলতে ঐ দলিলে আগুন দিয়ে কৃষ্ণরায়ের আরতি করেন। সেই সময় থেকে এই বংশ আউলিয়া গোস্বামী বংশ বা পাগলা গোস্বামী বংশ নামে খ্যাত।

(৫) জটিয়া বাবার ৺শ্যামসুন্দর—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের পৌত্র দেবকীনন্দন থেকে আতাবুনিয়া গোস্বামীর বংশ সুরু। এই বংশের নবম পুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর (জটিয়া বাবা) সঙ্গে ৺শ্যামসুন্দরের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন নোয়াখালীর জমিদার নরেন্দ্রকিশোর। মন্দিরের পাশে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধন কক্ষটি সযত্নে সংরক্ষিত।

(৬) ওড়িয়া গোস্বামী বংশের নৃত্যগোপাল—পুরীধামের অন্তর্গত টোটার গোপীনাথের সেবা ভারপ্রাপ্ত রামচন্দ্র গোস্বামীর পুত্র রাধাবল্লভ গোস্বামী, পুরীধাম ত্যাগ করে শান্তিপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি আসবার সময় ধাতুময় নৃত্যগোপাল বিগ্রহ নিয়ে আসেন শান্তিপুরে। এই বংশ উড়িয়া গোস্বামী বংশ নামে পরিচিত। এই বংশে ব্যায়ামাচার্য শ্যামসুন্দর গোস্বামীর জন্ম।

(৭) বিশ্বমোহন—নাটোরের রাজবংশের গুরু নৈয়ায়িক রাধামোহন বাচস্পতির কাছে শাক্তরাজা বিশ্বদেব বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে রাজা যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বিগ্রহ বিশ্বমোহন দেব নামে পরিচিত। বিগ্রহ অতি বিশালাকৃতি। শ্রীরাধিকা মূর্তি অষ্টধাতু নির্মিত, ওজন সাড়ে তিন মণ।

(৮) শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ—শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ খাঁ চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত কষ্টিময় শ্যামসুন্দর ও সোনার শ্রীরাধিকা বিগ্রহ। শ্যামচাঁদের মন্দির শান্তিপুরের মধ্যে বৃহত্তম ও সুন্দরতম। এমন সুবৃহৎ ও সুসৌষ্ঠব মন্দির পশ্চিম বাংলায় খুব কম আছে। রাধাকান্ত বিগ্রহও বর্তমানে এই মন্দিরে রয়েছে।

(৯) জলেশ্বর শিব—১৬১৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়াধীপতি রাজা রাঘব এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সাড়ে তিনশ বছর আগে যখন শিব প্রতিষ্ঠিত হন তখন নাম ছিল রুদ্রকান্ত মহাদেব। প্রবাদঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে এক বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষের অবস্থা হয়। মন্দিরে এক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী আসেন। তিনি আদেশ

দিলেন শিবের মাথায় একশ আট কলসী গঙ্গাজল ঢালতে। যেই মাত্র ১০৮তম কলসী জল ঢালা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মেঘশূন্য আকাশ থেকে বর্ষণ সুরু হোল। বহুক্ষণ ধরে হোলো মুষলাধারে বর্ষা। সেই থেকে রুদ্রকান্ত জলেশ্বর শিব নামে পরিচিত হলেন।

(১০) শ্রীশ্রীআগমেশ্বরী—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বাংলা দেশে প্রথম কালিকামূর্তি নির্মাণ করে শ্যামাপূজার প্রবর্তন করেন। কৃষ্ণানন্দের পূজিত এই বার্ষিক পূজা চারশ বছরেরও বেশীকাল ধরে একই মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিদ্ধ সাধকের প্রবর্তিত এই জাগ্রত দেবী মন্দিরকে শান্তিপুরের লোকেরা পীঠস্থান বলে মনে করে।

(১১) শ্রীশ্রীভবতারিণী কালী—শান্তিপুরের বড় মৈত্র বাড়ীর সুবোধ মৈত্র জগদীশ আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দারুনির্মিত ভবতারিণী কালীমাতা এখানে বাংলা ভাষায় রচিত মন্ত্রে পূজিত হন।

কল্পনার মা হয়ত পছন্দ করবেন না মনে করে, আমরা তৈমুরলঙ্গের গুরু হজরত শা দেওয়ানের বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত তোপাখানা মসজিদটি দেখতে গেলাম না। আশানন্দ পাড়ায় বীর আশানন্দ ঢেকীর মূর্তি দেখতে যাওয়াও হোল না।

একদিনে যদি শান্তিপুরের সমস্ত দর্শনীয় দেখে শেষ না করা যায় তবে থাকবার সুব্যবস্থা আছে কিনা খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, তেমন কোন সুব্যবস্থা শান্তিপুরে নেই। মিউনিসিপ্যাল ধর্মশালাটিতে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চলছে। পরিবর্তে দর্শনার্থীদের জন্য কোন ব্যবস্থা করার চেষ্টা কি-সরকার, কি-পৌরসভা কেউই করেন নি। আবাসিক হোটেলের কথা দূরে থাক, স্টেশনের কাছে একটি এবং বড়বাজারে একটি এই দুটি অতি সাধারণ হোটেল আছে শান্তিপুরে। খাবারের দোকান খুব কম নেই কিন্তু এ অঞ্চলের নিখুঁতির যে সুনাম ছিল, এখন তাতে প্রচুর খুঁত।

শান্তিপুরের নিখুঁতির মত আরো একটি নিখুঁত শিল্প আজ গভীর

সংকটের মুখে। সেটি আহার নয়, পরিধেয়। তাঁতে বোনা কাপড় যা শান্তিপুরের গৌরব।

শান্তিপুরের সমৃদ্ধির মূলে ছিল এখানকার বয়ন-শিল্প। তাই বলা যায় শান্তিপুরের সংস্কৃতিও প্রধানতঃ 'বয়ন শ্রমিক সংস্কৃতি'। হাজার বছর আগে থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, পণ্যবাহী তরী শান্তিপুরের বস্ত্রের বদলে স্বর্ণখণ্ড আহরণ করে আনত। সেযুগে এই কাপড়-ব্যবসায়ের টাকা যেমন শ্রমিক সমাজের সকলকে ভালভাবেই বাঁচিয়েছে, তন্তুবায় বণিক-শ্রেণীর বিত্তকে গগনচুম্বী করে তুলেছিল।

১৭৭২ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের বয়ন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও বেশী। বিলাতী কলের কাপড়ের চাপে একশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭২ খৃস্টাব্দে বয়ন শ্রমিকের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছিল তের হাজার ছয়শ আশিতে। শান্তিপুরের গণকবি মহেশ নাটের মুখে তাই শোনা গিয়েছিল :

"তাঁত হারালাম, হাত হারালাম, ভাত হারালাম রে
( ও ভাই ) বুকের কলিজা চূর করলে কে ?
সাগর পারের সাদা ইঁদুর সুড়ং কেটেছে"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁতের উৎপাদন কৌশলের কিছু পরিবর্তন হয়। ফ্লাই সাট্‌ল আসায় উৎপাদনের গতি বাড়ে। তাঁতীর শিল্প চিন্তার বিকাশের ফলে শহুরে রুচি মেটানর ক্ষমতা আসে। কোরার বদলে ধোয়া সুতোয় কাজ হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বর্জনের সুযোগ শান্তিপুরের বয়ন শিল্পকে আবার উন্নতির পথ দেখায়।

স্বাধীনতার পর ফুলতলা ও টাঙ্গাইলের বেশ কিছু সংখ্যক তাঁতী এখানে আসে। বর্তমানে শান্তিপুরে পনের হাজার তাঁত আছে। তাঁত শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে সাইত্রিশ হাজার এবং লক্ষাধিক মানুষ তাঁতের উপর নির্ভরশীল।

১৯৭১-৭২ সাল থেকে শান্তিপুরের বয়নশিল্পের উপর ভয়ানক সঙ্কট নেমে এসেছে! পশ্চিমবঙ্গের তাঁতের প্রয়োজনীয় সুতার মাত্র

পঁচিশ শতাংশ এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। বাকী আসে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু থেকে। ঐ সব প্রদেশে ঐ সুতার যে দাম, এখানে দাম তার চেয়ে অনেক বেশী। তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার সুতার উপর রেলমাশুল অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ফলে শান্তিপুরে সুতা সংকট দেখা দিয়েছে। ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে একশ কাউন্টের যে সুতার দাম ছিল প্রতি পেটি ১৩০ টাকা আগষ্ট মাসে তার দাম বেড়ে হোলো ১৯০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী স্পিনিং মিলের সুতার দাম বাড়িয়ে করে দিলেন ১২০ টাকা থেকে ১৮৫ টাকা। প্রতিখানি তাঁতের কাপড় তৈরী করতে সুতা, রং, মজুরী, তাঁত খরচ প্রভৃতি নিয়ে যে মোট খরচ হয় তার অর্ধেক হচ্ছে সুতার দাম। ফলে শান্তিপুরের তৈরী প্রতিখানি কাপড়ের দাম পাঁচ ছয় টাকা বেড়ে গেল।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে সুতার উপর রাজ্য সরকার ভর্তুকি দেওয়ায় সেখানকার কাপড় ১৯৫৭ সালের পূজার বাজার সম্পূর্ণ দখল করে নিল। বাহাত্তর সালের পূজোর পর থেকে, মহাজন একদিকে বয়ন শ্রমিকের মজুরী কমিয়ে কাপড়ের দামে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করছে, অন্যদিকে অল্প অল্প করে সুতা আমদানী করায় শান্তিপুরের তাঁতের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আজ বন্ধ।

বয়ন শিল্পীর জীবনে মহাজনও একটি প্রয়োজনীয় অশুভ গ্রহ। সাধারণ তাঁতীর বিভিন্ন রংয়ের ও কাউন্টের পেটি পেটি সুতা কেনার সামর্থ নেই। মহাজনের কাছ থেকে সে সুতা কেনে এবং মহাজনকে সে কাপড় বিক্রি করে। একমাত্র পূজার আগের দুমাস ভিন্ন সারা বছরই মহাজন চাহিদার অভাবের অজুহাতে তাঁতীকে কম দামে কাপড় বিক্রী করতে বাধ্য করে। আর্থিক দৈনের জন্য সময়ে-অসময়ে তাঁতীকে দাদন নিতে হয়. এজন্য তাঁতীর কাপড় বিক্রির ব্যাপারে স্বাধীনতাও নিরঙ্কুশ নয়।

সুতার দাম বাড়ায় এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে অসম

প্রতিযোগিতার চাপে এ বছর তাঁতী ও মহাজন উভয়েই হতাশ হয়ে পড়েছে।' আমরা দেখলাম প্রতি ঘরে তাঁত আছে কিন্তু তার খট্ খট্ শব্দ বন্ধ, প্রতি ঘরের দাওয়ায় কর্মহীন তাঁতী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। লক্ষণ দেখে মনে হোল, সারা শান্তিপুরে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে আসছে।

## একুশ

### 'অন্ধকারে মোহে-লাজে'

শান্তিপুর থেকে সন্ধ্যা সাতটার সময় ট্রেনে উঠলাম। আশা ছিল সওয়া নটার মধ্যে ফিরতে পারব কিন্তু ট্রেন লেট করার জন্যে শিয়ালদা পৌছুতেই রাত দশটা বেজে গেল। অধিকন্তু আলো-বিভ্রাট। চারদিক অন্ধকার অর্থাৎ লোড শেডিং। ট্রেন থেকে নেমে কল্পনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিব্রতবোধ করলেন মাসিমা। আমি চোখের পলকে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বললাম, 'মাসিমা, আমি কি আপনাদের পৌছে দিয়ে আসব ?

'তাহলে তো খুব ভালো হয়।' তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে আমার প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

আমরা স্টেশনের বাইরে এলাম। কল্পনা কোনো কথা বলছে না দেখে আমি একসময় বললাম, 'তুমি যেন খুশি নও।'

অন্ধকারে কল্পনা হাসল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তার উত্তরে লঘুতা ছিল। সে স্বভাবমতো ঠিক উত্তরটি এড়িয়ে গিয়ে গানের সুরে বললে, 'অন্ধকারে মোহে-লাজে, চক্ষে কিছু দেখি না যে। ওই দেখুন বাস আসছে—'

কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলাম বটে কিন্তু এইটুকু বুঝলাম সে অপ্রসন্ন তো নয়ই, তবে অন্যমনস্ক যে-কোনো কারণে। ক্লান্ত ? নাকি লোড-শেডিং এর জন্য বিরক্তি ?

অথচ বলার কথা ছিল অনেক। কাকে বলব? অন্ধকারে বাস ছুটে চলেছে। যাত্রীসংখ্যা যথেষ্ট কম, পাশাপাশি মা-মেয়ে, আমি ঠিক পিছনে। বাসের নির্জনতার মধ্যে দু-একটি কথা হয়তো বলা যেতে পারত, কিন্তু বলা হোল না। বাস ওদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তিনজনে নামলাম। মাসিমা ব্যস্তভাবে ভিতরে চলে গেলেন সম্ভবত রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা করতে। হাসিমুখে বলে গেলেন, 'শান্তিপুরে গিয়ে অনেক শান্তি পেলুম। তুমি ছিলে বলেই আমার অনেকদিনের একটি সাধ পূর্ণ হোল।'

দরজার কাছে অন্ধকারে আমি ও কল্পনা। বিপরীত দিকের বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমি ফিরব।

'আগামীকাল সংক্রান্তি।' কল্পনার স্বর তেমনি মৃদু, সে বলছিল, 'আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি পরশু। নিঃসঙ্গ জীবনের অনেকগুলো দিন আপনার সঙ্গে কাটল। চলে যাচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে রইল এ-সব ভ্রমণের স্মৃতি। আমার মনে থাকবে।'

'আমারও।'

বাস এসে গেল। আমি পা বাড়ালাম।

'ওখানে গিয়ে চিঠি দেব।'

'মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়।'

বাসে উঠে পড়লাম। বাস গর্জন করছে। ছেড়ে দিল। অন্ধকার। অন্ধকারে মোহে-লাজে চোখে কি কিছুই দেখতে পায়নি কল্পনা? কি জানি।

বাস ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে এল অনেক দূরে।

# দ্বিতীয় পর্ব

## এক

### গোস্বামী-মালিপাড়া

'রাই জাগো রাই জাগো' শুকশারী বোলে।

'কত নিদ্রা যাওল' রাই কাল মাণিকের কোলে ॥'

মধুর প্রভাতী কীর্তনের সুর কানে এল।

ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙ্গে গেছে কিন্তু আলস্যের জন্য বিছানা ছাড়িনি। শুয়ে ছিলাম গোস্বামী-মালীপাড়ার মদনমোহন মন্দির-সংলগ্ন বৈষ্ণব বাস্তুতে। একমাত্র ব্যাণ্ডেল চার্চের খৃষ্টান যাত্রীদের জন্য ও মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির ছাড়া পশ্চিম বাংলার আর কোথাও বোধ হয় যাত্রীদের থাকবার জন্য, দেবস্থান আয়োজিত, যাত্রীবাসের এত ভাল বন্দোবস্ত নেই।

চৈত্র শুক্লা একাদশী থেকে বল্লভাচার্যের তিরোভাব উপলক্ষে এখানে নামযজ্ঞ ও মহোৎসব চ'লছে। কাল গেছে পূর্ণিমা। গভীর রাত পর্যন্ত মাথুর পালা-কীর্তন শুনে শুয়েছিলাম। কীর্তনের সুরে মনে হ'ল এখনও যেন বৃন্দাবনের ভাবলোকে বিচরণ ক'রছি। নলিনীদার হাতের ধাক্কায় ঘোর কাটল। ভোরের আলো তখনও ভালভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। মন্দিরের দুয়ার তখনও খোলেনি। ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাসে মন্দিরের পাশের বাগানের বেলফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। মন্দিরের বন্ধ দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে দুই বৈষ্ণবী প্রভাতী সুরে রাইএর জাগরণী কীর্তন শেষ ক'রে তখন গোবিন্দদাসের ভজনের একটি কলি ধরেছেন। তাদের পাশে আরও চার পাঁচ জন ভক্ত দাঁড়িয়ে। এরা সবাই আমাদের মত গতরাত্রে মন্দিরে ছিলেন।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এক সঙ্গে এমন তৃপ্তিদায়ক সম্ভোগ কদাচ কপালে জোটে। চোখের সামনে দুই গায়িকা যেন দুই দেবদূতী, কানে আসছে তাদের বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর, নাসিকা পুষ্পগন্ধে তৃপ্ত, মলয়ানিল দেহে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছে। জিহ্বাও বুঝি বঞ্চিত হয়ে থাকতে চাইল না; অবচেতন মনে কখন দেখি ওদের সুরে সুর মিলিয়ে গুণ গুণ করে গাইতে আরম্ভ করেছি।

গায়িকাদের একজন প্রৌঢ়া অন্যে সবেমাত্র কৈশোরের সীমা অতিক্রম ক'রেছে। দুজনেরই দেহবর্ণ কুন্দশুভ্র, গেরুয়ায় ঢাকা। প্রৌঢ়া একটু স্থূলাঙ্গিণী, নবীনা ক্ষীণা। ক্ষীণতর কটিতটের সাথে সারা দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন একটা সুসাদৃশ্য আছে যে তার দিকে চাইলে চোখ হঠাৎ অন্যদিকে ফেরান কঠিন।

এখনও ঠিক সকাল হয়নি। 'ঠাকুর জাগান' দূরে থাক্ মন্দিরের দরজা খোলারও সময় হয়নি, এরই মধ্যে ভজন গাইবার কারণ পরিষ্কার হ'ল. এদের সাজগোজ দেখে, বুঝলাম এরা সবাই এখনই যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে মদনমোহনের উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানিয়ে যেতে এসেছেন।

নলিনীদা তাড়া দিলেন, 'তৈরী হয়ে নাও, আমরাও এখুনি বেরিয়ে পড়ব।'

'আরও দুদিন ছুটি আছে, এত তাড়া কিসের?'

নলিনীদা বিরক্তভাবে ব'ললেন, 'উৎসব-শেষে অনুষ্ঠান বাড়ীতে থাকতে নেই। থাকলে, উৎসব মনে যে মাধুর্য সৃষ্টি ক'রেছে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। আজ মন্দিরে আরম্ভ হবে ঝাঁট-পাটের কাজ।'

বাধ্য হ'য়ে উঠে পড়লাম। গোছগাছ করে নিয়ে আমরাও বেরিয়ে এলাম মন্দিরের সামনে। দেখি বৈষ্ণবীদ্বয় ও দুজন প্রৌঢ় ভক্ত মন্দিরের সিঁড়ির উপর মাথা নত করে বিদায় প্রণাম জানাচ্ছে মদনমোহনকে।

গতকাল ভোরেই আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। প্রথমে এলাম হুগলী জেলার সদর, চুঁচুড়া। সেখান থেকে তারকেশ্বরগামী সতের নম্বর বাসে এসে নেমেছিলাম সানিহাট, বর্তমানে লোক মুখে প্রচলিত নাম সিনেট। চুঁচুড়া থেকে হরিপালগামী বাসও এই পথেই যায়। দুটি বাস রুট। বাসও ছাড়ে ঘন ঘন কিন্তু তবুও বাসে ভীড় উপ্‌ছে প'ড়ছে।

সিনেটে বাস থেকে নেমেই দেখি সামনে বিখ্যাত বিশালাক্ষীর জোড়-বাংলা মন্দির। এই অঞ্চলে বিশালাক্ষী জাগ্রতা দেবী বলে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। প্রতিদিনই মন্দিরে লোকের ভীড় লেগে থাকে। মন্দিরটি পুরোপুরি বাঙ্‌লার নিজস্ব নির্মাণ-শৈলীতে গড়া দোচালা মন্দির, তাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য পাশাপাশি জোড়া, কিন্তু বিষ্ণুপুরের মন্দিরের মত মাথার উপর কোন চূড়া নেই। মন্দিরের মধ্যে সামনেই বিরাট দ্বিভুজা দুর্গা মূর্তি, একদিকে মহাদেব অন্যদিকে রামচন্দ্র। পিছনের সারিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তারও পিছনে দুপাশে রয়েছে গণেশ ও কার্তিক। মন্দিরের গায়ে একখানা প্রতিষ্ঠা ফলক। তারিখ লেখা আছে—সন ১২২৯ সাল। শুনলাম, জাগ্রতা দেবী বিশালাক্ষী চৈতন্য-পূর্বযুগ থেকে এখানে একটি ভাঙ্গা চালায় প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। ১২২৯ সালে বর্ধমানের মহারাজা নাকি সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হন। মহারাজের একজন কর্মচারী ছিলেন পোলবা অঞ্চলের বাসিন্দা। সে সানিহাটের জাগ্রতা বিশালাক্ষীর প্রসাদী ফুল ও চরণামৃত নিয়ে মহারাজকে দেন। চারণামৃত গ্রহণের পরই মহারাজের ব্যাধির উপশম হয়। আরোগ্যলাভের পর বর্ধমানের মহারাজা দেবীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারেরাও দেবীর সেবা-পূজার জন্য বহু জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছিলেন। জমিদারী উচ্ছেদের সাথে সাথে দেবোত্তরও লোপ পেয়েছে। পূজা ও মন্দিরের আগের মত জাঁকজমক আর নেই। তবুও গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বহু ভক্ত বিভিন্ন কামনা নিয়ে

নিত্য আনাগোনা করে, ফলে নিত্য সেবা পূজা মোটামুটি ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে। পাশেই পুরান পুকুর। নামে বৃহৎ জলাশয়, বহু ভক্ত স্নান ক'রছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই পুকুরে স্নান ক'রে দেবীর পূজা দিলে রোগমুক্তি ও মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

এই পুকুরের সাথে বিশালাক্ষীর প্রতিষ্ঠার কাহিনী জড়িত। কিম্বদন্তী—এই পুকুরের ধারে দেবী কুমারীর বেশে একজন শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরে 'দাম আনছি' বলে হালদার মশায়ের বাড়ীতে ঢোকেন। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে শাঁখারী বাড়ীতে ঢুকে হালদার মশায়কে তাঁর মেয়ে শাঁখা পরেছে বলে শাঁখার দাম চান। নিঃসন্তান হালদার মশায় শাঁখারীর কথা বিশ্বাস না ক'রে তাকে ফিরিয়ে দেন। রাত্রে হালদার মশায় স্বপ্নাদিষ্ট হন তাঁর উপাস্য দেবী বিশালাক্ষী স্বয়ং এসে শাঁখা পরে গেছেন, পুরান পুকুরে গেলে দেবীর দেখা পাওয়া যাবে। হালদার মশায় পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখেন জলের উপর শাঁখা-পরা দুখানি হাত নড়ছে ধীরে ধীরে হাত দুখানি জলে ডুবে গেল। রোরুদ্যমান হালদার মশায় বাড়ী ফেরেন ও পুরান পুকুরের পাড়ে একটি চালা তৈরী ক'রে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

সিনেট থেকে গোস্বামী-মালিপাড়া হয়ে দ্বারবাসিনী পর্যন্ত নূতন পাকা রাস্তা তৈরী হচ্ছে ঐ পথে রিক্সা চললেও আমরা হেঁটেই এসেছিলাম মালিপাড়া পর্যন্ত। হেঁটে আসার উৎসাহের প্রধান হেতু রিকসাওয়ালা আড়াই মাইল পথ যেতে ভাড়া চেয়ে বসেছিল পুরো ছ'টাকা। জনশ্রুতি—বর্তমানে দ্বারবাসিনী গ্রামের পাশ দিয়ে কেদারমতী নামে দামোদরের যে ক্ষীণস্রোতা খালটি আছে, পাঁচশ বছর আগে সেটি ছিল পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত চার মাইলের মত চওড়া উত্তাল নদী। নদী পারাপারের ঘাটেট দু'পারে ছিল দুটি ঘাট। নদীর উত্তর পারের ঘাটের পাশে ছিল দ্বারবাসিনীর বিষহরির মন্দির এবং অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে সানিহাটে ঘাটের পাশেই ছিল

হালদার-প্রতিষ্ঠিত জাগ্রতা দেবী বিশালাক্ষী। নদীর মাঝখানে ছিল একটি বিরাট চড়া বা দ্বীপ। ঐ দ্বীপেই ছিল দ্বারবাসিনীর সদ্গোপ রাজা দ্বারপালের পুষ্পোদ্যান। রাজার মালিদের বসতি ছিল বলে দ্বীপটিকে বলা হ'ত মালিপাড়া। কালে কালে কেদারমতী মজে গেল। নদীবক্ষ পরিণত হল বিস্তৃত কৃষিজমিতে। তাকিয়ে মনে হল অনন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে যেন একটা কালো অজগরের মত রাস্তা এগিয়ে গেছে গাছপালায় ঢাকা দ্বীপের মত গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামটির পশ্চিম দিকটি স্পর্শ ক'রে। সিনেট থেকে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগল প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা। এই সময়টুকুর মধ্যেই চৈত্র মাসের ভরা দুপুরে আমাদের বিপরীত দিক থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন লোককে সাইকেলে করে আসতে দেখলাম। সবারই সাইকেলের কেরিয়ারে চাল-বোঝাই বস্তা। বুঝলাম, দ্বারবাসিনী ও পোলবা অঞ্চল থেকে সহরের দিকে চাল-পাচারের এটি একটি বিশেষ পথ।

হালিসহর নিবাসী চট্টোপাধ্যায় বংশীয় মহা বিত্তশালী রাজকর্মচারী শতানন্দ খানের পুত্র ভগবান আচার্য ছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সহচর। মহাধনীর পুত্র হয়েও অল্পবয়সে ভগবান আচার্যের বৈরাগ্য দেখা দেয়। শতানন্দ বাৎস্য গোত্রীয় মধুসূদন ঘটক মহাশয়ের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা কমলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। ভগবান আচার্য ন্যায়শাস্ত্রে ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। তাঁর একটি পা খোঁড়া ছিল এজন্য তিনি খঞ্জ ভগবান বা খঞ্জনাচার্য নামেও পরিচিত ছিলেন। বিবাহের কিছুদিন পরই খঞ্জনাচার্যের পিতৃবিয়োগ হয় এবং পৈত্রিক ভিটা নদীর ভাঙনে গঙ্গাগর্ভগত হয়। পৈত্রিক বিগ্রহাদির সেবা-পূজার ভার স্ত্রীর উপর দিয়ে তাঁকে জুলকূলে চন্দ্রশেখর আচার্যের আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে রেখে খঞ্জ ভগবান পুরীধামে মহাপ্রভুর কাছে চলে যান।

মহাপ্রভুর গৌড়-পরিক্রমা কালে শ্রীপাট কুলীন গ্রামে শত শত লোক মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসেন। সেখানে অবগুণ্ঠনবতী

ভগবান আচার্যের পত্নী কমলা মহাপ্রভুকে প্রণাম করলে মহাপ্রভু তাঁকে পুত্রবতী হও ব'লে আশীর্বাদ করেন। একথা শুনে যুবতী কেঁদে ওঠেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে মহাপ্রভু জানতে পারলেন ইনি নীলাচলবাসী তাঁর পরিকর খঞ্জ ভগবানের ধর্মপত্নী। মহাপ্রভু হেসে ব'ললেন, 'আমার আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না মা, তুমি সত্যই পুত্রবতী হবে।'

নীলাচলে ফিরে গিয়ে:

'মহাপ্রভু তারে কয়, হে আচার্য-গুণময়,
দেশে যাও নিত্যানন্দ সঙ্গে।
আমার বচন ধর গৃহস্থাশ্রমে বাস কর,
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে।
সংবৎসর মধ্যে তব এক সুপুত্র হইবে,
রাখহ শ্রীরঘুনাথ নাম।
জগদীশ পণ্ডিতেরে সমর্পণ করি তারে
আসিয়া রহিও মোর স্থান।"

মধুসূদন ঘটক মহাশয় মালিপাড়া গ্রামে নূতন বসতি স্থাপন করেছিলেন। খঞ্জ ভগবান তাঁরই কাছে নিজ ভদ্রাসন নির্মাণ ক'রে পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন, শ্রীশ্রীবুড়িমাই (কালিকার মুণ্ডমূর্তি) ও কেশবলাল জীউএর নিত্যপূজা প্রবর্তন করেন। মালিপাড়াকে অভিন্ন বৃন্দাবনরূপে পরিকল্পনা করে নাম-প্রেম-দীক্ষা-শিক্ষা প্রবর্তনের বীজ পত্তন করেন। পুত্র রঘুনাথ আচার্য মহাপ্রভুর আদেশমত যশোড়াতে শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কাছে গুরুগৃহে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে গুরুর আদেশ নিয়ে মালিপাড়ায় বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হন। খেতুরীর উৎসবের সময় যখন সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ একত্রিত হন সেখানে রঘুনাথকে মোহান্তের আসন দেওয়া হয় এবং শ্রীনিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবীদেবী রঘুনাথকে নির্দেশ দিলেন,

"ব্রজের চৌষট্টি রস-পর্যায় করিয়া স্থাপন,
মালিপাড়ায় প্রকাশহ শ্রীলীলা কীর্তন।" (জগদীশ করচা)

সেই থেকে মালিপাড়া গোস্বামী-মালিপাড়া নামে খ্যাত হয়।

গ্রামে প্রবেশের মুখেই পড়ে বারমেসে কালীপীঠ। মন্দিরটি খুব পুরান নয় কিন্তু বিগ্রহ সুপ্রাচীন। ভগবানাচার্য, পাঁচশ বছর আগে, এই গ্রামে এসে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন কিন্তু তাঁরও আগে যে সব মালি বা কৃষিজীবিদের বাস ছিল এখানে তারা ছিল শক্তি-উপাসক।

কালী মন্দির ছেড়ে একটু এগিয়ে শিব বাড়ী, তারই পূর্বদিকে গোস্বামীপাড়া। গোঁসাইপাড়ার বাড়ীগুলো প্রায় সবই আগের কালের পাকা বাড়ী, বেশীর ভাগই দোতলা। পাড়ায় ঢোকবার মুখেই মদনগোপালজীউর রাসমঞ্চটি ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসাবশেষের উপর বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়ে উঠেছে। ছোট ইটের গাঁথনি, ধ্বংসস্তুপ দেখেই রাসমঞ্চের বিরাটত্ব বোঝা যায়। পাথরে বাঁ দিকে মদন-গোপালের দোলমঞ্চ এখনও অক্ষত ও সুসংস্কৃত অবস্থায় আছে।

পাড়ার মাঝখানে রাধাকান্তজীর আটচালা মন্দির। গোস্বামী-মালিপাড়াকে মন্দিরময় মালিপাড়া বললেই বোধ হয় শোভন হয়। বহু মন্দিরের মধ্যে রাধাকান্তজী ও মদনগোপাল মন্দির বৃহত্তম আকার, আয়তন ও গঠনশৈলীতে হুবহু একরকম। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মধ্যে সামঞ্জস্য, প্রথম তলের চারচালা ও দ্বিতীয় চারচালার মধ্যে উপযুক্ত সমতা এবং চালের বক্ররেখার কমনীয়তা প্রশংসার দাবী রাখে। দ্বিতীয় চারচালার উপরে কলস ও পতাকাদণ্ড। সব নিয়ে এই দুটি মন্দিরের আকৃতি ও গঠনে এমন একটা গাম্ভীর্য আছে যে ভক্তদের মনে সহজে ভক্তি আকর্ষণ করে। মন্দিরের সামনে সুন্দর প্রশস্ত নাটমন্দির ও ভক্তদের বাসের জন্য সেবাকুঞ্জের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের পাশে একটি দক্ষিণমুখী বেদী, পাশে কনকচাঁপার গাছ। ঐ বেদীতে উৎসবের দিন রাধাকান্তজীর বিগ্রহ এনে রাখা হয়। ভক্তেরা দর্শন লাভ করে সার্থক হয়।

রাধাকান্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—রঘুনাথ আচার্যের কনিষ্ঠতম পুত্র কৃষ্ণদাস গোস্বামী। ইনি পিতামহ ভগবান আচার্যের মতই বৈষয়িক ব্যাপারে ছিলেন অনাসক্ত। ইতি বৃন্দাবন পরিক্রমাকালে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনকুঞ্জে কিছুদিন বাস করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণদাস গোস্বামীর জ্ঞান, ভক্তি দেখে ও ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভাগবতানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন :

"পূর্বেতে শ্রীকৃষ্ণ নাম আছিল বিখ্যাত
তাহার পাঠ শুনি প্রভুর হইলা মহাপ্রীত।
দেখি গৌরভক্তগনের হইলা আনন্দ
সবে নাম রাখিলেন ভাগবতানন্দ।"

—( জগদীশ চরিত )

এই রাধাকান্ত বিগ্রহ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুনঘাটে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতাপের রাজধানী মোগলদের হাতে ধ্বংস হওয়ার সময় প্রতাপাদিত্যের এক আত্মীয় শ্যামরায় গোপনে ঐ বিগ্রহ পোলবা গ্রামে নিয়ে আসেন। শ্যামরায় ছিলেন ভাগবতানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্যামরায় জমিদারী ও বিভিন্ন মহলের কাজে সবসময়ে ব্যস্ত থাকেন, রাধাকান্তের উপযুক্ত নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা না হওয়ার জন্য শ্যামরায় মানসিক অশান্তিগ্রস্থ ছিলেন। এমন সময় শিষ্যগৃহে ভাগবতানন্দ গোস্বামী এসে বললেন, 'রাধাকান্ত তোর কাছে আসতে স্বপ্নাদেশ করলেন। তুই নাকি তাকে অভুক্ত রেখেছিস ?'

কথা শুনে শ্যামরায়ের দু' চোখ দিয়ে ভক্তি-অশ্রু পড়তে লাগল, 'রাধাকান্ত, তুমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিলে !'

মালিপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হোল রাধাকান্তের মন্দির। ভাগবতানন্দ শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা ও ভোগরাগাদিতে পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা। জনৈক বড়াল ব্রাহ্মণ ( বটব্যাল ) তাঁর একমাত্র কন্যাকে নিয়ে রাধাকান্তকে দর্শন করতে আসেন। এই

সময় কীর্তন শুনতে শুনতে সুস্থ কন্যার আকস্মিক মৃত্যু হয়। কন্যার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন এবং উপস্থিত সকলেই এই দুর্ঘটনায় মর্মাহত হন। এমন সময় ভাগবতানন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, 'ব্রাহ্মণ কন্যা আমার প্রাঙ্গনে জড়দেহ ত্যাগ করে আমার প্রিয়াজী হয়েছে; ব্রাহ্মণকে শোক ত্যাগ করতে বল।' বড়াল-ব্রাহ্মণ এই আদেশ শুনে নিজ কন্যার এক অষ্টধাতু মূর্তি গড়ে কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে দেন। রাধাকান্তজীর ইচ্ছা অনুসারে ঐ মূর্তি রাধাকান্তের বামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও ঐ মূর্তি বড়ালের ঝি নামে রাধাকান্ত মন্দিরে রাধাকান্তের সাথে নিত্য পূজিতা হচ্ছেন। মন্দিরের পূর্বদিকে রাধাকান্তের দোলমঞ্চ। ভাগবতানন্দ প্রবর্তিত জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, ঝুলনযাত্রা, দোল উৎসব প্রভৃতি নৈমিত্তিক ভাবে এখনও অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু আগের জাঁকজমক আর নেই। ভাগবতানন্দ ৭৮ বৎসর বয়সে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে রাধাকান্তজীর মন্দির প্রাঙ্গণে সজ্ঞানে রাধাকান্ত নাম নিজ মুখে উচ্চারণ করতে করতে অপ্রকট হন। মন্দিরের পাশে তাঁর ফুল-সমাধি। কৃষ্ণদাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী থেকে সপ্তাহব্যাপী মহোৎসব, লীলাকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

একটু পশ্চিম দিকে পথের পাশেই রঘুনাথ আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথ গোস্বামীর বাস্তুভিটা। ঐ বাস্তুভিটা সংলগ্ন রয়েছে শ্রীশ্রীবল্লভীচাঁদের বর্তমান মন্দির। রাধাকান্ত মন্দিরের অনুকরণে তৈরী হলেও আকার, আয়তন ও শিল্পের দিক থেকে নিম্নমানের। মন্দির দক্ষিণমুখী, সামনে টিনের চালযুক্ত নাটমন্দির। এই মন্দির নির্মাণ করেন গোপীকান্ত গোস্বামীর এক অধস্তন পুরুষ। মন্দিরে রয়েছে ভগবান আচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রিয়াজীসহ শ্রীকেশব বিগ্রহ ও গোপীনাথ গোস্বামীর আরাধ্য বল্লভীচাঁদের যুগল বিগ্রহ। গোপীকান্ত গোস্বামী বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে (অক্ষয় তৃতীয়া)

অপ্রকট হন। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ায় এই মন্দিরে তিনদিন ব্যাপী কীর্তন মহোৎসব হয়।

পূর্বপাড়ায় মদনমোহনজীউর মন্দির। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মন্দির শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীসহ মদমোহনের সেবা প্রকাশ করেন কৃষ্ণকিংকর গোস্বামী। পশ্চিম পাড়ায় রয়েছে বিশালাক্ষী মন্দির ও আচার্য-পাড়ায় গোপীনাথজীউর মন্দির। গোপীনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রঘুনাথ আচার্যের চতুর্থ পুত্র শ্যামদাস গোস্বামী। শ্যামদাস ছিলেন মহাভাগবত পুরুষ। ইতি যৌবনেই শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেছিলেন। কেশী ঘাটের কাছে এক জীর্ণ মন্দিরে এক অতি বৃদ্ধা ব্রজবাসিনী শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের সেবাকার্য করতেন। ঐ বৃদ্ধা নিজ অন্তিম কালে বিগ্রহসেবার কথা চিন্তা করে এবং ব্রজবাসিদের আগ্রহে রাধাগোপীনাথকে শ্যামদাসের হাতে অর্পণ করেন। শ্যামদাস রাধা-গোপীনাথ বিগ্রহসহ স্বদেশে ফিরে আসেন ও অভিষেকাদি কার্যান্তে বিগ্রহের সেবা পূজায় ব্রতী হন। রামনবমীর দোল, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও রাস-উৎসব শ্যামদাস খুব আড়ম্বরের সাথে অনুষ্ঠান ক'রতেন। বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গোপীনাথের মোহন মুরতি দর্শন করতে করতে তারই লীলা স্মরণ পূর্বক শ্যামদাস নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্যামদাসের পুত্র গৌরাঙ্গ চরণ গোস্বামীও ছিলেন পরম ভক্ত। তিনি সহোদর ব্রজমোহনসহ নিকটবর্তী হারিট গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ও শ্রীমন্দির নির্মাণ ক'রে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউর নূতন ভাবে সেবা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ মন্দিরে শ্যামদাস গোস্বামীর পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রামও পূজিত হন। শ্যামদাস গোস্বামী মহাশয়ের তিরোভাব তিথি-মহোৎসব বর্তমানে আর মালিপাড়ায় হয় না। ঐ উৎসব হয় হারিট গ্রামে দিবসত্রয় লীলা কীর্তন ও মহোৎসব।

গোস্বামী-মালিপাড়ার বিখ্যাত মন্দির মদনগোপালের। আমরা বাড়ী থেকে স্থির করে বেরিয়েছিলাম উক্ত মন্দিরের বল্লভ গোস্বামীর

তিথি-মহোৎসব দেখব। মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমন্দিরে হাজার খানেক লোকের বসবার মত জায়গা আছে। নাটমন্দিরের তিনদিকে ঘোরান দোতলা ব্যালকনি। ব্যালকনির নিচে দূর দেশাগত যাত্রী ও ভক্তবৃন্দের থাকবার জন্য কয়েকখানি বৈষ্ণব বাস্তুঘর। মন্দিরের গর্ভগৃহে রাধাবল্লভ ও মদনগোপাল দুইটি যুগল বিগ্রহ, বংশীবদন শালগ্রাম ও বুড়িমাই প্রতিষ্ঠিত। রাধাবল্লভ কষ্টিপাথরে গড়া মূর্তি, মদনগোপাল (নিম কাঠের) দারুমূর্তি হলেও শ্বেতপাথরে গড়া মূর্তিও সচরাচর এত নয়নাভিরাম হয়না। রাধাবল্লভের প্রিয়াজী ও মদনগোপালের রাধারাণী বিগ্রহ অষ্টধাতু নির্মিত। বুড়িমাই ঘটের উপর আঁকা দক্ষিণা কালিকার মস্তকের অংশ। গোস্বামী মালিপাড়ার ভগবান আচার্য বংশীয় গোস্বামীরা কান্যকুব্জাগত কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ থেকে একাদশ অধস্তন পুরুষ শ্রীকরের সন্তান বলে নিজেদের পরিচয় দেন। শ্রীকর ছিলেন কালীসাধক সিদ্ধপুরুষ। শ্রীকরের সন্তানেরা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব যে কোন মতাবলম্বী হোন না কেন, এবং যে যেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন সেখানেই তাঁরা বুড়িমার প্রতিষ্ঠিত ঘট শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করেন।

মদনগোপালের আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে রঘুনাথ আচার্যের পৌত্র শ্রীবল্লভ গোস্বামী। প্রতিষ্ঠার সময় মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছিল রাধাবল্লভ মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় রাধাবল্লভ জীউর। অল্পদিন পরে ৺মধুসূদন ঘটক মহাশয়ের শিষ্য মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মচারী মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীমদনগোপালের বিগ্রহসহ গুরুগৃহে আসেন। অলৌকিকভাবে আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মচারী মহাশয় ঐ বিগ্রহ বল্লভ গোস্বামীকে অর্পণ করেন। গোস্বামী মহাশয় আনন্দের সাথে বিগ্রহ গ্রহণ করে যথাবিধি সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। প্রবাদ, শ্রীশ্রীমদন-গোপালজীউর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়। গোস্বামী মহাশয় শ্রীরাধারাণী বিগ্রহ নির্মাণ করান ও মদনগোপালসহ রাধারাণীকে

রাধাবল্লভ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি দুই যুগলমূর্তি একই মন্দিরে বিরাজ করছে। কালে কালে সিদ্ধপুরুষের প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপালের নামই অধিক প্রচারিত হোল। বল্লভ গোস্বামী ৯২ বৎসর বয়সে চৈত্র শুক্লা একাদশী তিথিতে অপ্রকট হন। এখনও প্রতি বৎসর মদনগোপাল মন্দিরে চৈত্র শুক্লা একাদশী থেকে সপ্তাহ ব্যাপী লীলাকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ও পঞ্চাশ প্রহর নামযজ্ঞ হয়। অবিরাম মৃদঙ্গ ধ্বনিতে মালিপাড়া থাকে মুখরিত।

এ ছাড়া জন্মাষ্টমী, ঝুলন যাত্রা ও পঞ্চম দোল উপলক্ষেও মন্দিরে বিশেষ পূজা, আরতি ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হয়। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে শ্রীবিগ্রহগুলি মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনের বারান্দায় আনা হয়। প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যাহ্নের ভোগারতির সময় পর্যন্ত শ্রী বিগ্রহ মন্দিরের পাশের চাঁপাগাছতলার বেদীতে এনে রাখা হয় যেখানে ভক্তেরা দর্শন করেন। মন্দিরে প্রায় তিনশ বছরের পুরান একটি পালকি আছে, এই পালকিতে ক'রে যুগলমূর্তি দোলের সময় দোলমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীবল্লভ গোস্বামীর পর থেকে এখন পর্যন্ত অধস্তন দশ পুরুষ হয়েছে। এবং সেবাইতরা বহু পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সেবাইতমের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দিন পালা পড়ে। যার পালা তিনিই সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন যদিও একজন নির্দিষ্ট পুরোহিত আছেন। কোন কোন সরিকের বংশ লোপ হওয়ায় পালা অবিলি হয়ে আছে। বর্তমানে এই সব অবিলি পালার দিন সেবা-পূজার জন্য সেবাইতদের মধ্য থেকে একটি বোর্ড করে তাঁরা একটি সাধারণ স্টেট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। সেই ফাণ্ডের আয় থেকে অবিলি পালার সেবার ব্যবস্থা হয়।

মদনগোপাল মন্দিরের বাইরে বল্লভ গোস্বামী ও আরও দুজন গোস্বামী প্রভুর পুষ্প সমাধি রয়েছে।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে নূতন রাস্তার ধারে হাটতলা। ছোট বড় কয়েকটা দোকান আছে, রয়েছে সরকারী ডাক্তারখানা, পাঠাগার ও

উচ্চ বিদ্যালয়। কয়েকমাস আগে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সুরু হয়েছে এবং বহু বাড়ীতে ইতিমধ্যে বিজলী বাতি জ্বলতে আরম্ভ করেছে। পূর্বদিন এখানে আসবার সময় পথে মেঘনাদ নামে এই গ্রামেরই একটি চাষীর সাথে কথা বলতে বলতে আমরা গ্রামে ঢুকেছিলাম। মেঘনাদ বলেছিল, 'সত্যিই বাবু এক সময় এই গ্রামের সার্থক নাম ছিল গোঁসাই-মালিপাড়া, এখন বলতে ইচ্ছে করে কশাই-মালিপাড়া। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত এই গ্রামের ধনী ও বর্ধিষ্ণু লোক বলতে গোঁসাই-ঠাকুরদের বোঝাত। চাষের জমি-জমার বেশীর ভাগ ছিল তাঁদের। গোঁসাই-ঠাকুররাও বিগ্রহের সেবা আর দরিদ্র-নারায়ণকে হু'মুঠো ভাত দিয়ে আনন্দ পেতেন। তখন এক-এক মন্দিরে সাত-সাত দিন করে মচ্ছোব লেগে থাকত আর গ্রামের চাষাভুষোর দল ঐ সাতটা দিন সেই মন্দিরে পেটপুরে ভালমন্দ খেতে পেত। এই গ্রামের চার পাশের মাঠের ফলনও হোত ভাল। গোঁসাই-মালিপাড়ার মাঠে যেন মা-লক্ষ্মী হেঁটে নামতেন। আমাদের মত জমিহীন চাষী বা গরিব মানুষ যাদের মাত্র এক-আধ বিঘে ভুঁই আছে তারা গোঁসাইদের জমি ভাগে চাষ করতাম। পাঁচ বিঘে জমি ভাগে পেলেই ভাগের ভাগ আড়াই বিঘের ফসল ঘরে উঠত। আর এতগুলো মন্দির বারো মাসে তের পাব্বন লেগেই থাকত। মাসে তিন চারটে দিন মচ্ছোবের পেসাদ বাড়িশুদ্ধ খেয়ে সুঃখ দুঃখে দিনগুলো কেটে যেত। রাস্তাঘাট ভাল ছিল না গ্রামে আসবার। সেই দ্বারবাসিনী থেকে একটা সুড়ি মেটে রাস্তা। গোঁসাই-ঠাকুরদের দেশ-বিদেশের অনেক বড়লোক শিষ্য আসত মন্দিরের উৎসবের সময় মা-ঠাকুরোনদের নিয়ে। তাদের পাল্কী বয়ে, ফাই-ফরমাস খেটে দুটো পয়সা দুখান পুরোন কাপড়ও জুটে যেত, তখন গাঁয়ের মাথায় ছিলেন গোঁসাইরা আর তোমাদের পায়ের তলায় সুঃখে দুঃখে ভালই ছিলাম আমরা গরীব কিষেন মালীরা।

গেরামে বন্দে মাতরম্ হোল। শুনলাম দেশ স্বাধীন হোল।

কিন্তু কি দিন যে এল বাবু! চাষের জমিনগুলো গোঁসাইদের হাত থেকে একটু একটু ক'রে চলে গেল বেলাক্‌ করা উঠতি টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীদের ও সহরের ঘুষ খাওয়া চাকুরে বাবুদের হাতে। নোতুন আইনের নামে এই সব লোকেরা আগের মত জমি ভাগে দেন না। আসলে ভাগ চাষ কিন্তু আমাদের দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নেন, 'মজুরীর টাকা পেলাম।' ধান কেটে বাবুদের খামারে তুলতে হবে ঝেড়ে-পুছে ভাগবাবুর ঘরে তুলে দিয়ে যেটুকু পাওয়া যায়। ঐ যে দেখছেন—' বলে সে দেখিয়ে দিল পাঁচিল-ঘেরা তালা-দেওয়া একটা খামার বাড়ী। 'বাবুদের মাঝে একতা আছে। এই রকম এক-একটা খামার করে দুই-তিন বাবু নিজেদের ধান তুলে বেলাকে বেচে টাকাটি পকেটে করে সহরে চলে যান। এর উপর আবার খাদ কেটে বালি ওঠা সুরু হবার সাথে সাথে এসে জুটেছে মাড়োয়ারী বাবুরা। এই বাবুরা এদিকে নিরামিষ খান, কিন্তু গরীবের রক্ত চোষার যম। তাঁরা বেশী দামে চাষের জমি কিনে খাদ কেটে বালি বেচে লাখ টাকা কামাচ্ছেন। গ্রামের মানুষের মুখের অন্নটুকু চলে গেছে। গভর্ণ-মেণ্টেরও ভাল আইন। সহরে যেখানে লোকের কামাই বেশী তাদের জন্য সস্তায় রেশনে চাল দেন, গ্রামের লোক গরীব, তাদের জন্য ৩৷৹ টাকা কেজি খোলা বাজার।'

সে বলছিল, মন্দিরে মন্দিরে হিসেব মত তিথি-নক্ষত্র দেখে এখনও পূজো কীর্তন হয় কিন্তু মচ্ছোবের খিচুড়ীর নামে ঢুনঢুনি। যেখানে মণ-মণ চাল ডালের ভোগ হ'ত সেখান থেকে নেমেছিল কেজির মাপে, গেলবছর থেকে আরম্ভ হয়েছে গেরামের মাপে। পুরুত ঠাকুরের কপালেই রোজ ভোগ জোটে কিনা মদনগোপালই জানেন। এই গ্রামে আগে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের উৎসব নিয়ে সব মিলিয়ে বছরে ১০৮ দিন মচ্ছোবের পেসাদ খেয়েছি, এখনও ১০৮ দিন খোলের আওয়াজ হয়ত কানে আসে, কিন্তু খিচুড়ির হাঁড়ি একটা দিনও আর দেখা যায় না।'

মেঘনাদ তার দুঃখের কথা অসমাপ্ত রেখেই আমাদের মদন-

গোপালের মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। না দিলেও অসুবিধা হ'ত না। দূরে সদর রাস্তা থেকেই কানে আসছিল মদনগোপাল মন্দিরের মৃদঙ্গের আওয়াজ।

আমরা ভাগ্যবান। আমাদের কপালে জুটেছিল মহোৎসবের প্রসাদ। চালের অভাব হলেও এখনও মদনগোপাল মন্দিরে চৈত্র মাসের মহোৎসবের দিন উপস্থিত প্রায় পাঁচশ ভক্ত ও দূরাগত যাত্রী প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রাত্রিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম মন্দিরের বৈষ্ণব বাস্তুতে (যাত্রী ও ভক্তদের বিশ্রাম গৃহে)।

## দুই

**খানাকুল কৃষ্ণনগর**

বৈষ্ণবীদ্বয় ও দুজন প্রৌঢ় ভক্তের সাথে আমরাও গোস্বামী-মালীপাড়ার মদনগোপাল মন্দির থেকে ফেরার পথ ধরলাম। দু' মাইল হেঁটে এসে সিনেটের কাছে বাস ধরতে হবে। চৈত্র মাসের ভোরবেলা ফুর ফুরে মেঠো হাওয়া। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। প্রৌঢ় গোঁসাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা তোমরা এখন কোথায় যাবে?'

নলিনীদা জবাব দিলেন, 'হাতে দু'দিন ছুটি আছে, যাই তো বাসের মোড় পর্যন্ত, তারপর যেদিকে মন চায় ঘুরে বাড়ী ফিরব।'

'অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠ দর্শন করেছেন? না দেখে থাকলে চলুন আমরা যাচ্ছি, এক সাথে যাওয়া যাবে।' বললেন গোঁসাইজী।

রাজী হয়ে গেলাম।

সিনেট থেকে বাসে তারকেশ্বর। এখানে বাস বদল করে আমাদের উঠতে হবে খানাকুলগামী বাসে। একটি চায়ের দোকানের সামনে বসে মুড়ি ফুলুরি যোগে আমরা চারজন জলযোগ সেরে নিচ্ছি।

বৈষ্ণবীরা দু'জন চুপ করে বসে আছেন, গোপাল-দর্শনের আগে ওরা জলগ্রহণ করবেন না।

মুণ্ডেশ্বরীর উপর রামমোহন সেতু তৈরী হবার পর যোগাযোগ ক্ষেত্রে তারকেশ্বরের নূতন মর্যাদা বেড়েছে। কলকাতা থেকে এখন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আরামবাগ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা তারকেশ্বর হয়ে। রেল ষ্টেশনের পাশের বস্তি এলাকা ভেঙ্গে প্রশস্ত পথ তৈরী হচ্ছে। ১৯৫৭ সালে তারকেশ্বর পৌরসভা গড়ার পর সহর হিসাবে তারকেশ্বরের মর্যাদা বেড়েছে। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের যুগ, সিনেমায় তারকেশ্বর চিত্রনাট্য হবার পর দেবতারও যেন মাহাত্ম্য বেড়েছে। বেড়েছে ভীড়। চৈত্র ও শ্রাবণে ভীড় সীমা ছাড়িয়ে যায়।

নলিনীদার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যাত্রাপথে বাবা তারকনাথকে দর্শন করে যাবেন। চায়ের দোকানে বসে শুনলাম চৈত্র মাস শেষ-রাত থেকে মন্দিরের দরজায় হাজার হাজার লোকের লাইন পড়েছে, ৩।৪ ঘণ্টার কম মন্দিরে ঢুকে দর্শন করা সম্ভব হবেনা। মনের ইচ্ছা মনেই রেখে আমরা বাসে উঠলাম। বাসে বসে গোঁসাইঠাকুর বলতে থাকলেন বৈষ্ণব দর্শনের কথা। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই হচ্ছে চতুর্বর্গ বা লৌকিক মানবের চার পুরুষার্থ বা কাম্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মোক্ষ লাভের চেয়েও কাম্য মনে করেন কৃষ্ণ প্রেম বা বৈষ্ণব জগতের পঞ্চম পুরুষার্থ।

"পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন,
কৃষ্ণের মাধুর্যরস করায় আস্বাদন।
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ,
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবা সুখরস।"

প্রকৃত বৈষ্ণব তাই মোক্ষ লাভ করতে চায় না, তার পরম ও চরম কাম্য কৃষ্ণ-সেবা করবার অধিকার লাভ। সে চায়, বার বার এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করতে। জন্মে যেন কৃষ্ণ সেবা করতে পারে।

আত্মতৃপ্তি যাতে হয় নাম তার কাম, সেই কাম লালসা যেন তাকে আকর্ষণ না করে। কৃষ্ণপ্রীতে যেই কর্ম তাহা শুদ্ধ প্রেম। যেন শুদ্ধা কৃষ্ণপ্রীতিতে কাজ ক'রে যেতে পারে।' গোঁসাইজী বলে চললেন, 'দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে নবদ্বীপে শ্রীশ্রীচৈতন্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন।'

"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইলা নিতাই।"

"ব্রজেন্দ্র নন্দনের চার ভাবের পরিকর ছিলেন। দাস্য, সখ্য, (শান্ত) বাৎসল্য ও মধুর। নদীয়া লীলায়ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব জন্মের কোন কোন পরিকর নদীয়ার আশে পাশে জন্ম নেন এবং পূর্ব জন্মের ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ সেবা করেন। নদীয়া লীলায় শ্রীচৈতন্যের যে বারজন পরিকর ব্রজের গোপ বা গোপালক সখার ভাবে ভাবিত হয়ে রাগানুগামার্গে ভজন করে লীলা-বিলাসী মহাপ্রভুর সঙ্গ ও সেবাধিকার পেয়েছিলেন, তাঁরাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত। খানাকুল-কৃষ্ণনগরে এই দ্বাদশ গোপালের একতম শ্রীশ্রীঅভিরাম গোস্বামী বা রামদাস অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাঠ। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন শ্রীদাম সখা। অভিরাম ঠাকুর খানাকুল-কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্বদা সখ্য প্রেমের আবেশে উন্মত্ত থাকতেন। শোনা যায়, একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে অভিরাম প্রেমরসে মত্ত হয়ে বাঁশী বাজাবার জন্য একটা বিরাট গাছের গুড়ি (যেটা উঁচু করে নিয়ে যেতে অন্ততঃ ১৬টি বাঁশের সাঙ্ বা ঝুলায় ৩২ জন লোক লাগে) অনায়াসে তুলে বাঁশীর মত মুখে ধরেন।

"রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেম রাশি,
যোল সাঙের কাষ্ঠ লইয়া যে করিল বাঁশী।"

আমাদের বাস যখন খানাকুল পৌঁছাল তখন বেলা প্রায় দশটা। খানাকুল হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিমতর প্রান্তে। মেদিনীপুর

জেলার মহকুমা সহর ঘাটাল এখান থেকে মাত্র আট মাইল। কলকাতা থেকে আসতে গেলে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের পাঁশকুড়া স্টেশনে নেমে বাসে ঘাটাল আসাই সহজতম পথ।

খানাকুলের বাজার দেখলাম বেশ বড়। শুনলাম, একসময়ে নাকি খানাকুলের হাট ছিল আরামবাগ মহকুমার বৃহত্তম হাট। তখন এখান থেকে পেতলের বাসন, কাপড়, রেশমী-শাড়ী, চাল প্রভৃতি কিনে পাইকারী ব্যবসায়ীরা হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিত। খানাকুলে বহু প্রাচীনকাল থেকে অনেকগুলি বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারের বাস। স্থানীয় জমিদার বংশীধর রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় খানাকুলে পৃথক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। নারায়ণ ঠাকুর স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের বহু মতের বিরোধিতা করেন ও অনেকগুলি সূত্রকে ভুল বলে বর্ণনা করেন। ঐ সমস্ত ভুল সংশোধন করে ও কতকগুলি মত পরিবর্তন করে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'স্মৃতিসর্বস্ব' নামে নূতন স্মৃতিশাস্ত্র সংকলন করেন। প্রায় তিনশ গ্রাম নিয়ে ছিল খানাকুল সমাজ, এঁরা এখনও রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র মানেন না। শ্রাদ্ধাদি কাজে এঁরা বাড়ুজ্যের স্মৃতি মেনে চলেন। খানাকুল সংলগ্ন গ্রাম কৃষ্ণনগর। নদীয়া জেলার সদর সহর কৃষ্ণনগরের সঙ্গে পার্থক্য বোঝানোর জন্য এখানকার নাম খানাকুল-কৃষ্ণনগর।

আমরা প্রথমেই অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাটের দিকে যাচ্ছিলাম। স্থানীয় এক বৃদ্ধ আগে আমাদের ঘণ্টেশ্বর মন্দির দর্শন করতে বললেন। কাশীধামে যেমন আগে বিশ্বনাথ দর্শন করে তারপর অন্যান্য মন্দির দর্শন করা লোকাচার, তেমনি খানাকুলকে স্থানীয় লোকে বলে গুপ্তকাশী এবং ঘণ্টেশ্বরকে গুপ্তকাশীর অধিপতি "গুপ্ত-কাশীধামপতি ভজ ঘণ্টেশ্বরম্"। স্থানীয় লোকাচারও আগে ঘণ্টেশ্বর দর্শন করে পরে অন্যান্য দেবমন্দির দর্শন করা।

ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে রত্নাকর নদ বলয়াকারে

কয়েকটি মন্দির শোভিত একটি দেবভূমিকে ঘিরে রেখেছে বলে ঘণ্টেশ্বর মন্দির এলাকাটার প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। আগে রত্নেশ্বর নদী খুব বেগবতী ছিল। কিম্বদন্তী, পঞ্চদশ শতকে অভিরাম গোস্বামীর কৌপীন ভেসে যাওয়ায়, গোস্বামীজী অভিশাপ দেন। তাঁরই অভিশাপে রত্নাকরের বেগ কমে যায় এবং নদীটি কাশ-রত্নাকর নামে খ্যাত হয়। প্রাচীন মন্দিরমালায় শোভিত দেবভূমিতে শ্মশানকালী, বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠীঠাকুরাণী, ধর্মঠাকুর, ক্ষুদিরাম গৌরনিতাই প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মন্দির থাকায় স্থানটিকে সত্যই কাশীধাম বলে মনে হয়।

ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরটির আকৃতিও একটু অদ্ভুত ধরনের। বর্গাকার আসনের উপর চারকোণা ঘরের মত বাঢ় অংশ, তার উপর গণ্ডী, মন্দিরের বেঁকি ও আমলক নেই, বাহাপগের উপরই কলস ও পতকা দণ্ড। সামনে জগমোহনের বদলে একটি চৌচালা বসিয়ে মন্দিরের জগমোহনের অভাব যেমন দূর হয়েছে, সামগ্রিক সৌন্দর্য তেমনি অনেক বেড়ে গেছে। মন্দিরের সামনে বিশাল নাটমন্দির ও নহবৎ-খানা ও বাঁ দিকে সারি সারি অন্যান্য দেবমন্দির দেখে নলিনীদা মন্তব্য করলেন, 'ঘণ্টেশ্বর অনাসক্ত শিব ঠাকুর হলে কি হয়, নিজের আবাসস্থলটি একটা ওয়েল প্ল্যাণ্ড ফোর্ট বিশেষ তৈরী করে রেখেছেন।'

ঘণ্টেশ্বরের বর্তমান মন্দির শ্রীমদ্ বটুক বাবাজীর নির্দেশে উবিদ-পুরের মটুক কারক নামে এক মিস্ত্রি তৈরী করতে আরম্ভ করেন পুরান মন্দিরের ভিত্তিভূমির উপর। মন্দির অর্ধনির্মিত অবস্থায় তিনি মারা গেলে কানাইলাল দে মন্দির নির্মাণ শেষ করেন। নির্মাণ কাল অষ্টাদশ শতকের কোনো সময়। প্রতিষ্ঠার কোন লিপি মন্দিরের গায়ে নেই। নির্মাণকাল নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন সময়ের উল্লেখ করলেন। তবে মন্দিরের ভিত্তিভূমি দেখে বোঝা যায়, চৈতন্য পূর্ব যুগে ঐখানেই ছিল আদি প্রাচীন মন্দির। ঘণ্টেশ্বরে এক সময়ে শৈব

সাধকদের সাধন পীঠ ছিল। কিম্বদন্তী, প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে তৎকালীন ঘণ্টেশ্বরের সেবাইত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাঘ মাসের এক অকাল বন্যার সময় রত্নাকর নদীর জলে কালভৈরবের প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার করেন ও ঘণ্টেশ্বরের পাশে স্থাপন করেন। সেই থেকে মাঘ মাসের একাদশীতে ( ভৈমী একাদশী ) এখানে একটি বড় মেলা হয়। স্থানীয় বহুলোক দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্যলাভের আশায় এখানে আসেন ও স্বপ্নাদ্য ঔষধ নিয়ে যান।

মন্দিরের পাশে নদীর ধারে পাশাপাশি দুটি শ্মশান, একটি ব্রাহ্মণদের জন্য, অন্যটি অব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট। একই জায়গায় দুটি শ্মশান তার উপর আবার তাতে জাতিভেদ—এই সব নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে শুনে নবীনা বৈষ্ণবী বেশ উষ্মা প্রকাশ করে বললে, 'চলুন তো আমরা গোপীনাথ দর্শন করতে যাই। মরার পরেও এরা জাত ধুয়ে খাবে! চেয়ে দেখি, একে অভুক্ত তার উপর দীর্ঘ পথ-চলার ক্লান্তিতে বেচারীর মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথজীর মন্দিরের দিকে। দূর থেকেই চোখে পড়ল পাশাপাশি দুটি মন্দির, একটি নবরত্ন অন্যটি রেখ দেউল বলা যায়। শুনলাম অভিরাম গোস্বামী, মহাপ্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, একে চৈতন্য-দেব নাম-প্রেম প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গৌড়ে চলে আসতে আদেশ করেন। মহাপ্রভুর কাছ থেকে ফিরে এসে অভিরাম দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন ও বাঙলাদেশের বহুস্থানে বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করে বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচার করেন। অভিরাম তাঁর জীবনসায়াহ্নে এসে খানাকুলে একটি চালাঘরে উপাস্য বিগ্রহ গোপীনাথজীকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে নবরত্ন মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরের ভিত্তি বেদী প্রায় ছয় ফুট উঁচু, চালের বক্রগতি ও মূল শিখরের আসন এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মন্দিরটি দর্শকের মন মুগ্ধ ক'রবেই। মন্দিরটি প্রায় ষাট ফুট উঁচু। সামনের প্রবেশ পথে

তিনটি খিলান। খিলানের স্তম্ভের উপরও দু'পাশে লতা, পাতা, ফুল ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা। মন্দিরের কিছুটা ভেঙে যাবার জন্য বর্তমানে পরিত্যক্ত। পাশেই চেতুয়া, মন্দারণ, খানাকুল প্রভৃতি এলাকার ধীবরমণ্ডলী নির্মিত সত্তর ফুট উঁচু-মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এই রেখ দেউল মন্দিরটি তৈরী হয় বাংলা ১২১৯ সালে। মন্দিরটি একটু বেশী ঢেঙা ধরণের, মাথায় কোন বেঁকি বা আমলক নেই। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত বিরাট নাটমন্দির। গোপীনাথ কালো কষ্টিপাথরে খোদিত বিগ্রহ। এমন সুন্দর নয়নাভিরাম বিগ্রহ সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা অপলক নয়নে অনেকক্ষণ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মন্দিরের মধ্যে গোপীনাথজীর বিগ্রহ ছাড়াও বলরাম, মদনমোহন, গোপাল ও অভিরাম গোস্বামীর মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। অদূরে গোপীনাথের রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চটি সুন্দর। রাসের সময় শ্রীবিগ্রহ রাসমঞ্চে এনে রাখা হয়। ঐ উপলক্ষে একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত মেলা বসে। মন্দিরে নিয়মিত পূজা ভোগরাগ ও উৎসবাদির সুব্যবস্থা আছে। আগে জানালে মন্দিরে ভোগের প্রসাদ পাওয়া যায়।

বাজারের কাছে পাইস হোটেল আছে। আমরা প্রথমে মনস্থ করেছিলাম সেখানেই আহারাদি সারব। সঙ্গের বৈষ্ণবীরা হোটেলে খাওয়ার চেয়ে চিড়ে মুড়ি দিয়ে ফলাহার করে একবেলা কাটিয়ে দেওয়া ভাল মনে করায় আমরা নিকটের একটা দোকান থেকে চিড়ে, গুড় ও দৈ কিনে এনে নাটমন্দিরের এক পাশে খেতে বসবার আয়োজন করছি। মন্দিরের একজন সেবাইত এসে আমাদের ডেকে মন্দিরের পাশে বৈষ্ণব বাস্তুর একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর খুলে দিলেন। জল আনবার জন্য একটি বালতি ও কয়েকখানা কলার পাতা এনে দিয়ে মন্দিরের পাশের টিউবওয়েলটি দেখিয়ে দিলেন। দু-তিন মিনিট পর তিনি কতকগুলি কাটা আম, চিনি ও বাতাসা এনে বললেন, ঠাকুরের বাল্যভোগের প্রসাদ। আমরা আগে জানাইনি,

এখন আর আমাদের ভোগের প্রসাদ দিতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশও করলেন। বৈষ্ণব জনোচিত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলেন ঐ দিনটি ওখানে থেকে রাত্রির প্রসাদ পেয়ে পরদিন ফিরতে। অভিরামের শিষ্যের বংশধরেরা আজও এই দুর্দিনে যেভাবে বৈষ্ণব-সেবার চেষ্টা করছেন দেখে মুগ্ধ হ'লাম।

দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা দুজন মাত্র মাইল দেড়েক দূরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটা দেখতে যাব মনস্থ ক'রে বেরুতে যাচ্ছি, বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা কোথায় চললেন?'

'রামমোহন রায়ের জন্মভূমি, রাধানগর।'

কথাটা উচ্চারণ করা মাত্রই গোঁসাইজী মন্তব্য করলেন, 'রাজার রাধানগর দেখার চেয়ে বরং চলুন ভক্তের ভগবান রাধাকান্তজীকে দেখে আসি।' বৈষ্ণবীও খানিকটা আবদারের সুরেই বলল, 'তাই চলুন দাদা, সবাই মিলে রাধাকান্তের মন্দিরটা দেখে আসি।' তার কথায় সুরে এমন একটা আবেদন ছিল যে অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সবাই মিলে এগোলাম রাধাকান্তজীর মন্দিরের দিকে।

রাজা রামমোহনের ভিটে ও স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে যাওয়া হ'ল না বলে মনটা বেশ খুঁত খুঁত করছিল কিন্তু খানাকুলের রাধাকান্তজীর একরত্ন মন্দিরটির সামনে পৌঁছে মনে হ'ল, মন্দির দেখতে আসাই সার্থক হয়েছে। মন্দিরের আয়তন যেমন বড় গঠনও সুষম এবং শিল্প কাজের দিক থেকেও অনন্যসাধারণ। সামনেটা পোড়া মাটির অলংকরণে সজ্জিত। বর্গাকার মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর চারচালা শৈলীর একরত্নটি ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে সরু হয়ে উঠে যাওয়ায় স্থাপত্য সৌন্দর্য ও লালিত্যে একচূড়া মন্দির শিল্পের এক নূতন দর্শনীয় দৃষ্টান্ত হয়েছে। মন্দিরের সামনের অঙ্গসজ্জায় বর্গাকার প্যানেলের ছয়টি থাকে বহু পৌরাণিক দৃশ্য, লতা, পাতা, ফুল ও পাখীর অনুকৃতির অলংকরণ আছে। উপরের প্রথম থাকে বাইশটি

প্যানেল তারপর দু'ধারে ছ'টি করে দু'সারি ও পাঁচটি করে তিন সারি প্যানেল আছে।

খানাকুলের প্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী বংশের কুলদেবতা রাধাকান্তজীর মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন রামনারায়ণ মুন্সী। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মথুরামোহন সর্বাধিকারী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন।

আমি ও নলিনীদা মন্দিরের বাইরের টেরাকোটার কাজগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। কানে এল মধুর কণ্ঠের ভজনের সুর। মন্দিরে ঢুকলাম। সামনে সিংহাসনে অপূর্ব সুন্দর রাধাকান্ত বিগ্রহ। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে দুই বৈষ্ণবীরা গান ধ'রেছেন। গলায় আঁচল দেওয়া, দুজনেরই চোখ দিয়ে দর দর ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ছে। বৈষ্ণবীরা গাইছেন—

"জয় রাধারমণ, রমণী মনমোহন
বৃন্দাবনে বনদেবা।
অভিনব রাস, রসিক বর নাগর
নাগরী জনকৃত সেবা।
ভজ নন্দীশ্বর পুর পুরত পটাম্বর
চন্দ্রাব চারু অবতংশ।
ভজ গোবর্ধন ধর ধরণী-সুধাকর
মুখরিত মোহন ছন্দ।
ভজ কালিয়দমন গমনজিত কুঞ্জর
কুঞ্জর জিত গতি মন্দ।
গোবিন্দ দাস হৃদি মণি মন্দিরে
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ।"

সন্ধ্যার পর অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাটে ফিরে আরতি দর্শন, রাত্রে প্রসাদ পাওয়া সেরে শোয়া মাত্র সমস্ত দিনের চলার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে দেরী হ'ল। নলিনীদার হাতের ধাক্কায় উঠলাম। দেখি, বৈষ্ণবীদ্বয় অতি ভোরে উঠে স্নানাদি সেরে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। নলিনীদাকে নবীনা বললে, 'আমরা বিষ্ণুপুরে মদনমোহন দর্শন করে নবদ্বীপ ফিরব, যদি কখনও নবদ্বীপ যান, রাধেশ্যামের বাড়ীতে দিদিমা হরি বষ্টুমীর খোঁজ ক'রবেন—' বলে প্রবীণার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করল।

'এখন চলি, বাসের সময় হোল।'

ওরা বেরিয়ে গেলেন।

আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আমাদেরও ফিরতে হবে। দীর্ঘ ফেরার পথ। দু'জনই বহুক্ষণ চুপচাপ। বুঝলাম কেবলমাত্র আমার নয়, নলিনীদার মত স্ফূর্তিবাজ লোকের মনের উপরও খানাকুল ভ্রমণ প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু কে? রাধাকান্ত? গোপীনাথ? শ্রীপাটের ভক্তদের নিষ্ঠা, নাকি বৈষ্ণবীদের ভক্তি, প্রেম, রূপ ও কোকিলনিন্দিত কণ্ঠ?

হয়ত সব কটিরই সমন্বয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নলিনীদা বললেন, 'মেজদা, এবারের বেড়ানোর কথা অনেকদিন মনে থাকবে। গোস্বামী মালিপাড়ায় গিয়ে শুনেছিলাম ওর একদিকে সিনেট, অন্যদিকে দ্বারবাসিনী কিন্তু দ্বারবাসিনী দেখা হল না। আপনার সাথে সব সময় বেরিয়ে পড়ার সুযোগ হয় না। তবুও বলে রাখি, যদি কখনও দ্বারবাসিনী যাবার সুযোগ আসে জানাবেন। হ্যাঁ, আর একটা অনুরোধ—নবদ্বীপ গেলে অতি অবশ্য আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন।'

'কেন, হরি বষ্টুমীর নাতনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে? তা নিজেই একদিন চলে যান না।'

'না। বেড়াতে গেলে একবার হয়ত রাধেশ্যামের বাড়ী গান শুনে আসা যায়। তবে মেয়েটির যেমন ভক্তি, ভাব, তার গলাটিও তেমনি মিষ্টি।'

'মুখখানিও কম মিষ্টি না।'

নলিনীদা মুখে কোন জবাব দিলেন না। একটা সলজ্জ ঈষৎ হাসি দেখেই তাঁর জবাব পেলাম।

## তিন

**দ্বারবাসিনী**

অনন্ত বিস্তৃত নদী, উত্তাল ঢেউ, পাঁচখানা নৌকা-বোঝাই লোক-লস্কর একসাথে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিম আকাশে কালো হয়ে উঠল কালবোশেখীর মেঘ। প্রথম নৌকার মাস্তুলের পাশে দাঁড়িয়ে গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহী নবীন যুবক। ক্রমবর্ধমান মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখে যুবক হাঁক দিল, 'সকল নৌকাই তাড়াতাড়ি সামনের দহে চার পাউড়ী কর।' নৌকা ভিড়ল। তাড়াহুড়া ক'রে যাত্রীদল নেমে গিয়ে আশ্রয় নিল নদীতীরের আদিবাসীদের কুটিরগুলিতে। নৌকায় থাকল দাঁড়ী মাঝিরা, ওরা ঝড়ের তাণ্ডবের মাঝে নোঙর করা নৌকাগুলি কোন মতে রক্ষা করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

আদিবাসী সর্দারের মেটে-দেওয়ালের ঘরের মধ্যে খেঁজুর পাতার পাটিতে বসে যুবক কথা বলছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক। তার মনের মধ্যেও বুঝি বাইরের প্রকৃতির মত ঝড় বয়ে চ'লেছে। সর্দার বলল, 'তুই এখানে থেকে যা রাজা, এই 'গেদ্দের' মাটির তলায় মা বসুমতীর বুকের মধ্যে লুকোনো আছে হাজারো হীরে-মুক্তো, আছে তাল-তাল সোনা। আমাদের বুড়ো ডোমপণ্ডিত বলে গেছে কোন বামুনপণ্ডিত খড়ি পেতে এর হদিস পাবে না। পাবে না এর সন্ধান কোন রাজপুত্র, ক্ষত্রিয় রাজা। তবে যদি কোন সদ্‌গোপের পো এখানে রাজ্য গড়ে, সেই হবে মালিক। মা বসুমতীর সমস্ত হীরে মুক্তোর মা বিষহরি তাকে রাজা করবে। তুই বললি তোর নাম

দ্বারপাল, তুই অমরার গড়ের সদ্‌গোপ রাজার জ্ঞাতি-কুটুম, বিধাতা যখন তোকে কালবোশেখীর গ্রহে ফেলে এনেছে আমি বলি, তুই এখানে থেকে যা।'

'কি হোল! আপনারও ভর হোল নাকি?' নলিনীদার হাতের ধাক্কায় হাজার বছর আগের এক চৈত্র-অপরাহ্ণের যে চিত্র কল্পনার নেত্রে দেখছিলাম, সেটি ভেঙ্গে গেল। ফিরে এলাম বাস্তবে।

দাঁড়িয়েছিলাম মেলার এক পাশে দ্বারবাসিনীর বিষহরি মন্দিরের পিছন দিকে একটু নিরিবিলিতে। সামনে দাঁড়িয়ে বিষহরির পূজারীর ছোট ভাই, বিশ্বনাথ গোস্বামী। একটু আগে সে বলেছিল দ্বার-বাসিনীর প্রাচীন ইতিহাস। দাঁড়িয়েছিলাম পূর্বতন পূজারী আশুতোষ গোস্বামীর সমাধি-সৌধের গায়ে ক্লান্ত দেহখানি ভর দিয়ে সৌধের দেওয়ালে।

কয়েকদিন আগে দ্বারবাসিনীর পীযূষ দাস অনুরোধ জানিয়েছিল, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীতে (নাগ পঞ্চমী) ওদের গ্রামে যেতে। ঐ দিন গ্রামের বহু প্রাচীন উৎসব বিষহরির মেলা হয়। নলিনীদাকে খবর দিলাম। খবর পেয়ে হুগলীর বনমালী মল্লিক বললেন, 'আমিও যাব, কিন্তু স্নান সেরে যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে। দ্বারবাসিনী চুঁচুড়া থেকে মাত্র বার চোদ্দ মাইল, ইংরেজ-আমলে ট্রেনে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাস্তা ঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার এমনই উন্নতি হয়েছে যে পৌঁছতে প্রাণান্ত হবে।' তিনি রসিকতা ক'রে এক লাইন ছড়া কাটলেন,

'দুয়ার হইতে অদূরে হলেও দুয়ারবাসিনী অনেক দূরে।'

বেলা এগারটায় হুগলী থেকে যাত্রা করেছিলাম। পথে যেতে যেতে বনমালীর রসিকতার অর্থ বোঝা গেল। দ্বারবাসিনী হাজার বছরের পুরানো গ্রাম, একদা সদ্‌গোপ রাজা দ্বারপালের রাজধানী ছিল। তারই নাম অনুসারে নাম দ্বারবাসিনী। বছর তিরিশেক আগে পর্যন্ত বি. পি. আর লাইট রেলের অন্যতম স্টেশন ছিল দ্বার-

বাসিনী। ব্যবসায়ে লাভ হচ্ছে না এই অজুহাতে ঐ রেলকোম্পানী তার কারবার গুটিয়ে নিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় এবং প্রকৃত কারণ হয়ত ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হচ্ছে, বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডাররা স্বাধীন ভারতে যোগাযোগ-ব্যবসায়ে টাকা খাটানো নিরাপদ বোধ না করে কারবার গুটিয়ে নিল। স্বাধীন সরকারের মেরুদণ্ডে এমন শক্তি হোল না যে জনকল্যাণের জন্য এই রেল কোম্পানীর কার্যভার অধিগ্রহণ করে বা জাতীয় রেল হিসাবে নিয়ে নেয়। তারপর গত তিরিশ বছর ধরে দ্বারবাসিনী ও আশেপাশের গ্রামের লোকেরা একটি পাকা রাস্তা ও বাসরুটের জন্য নাকি কর্তৃপক্ষের দ্বারে দ্বারে তাদের দুঃখের কাহিনী বৃথাই বলে চলেছে। মেলায় দাঁড়িয়ে গ্রামের এক বৃদ্ধকে বলেছিলাম, জেলাশাসক ও মন্ত্রী মহলের কানে কোন মতে আপনাদের যাতায়াতের অসুবিধার কথা একবার জানাতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁরা এর ব্যবস্থা করতেন। রাস্তাঘাট তৈরীতে সরকারের তো কার্পণ্য নেই, বোধ হয় আপনাদের দুঃখের কথা তাঁদের বলেন নি। বৃদ্ধ রসিক এবং বোধ হয় একটু বৈষ্ণব ভাবাপন্ন, এক ছত্র গেয়ে দিলেন,—

তিরিশ বছর শাসকের পায়ে কুটিয়াছি মাথা
মন্ত্রীর দ্বারে গিয়েছি কতো,
দয়ালু ইহারা তাইতো বধির
পাষাণ হইলে গলিয়া যেতো।'

দ্বারবাসিনী যাবার তিনটি উপায়। চুঁচুড়া থেকে ১৭নং কিংবা ১৮নং তারকেশ্বরগামী বাসে সিনেট বা সানিহাট নেমে পায়ে হাঁটা রাস্তায় ( গোস্বামী-মালিপাড়া হ'য়ে ) ছ'মাইল। এই পথের প্রথম চার মাইল পথ পাকা হয়েছে তারপর দু'মাইল কাঁচা রাস্তা। দ্বিতীয় উপায় চুঁচুড়া থেকে ২৩ নম্বর বাসে মগরা ঘুরে আলাসিন নেমে তিন মাইল হাঁটা পথ। এই পথেরও দু'মাইল পর্যন্ত অল্পদিন আগে পাকা হয়েছে, বাকী এক মাইল পথ কাঁচা। শুনলাম সিনেটের

দিকের রাস্তার দু'মাইল ও আলসিনের দিকের এক মাইল এই মোট তিন মাইল পথ পাকা হলে সিনেট থেকে আলাসিন পর্যন্ত দু'দিকের দুটি ভাল রাস্তার মধ্যে একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হোত। পীযূষবাবু জানালেন, কর্তৃপক্ষ নাকি এই প্রস্তাব গ্রহণ অনেক দিনই করেছেন কিন্তু কোন এক অজানা কারণে এই জনহিতকর কাজটি করতে হুগলী জেলার পথঘাট গড়ার কর্তৃপক্ষ ঠালবাহানা করছেন। দ্বারবাসিনী যাবার তৃতীয় উপায়, চুঁচুড়া থেকে ১৯ নম্বর বাসে রামনাথপুর নেমে সেখান থেকে একদা যেখান দিয়ে রেল যেত সেই জমির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে তিন মাইল। আমরা শেষের পথটি ধরে ৭৫ পয়সা করে বাস ভাড়া দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে রামনাথপুর পৌঁছলাম।

রামনাথপুর থেকে সোজা পশ্চিমদিকে ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে প্রায় পঁচিশ ফুট চওড়া ও ধানক্ষেত থেকে ৭।৮ ফুট উঁচু একদা রেলের পথ। তিরিশ বছর হোল রেললাইন তুলে নেওয়া হয়েছে, আজও সেই মাটির রাস্তা অত্যন্ত শক্ত ও অটুট আছে। তার উপর সামান্য মাত্র খোয়া ও পিচ দিলে যে কোন জাতীয় সড়কের চেয়ে ভাল রাস্তা হোতে পারত। এই দীর্ঘ জমি অকাজে পড়ে আছে। শুনলাম রেল উঠে যাবার পর এইটিকে গ্রামবাসীরা পথ হিসাবে ব্যবহার করত এবং বহু গরুর গাড়ী এই পথে যাতায়াত করত। কয়েক বছর আগে এই পথের উপর প্রতি ৩০০ গজ দূরে দূরে হাইটেনসন বৈদ্যুতিক তার টানার জন্য চারটি করে পোষ্ট পুঁতে রাস্তাটিতে যাতে লোকজন ও গরুর গাড়ী না যেতে পারে তার খুব সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের অনেক লোকই আজও তার উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমরাও সেই পথই ধরেছিলাম। পথে যেতে যেতে একটি গ্রাম্য লোকের সাথে, এটিকে রাস্তা কেন করা হয়নি, এবিষয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করলে তিনি মন্তব্য করেন, 'এটাতো এক রকম তৈরী পথই ছিল, একে

পাকা রাস্তা করলে লোকের উপকার হোত বটে কিন্তু কনট্রাকটার বাবুদের তো পয়সা হোতনা। তাইতে বোধ হয় ঐ খাম্বাগুলো পুঁতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে আর এখান দিয়ে রাস্তা না হতে পারে। নোতুন কোথাও দিয়ে রাস্তা হোলে জমি কেনা, মাটির কাজ, ইটের কাজ, পীচ দেওয়ায় সবাই দু'টো পয়সা পাবে। গ্রামের গরীব মানুষ পাকা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে আর সহরের বড় বড় বাবুদের কিছুই হবে না এ কেমন কথা বাবু?' লোকটির কথায় হেসে উঠলাম।

রামনাথপুর থেকে কেবলমাত্র যাত্রা সুরু করেছি কালিদাসের দূতেরা এসে জানিয়ে দিলেন, আমরা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঠিক সময়ে আসতে না পারলেও আষাঢ়স্য দ্বিতীয় দিবসে ঠিক এসে গেছি। প্রচণ্ড বর্ষণে পথের পাশের এক খড়ের ঘরের বারান্দায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। আশ্রয়দাতা আদিবাসী বাদল হাঁসদার উঠোনের খড়ের গাদাটি দেখে বোঝা গেল, তার সংসারে লক্ষ্মীর মঙ্গলময় হাতের স্পর্শ আছে। বারান্দার অন্যপাশে শিশুকুলের কাকলি বুঝিয়ে দিল, মা ষষ্ঠির কৃপাও হাঁসদার উপর কম না। ঘণ্টা দেড়েক বসে থাকার পর বর্ষণ কমল। মেটে রাস্তা বর্ষার পর তেমন কাদা না হলেও শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে চলা কঠিন। সবচেয়ে করুণ অবস্থা নলিনীদার। একে অনভ্যস্থ, কোন মতে শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে এগোচ্ছে, তার উপর বনমালীর রসিকতা ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। দাদা, ভরত-নাট্যম বা মণিপুরী নৃতম্ যা-ই দেখাও দেখিয়ে চল, কিন্তু ধরণীতল নৃত্যম্ যেন দেখিও না।' আমাদের একঘণ্টা চলার পর আমরা এসে পৌঁছলাম গ্রামের দক্ষিণতম প্রান্তে মুমূর্ষু কেদারমতী নদীর উপরের সাঁকোর কাছে। প্রাচীন বাংলার ভূগোল ঘাঁটলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে হুগলীর এই অঞ্চল দিয়ে দামোদরের শাখা প্রশাখা পূর্বমুখী হয়ে ভাগীরথী দিয়ে বয়ে যেত। ভূগোল-বিশেষজ্ঞদের মতে, তারও দু' তিন শ' বছর আগে দামোদরের প্রাচীন প্রবাহ, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে এসে দ্বারবাসিনী-মহানাদের পাশ দিয়ে গিয়ে

মগরা ঘুরে, উত্তর-পূর্বমুখী হয়ে ত্রিবেণীর উত্তরে নয়াসরাই গিয়ে ভাগীরথীতে পড়ত। নবম শতকে এই ধারা পরিবর্তন হলে কুন্তল ও কেদারমতী নদী, দামোদরের বেশীর ভাগ জল বয়ে নিয়ে যেত ভাগীরথীতে। কিম্বদন্তী, তখন কেদারমতী ছিল প্রায় চার মাইল চওড়া। নদীর একপাড়ে বিষহরি, অন্যপাড়ে সিনেটের বিশালাক্ষীর পূজা করত আদিম অধিবাসীরা। নদীর মাঝখানে ছিল বিস্তৃত দ্বীপ সদৃশ চড়া। সেই দ্বীপেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোস্বামী-মালিপাড়া ও সতীস্থান (বর্তমানে লোক মুখে সাটিথান নামে পরিচিত)। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে প্রকৃতপক্ষে ঐ দুটি গ্রামে উচ্চকোটির হিন্দু-মুসলমানের বাস আরম্ভ হয়। চৈতন্যপার্ষদ খঞ্জন আচার্য ও তার বংশধরদের হাতে মালিপাড়ার ও দ্বারপাল রাজার দৌহিত্র বংশীয় মল্লিক উপাধিধারী সদগোপ-জমিদারদের হাতেই সতীস্থানের প্রাথমিক উন্নতির সূচনা হয়।

প্রচলিত কাহিনী, অমরারগড়ের পালবংশীয় (সদগোপ) এক যে ছিল রাজার দুই রাণী। কনিষ্ঠার প্ররোচনায় বড়রাণী ও তাঁর একমাত্র সন্তান দ্বারপালকে পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হ'তে হয়। সে এসে আশ্রয় নেয় বিষহরির স্থানের পাশে। নিজের নামে প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম দ্বারবাসিনী। পরবর্তী সামাজিক ইতিহাস দুটি ধর্মের সাঙ্গীকরণ। বিষহরির পূজারীর অধিকার ধীরে ধীরে চলে এলো বৈষ্ণব-বংশীয় ব্রাহ্মণ গোস্বামীদের হাতে। নাগপঞ্চমীতে যেমন একদিকে হয় ঝাপান, উদ্যোক্তা মূলত সাওতাল ও আদিবাসীরা, হয় বহু পাঁঠাবলি (বেশীর ভাগ মানসিক করা); অন্যদিকে বৈষ্ণব অধ্যুষিত সাটিথান গ্রাম থেকে আসে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর উপর গড়া বিগ্রহ নিয়ে কীর্তন-সহযোগে শোভাযাত্রা। এখানে এই শোভাযাত্রা সাটিথানের 'থাক' বলে পরিচিত। দেখলাম, কয়েকশ সাটিথানের গ্রামবাসী বিগ্রহ সাজিয়ে অনেকটা শান্তিপুরের ভাঙ্গা-রাসের অনুকরণে নাগপঞ্চমীর মেলা উপলক্ষে এল বিষহরির মন্দিরে। কিন্তু

তাদের সাথে কয়েকজন ভক্ত দেখলাম, যারা মানসিক করে বিষহরির কাছ পাঁঠাবলী দিয়েছে এবং কাঁধের লাঠিতে ছিন্নমুণ্ড পাঁঠা ঝুলিয়ে, লাঠি ঘুরিয়ে, হৈ হৈ রৈ রৈ করে ঘরে ফিরল।

দ্বারবাসিনী গ্রামের ঠিক মাঝখানে আছেন ধর্মঠাকুর। গ্রামে বিভিন্ন সময়ে পুকুর ও মাটি খুঁড়তে গিয়ে বহু প্রাচীন পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে। যার মধ্যে বুদ্ধমূর্তি ও বরাহীমূর্তি দেখে মনে হয়, এক সময়ে এখানে বৌদ্ধ-প্রভাব ছিল। বরাহী মূর্তি বৌদ্ধ সাধন-মালার বজ্র বরাহীর প্রতীক হওয়াই সম্ভব।

গ্রামের মধ্যে মোগলভিটা এবং গাজীর আস্তানা দেখে মনে হোল, মোগল আমলে এই গ্রামে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফেরার সময় সাটিথান গ্রামের বারোয়ারী তলার পাশে একদা মুসলমান জমিদারের ভাঙ্গাবাড়ী ও আজানের স্থানও এ কথার সাক্ষ্য দিল।

আমরা যখন মেলায় ঢুকি তার অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গেলেও, মন্দিরের চারদিকে মেলা-প্রাঙ্গণে জল কাদায় ও বহু লোকের পায়ে পায়ে যে জিনিষ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে বর্ণনা করলেন সহদেবদা, 'এযে দ্বারবাসিনী নাগপঞ্চমীর দৈ পূর্ববাংলার ছিরি পঞ্চমীর দৈকেও-হার মানাল।'

লোকমুখে শুনলাম এবার জল-ঝড়ের জন্য লোকসমাগম কিছুটা কম। অন্যান্য বৎসর আরো বেশী লোক হয়। শতাধিক পাঁঠা পড়ে। পূজা আরম্ভ হয় সকাল দশটা থেকে, চলে সারাদিন রাত। মন্দিরের এক পাশে শ্মশান, অন্যপাশে একটি পুরানো পুকুর, নাম দেবপুকুর। জনশ্রুতি, এই পুকুরে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বিষহরির ছোট্ট পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ঐ সর্পাসীনা দেবীর অনুরূপ বেশ বড় মৃন্ময় মূর্তি গড়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন পালবংশের রাজারা। ঐ মন্দির মাটিতে মিশে গেছে। সেই ঢিপির উপর বর্তমানের মন্দির ও পাশের দেবোত্তর জমি বর্ধমানের রাজাদের সৌজন্যের প্রমাণ। বর্তমান মন্দির ও বিগ্রহের

বয়স অনুমান মাত্র দেড়শ বছরের মত। সন্ধ্যার আগে বেশ কয়েক জন সাপুড়ে এসে দেবীর সামনে সাপ খেলা দেখাতে লাগলেন।

ঝঁপানতলার কাছেই গ্রামের উদ্যোগী যুবক পীযূষের বাড়ীতে চা-পান পর্ব শেষ করে আমরা সাটিথান গ্রামের পথে এগোলাম। দ্বারবাসিনী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সাটিথান প্রায় এক মাইল। গ্রামের মধ্যে টেরাকোটার কাজকরা দুটো শিবমন্দির। ছোট ইটের ঘাট-বাঁধান পুকুর ও অনেকগুলি পুরানো বাড়ি দেখে গ্রামের একদা ঐশ্বর্যের কথা বোঝা গেল। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বর্তমানে গ্রামের যে দু'চার জন শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোক আছেন, তারা কার্যত গ্রাম ত্যাগ করে সহরের বাসিন্দা হয়েছেন। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি খুব উঁচু বুরুজ দেখা গেল। শুনলাম, তার উপরের অনেকটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। গ্রামের এক বৃদ্ধ বললেন, এটি শেরশাহের আমলের 'অবজারভেসন টাওয়ার।' কিন্তু গঠনশৈলী দেখে মনে হোল, অবজারভেসন টাওয়ারটি নবাবী আমলের!

একদা-জমিদার মল্লিকদের বিরাট বাড়ী। মনে হোল পরিত্যক্ত, কোন কোন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। বাড়ীর খিলানগুলি ইউরোপীয় গথিক রুচীতে তৈরী। যে ছেলেটি আমাদের সাথে ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছিল, বনমালী তাকে জিজ্ঞাসা করল, এ বাড়িতে এখন কারা থাকে?'

ছেলেটি জবাব দিল, 'কেউ না।'

সঙ্গে সঙ্গে নলিনীদা বলে উঠলেন, 'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না বনমালী। তুমি নিজে এখুনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাও দেখবে জ্ঞানবৃদ্ধ শেয়াল পণ্ডিত এবং নাগরাজেরা অনেকেই আনন্দে এ ঘর সে ঘর ঘোরাঘুরি করছেন।'

ছেলেটি হেসে জবাব দিল, 'ঠিক। আমারই ভুল হয়েছে। রাত্রির প্রতি যামে যখনই বাগানের শেয়ালেরা ডাকে এ বাড়ীর অধিবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়।'

সাটিথান গ্রামের দক্ষিণতম প্রান্তে এসে পৌঁছলে পাকা রাস্তা পাওয়া গেল। এখান থেকেই সুরু হল বালি তোলার খাদ। পথের দু'পাশে পর্বতপ্রমাণ বালি তুলে ঢিবি করে রাখা হয়েছে। সহর এলাকা থেকে লরি এসে সারা দিন রাত্রি এখান থেকে বালি কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনি একখানি বালির লরিকে অনুরোধ করে তাতেই আমরা চড়ে বসলাম। লরিটি আসছিল চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়া ষ্টেশন থেকে ১৭ নম্বর বাসে যখন আমরা পিপুলপাতির মোড়ে নামলাম তখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

## চার

### ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালি

'বৃথা তেল পুড়িয়ে কাজ নেই, ভরা কটাল, তুখোড় জোয়ারের দাপটটা ক'মে গেলে আবার লঞ্চ এগোবে। ঘণ্টা তুয়েকের জন্তে ডাঙার সাথে কাছি কর—' খালাশীদের হুকুম দিল সারেঙ্।

প্রায় সত্তর জন যাত্রী চলেছি প্রমোদ মল্লিক আয়োজিত লঞ্চ-যোগে প্রমোদ ভ্রমণে। যাত্রা সুরু হয়েছে হুগলী থেকে। গন্তব্যস্থল, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, জম্বুদ্বীপ। সকাল সাড়ে সাতটায় লঞ্চ ছেড়েছে হুগলী থেকে। পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে শ্রীরামপুরে ও আহিরীটোলার ঘাটে সামান্ত সময়ের জন্য থেকে কয়েকজনকে তুলে নেওয়া হয়েছে। লঞ্চে যাত্রী আমরা প্রায় ষাট জন। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম, 'ভিন্ন রুচি হি লোকাঃ। লঞ্চের উপর পিছন দিকে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্রহ্ম প্রমুখাৎ কয়েকজন রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। গঙ্গার তু-তীরের নোতুন নোতুন দর্শনীয় প্রাকৃতিক শোভার দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। সময় ও ইচ্ছা

দুটিরই অভাব। কয়েকজন আছেন যাঁরা খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত : দু'কাপ চা বা কফি বাড়তি ম্যানেজ করা যায় কিনা সেইদিকে আগ্রহ বেশী। কয়েকজন লঞ্চে উঠেই খোলের মধ্যে তাস নিয়ে খেলতে বসেছেন, বাইরে কিছু দেখার উৎসাহ নেই। লঞ্চে বেড়াতে গেছেন ও স্ফুর্তির সাথে তাস খেলতে পেরেছেন, এতেই খুসি। মেয়েরা কেউ কেউ দল বেঁধে গল্পে মসগুল। কান পেতে শুনলে তার মোদ্দা কথা শোনা যেত, 'দিদি, তোমার এ সাড়ীটার দাম কত কিম্বা মানতাসাটার ওজন ক'ভরি।' অন্য একদল লঞ্চের উপর সামনের দিকটায় বসে দু'চোখ দিয়ে যেন দু'ধারের সব কিছু গিলে খাচ্ছে। এদের মধ্যে কারও কারও আবার কোনটা কি, তার প্রাচীন ইতিহাস কি, জানবার প্রচুর আগ্রহ; এদের সুযোগও রয়েছে প্রচুর। সঙ্গে চলেছেন এক ভদ্রলোক, গঙ্গার দু-কূলের সব কিছু তার নখদর্পণে। প্রয়োজন মত সকলের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন তিনি। আমাদের মধ্যে দু' এক জন আগেও বকখালি বেড়িয়ে এসেছেন, তাঁদের একজনের মুখে চিরাচরিত যাত্রাপথের ফিরিস্তি শুনলাম : কলকাতা থেকে বাসে ডায়মণ্ডহারবার যেতে লাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অথবা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বাসে দু'ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে বাসে দেড় ঘণ্টার পথ কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপ থেকে নামখানাও বাসে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। নামখানায় খেয়ানৌকায় খাল পার হয়ে আবার একঘণ্টা বাসে যেয়ে পৌছতে হয় ফ্রেজারগঞ্জ। ফ্রেজারগঞ্জ থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ বকখালি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন বিভাগের বাস কলকাতা থেকে সরাসরি নামখানা পর্যন্ত যায় দিনে দুবার মাত্র। বকখালিতে সরকারী টুরিষ্ট লজ আছে। শীতকালে তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। শীতকালের কয়েকমাস খাবারও অসুবিধা নেই। স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক একটি চিপ ক্যান্টিন পরিচালনা করেন। তাঁদের ওখানে খাবার মেনু সাধারণ হলেও রান্না ভাল, পরিচ্ছন্নতার অভাব নেই। বক্তাই মন্তব্য ক'রল, 'স্থলপথে বকখালি

যাওয়া ও রিজার্ভ লঞ্চে বকখালি যাওয়ায় আকাশপাতাল প্রভেদ। একে সাধারণ লঞ্চ বলে মনে হচ্ছে না, এ যেন আমাদের ষাটজন ভ্রমণ-পিপাসুর অস্থায়ী বাসর। তিন দিনের জন্য এটি আমাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, স্মৃতি-বিস্মৃতির পসরা বহনকারী দূরগামী চলমান প্রমোদ ভবন।

লঞ্চ চলেছে। ভিতরে একটানা বিরক্তিকর শব্দ। উপরে শীতের দুপুরে মৌজ ক'রে রোদ পিঠ করে ব'সে আছি। গঙ্গার দু'পারের শোভার অন্ত নেই। তবুও আমার যেন কোথায় কিসের একটা অভাব বোধ হচ্ছে। সংসার মন্দাক্রান্তা তালে চলছে অভাব সেখানে নয়। চিত্ত-বিনোদনের জন্য আগের মতই বেড়াতে বেরুচ্ছি। নলিনীদার মত সদা হাস্যমুখ রসিক-সহযাত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা, তারই সাথে বেড়িয়ে এলাম গোস্বামী-মালিপাড়া, খানাকুল। লঞ্চ-ভ্রমণেও তিনি সঙ্গী হয়েছেন, সঙ্গী রয়েছে আরও অনেকে, তবুও মনের ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। দু'মাস হয়ে গেল কল্পনারা কলকাতা ছেড়ে গেছে। ইচ্ছে করেই বোধ হয় যাবার সময় নোতুন ঠিকানা দিয়ে গেল না। বলে গিয়েছিল, নূতন জায়গায় পৌঁছে চিঠি দেবো। দু' মাসের মধ্যে কি একখানা পোষ্টকার্ড লেখারও অবসর হল না? কেন ভাবছি কল্পনার কথা? নিছক দু-চারদিন বেড়ানোর সঙ্গিনী বই তো নয়। বেড়াতে বেরলেই সঙ্গী জুটে যায়। না, বৃথা কারও চিন্তা করব না। কিন্তু ঘুরেফিরে চিন্তা যেন পেয়ে বসে। সঙ্গীর তো আমার অভাব নেই। তবুও ওর সান্নিধ্যে কি যেন একটা অবর্ণনীয় উষ্ণতা ছিল, সেইটি যেন পাচ্ছি না। মনের লাগাম টেনে ধ'রলাম।

ঢেউ কেটে কেটে লঞ্চ পিছনে ফেলে গেল চাঁদপাল ঘাট, আউটরাম ঘাট, শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন। মেটিয়াবুরুজ পার হবার পর বাঁদিকে চোখে পড়ল, এক অনন্তবিস্তৃত চড়া। গঙ্গা বেশ কয়েক মাইল তার উত্তরদিক বেয়ে

গিয়ে হঠাৎ বাঁক ঘুরে দক্ষিণমুখী হল। চড়াটিকে যেন ঘিরে রেখেছে গঙ্গা। ততক্ষণে হাওড়ার পারে পরপর পার হয়ে গেল সাঁতরাগাছি, জগাছা, মৌড়ীগ্রাম, আন্দুল, সাঁকরাইল। আকড়া পার হবার পর বাঁদিকে চোখে পড়ল বাটানগর। গঙ্গার পাড়ে সুন্দর সহর, বিশাল কারখানা, দীর্ঘ প্রাচীরের গায়ে লেখা, 'বাটার জুতো মজবুত।' লেখাটি পড়ে পাশে বসা বৃদ্ধ শিববাবু মন্তব্য করলেন, 'জুতো মজবুত হোক আর নেই হোক, বাটার ব্যবসা-বুদ্ধি মজবুত। দাম কুড়ি টাকা বলবে না, ব'লবে মাত্র উনিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা। বৃদ্ধের মন্তব্যে অনেকেই হেসে উঠল। একটু পরে চোখে পড়ল, বজবজ নামটার সঙ্গে বারমা শেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী বা বর্তমান ইণ্ডিয়ান অয়েল, কথাটা যেন একাত্মা হয়ে গেছে। বড় বড় পেট্রোলের ভ্যাট রোদ পড়ে চকচক কর'ছে। পর পর অনেকগুলি জেটি। প্রতিটির সঙ্গে তেল নামানোর জন্য পাইপলাইন যুক্ত। গাইড্ ভদ্রলোক একটি জেটি দেখিয়ে বললেন, 'এটি বজবজ দু'নম্বর জেটি আর দূরে দক্ষিণদিকে গঙ্গার পাড়ে ঐ যে একতলা সুন্দর বাংলোটি দেখা যাচ্ছে, ঐটি বজবজের হারবারমাষ্টারের কোয়াটার্স, এদের সাথে এক অবিস্মরণীয় মহান স্মৃতি জড়ান রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান বজবজের হারবারমাষ্টার তখন একজন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ক্যাপ্টেন নরম্যান। যেমন কর্তব্যপরায়ণ, ধীর স্থির, তেমনি সজ্জন। সেদিন ঐ দু'নম্বর জেটিতে একখানি বড় তেলের জাহাজ নোঙর করা হয়েছে। বন্দরের নিয়ম অনুসারে জাহাজ যতক্ষণ কোন বন্দরে নোঙর করা থাকে জাহাজের দায়িত্ব থাকে হারবারমাষ্টারের উপর। জাহাজ থেকে পেট্রোল ভ্যাটগুলিতে ভর্তি করার জন্য জাহাজের খোলের মধ্যে রাখা বিরাট ট্যাঙ্কের সাথে পাইপলাইন জুড়ে দিয়ে জাহাজের পাম্প চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাহাজে উপরে মাস্তুলের পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন নরম্যান কাজ দেখাশোনা করছেন। পাম্প চলছে। হঠাৎ কিভাবে ন' ইঞ্চি মোটা পাইপের একটি জোড়া খুলে গেল। হুস্ হুস্

করে প্রতি সেকেণ্ডে কয়েকশ গ্যালন করে পেট্রল বেরিয়ে পড়ে জেটি ভাসিয়ে দিল। সারা গঙ্গার জলের উপর পেট্রল ভেসে যাচ্ছে। 'পাম্প বন্ধ কর বন্ধ কর,' আদেশ দিলেন নরম্যান। ইঞ্জিন ঘরে পাম্প বন্ধ হতে না হতে দুর্ঘটনার উপর দুর্ঘটনা। হঠাৎ কিভাবে জেটির উপরে ও জলে ভাসমান পেট্রলে আগুন ধরে গেল, সারা গঙ্গা যেন আগুনের গঙ্গায় পরিণত হল। জাহাজের গায়ের রঙেও আগুন ধরে গেল। জেটির পাশে দাঁড়ান ফায়ার ব্রীগেড থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলল। জাহাজ থেকে লোকজন ঝুপঝুপ করে জলে লাফিয়ে পড়তে লাগল। নির্বিকার অচঞ্চল ক্যাপ্টেন নরম্যান জাহাজের মাথার উপর দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন সবাইকে, 'ইঞ্জিনম্যান, জাহাজের নোঙরের শিকল লুজ করে দাও, জাহাজ জেটি থেকে যতদূর সম্ভব দূরে গঙ্গার মাঝের দিকে সরিয়ে নাও।...জাহাজের অন্য লোকেরা দৌড়ে জাহাজের পিছন দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে যেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে পাড়ে ওঠ।...এখন ভাঁটার টান, জলের উপর আগুন দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তোমরা উত্তর মুখে সাঁতার দাও, নইলে আগুনের মধ্যে চলে যাবে।' প্রায় সবাই আত্মরক্ষা করল। ততক্ষণে জাহাজের সারা গায়ের রঙে আগুন লেগে লেলিহান শিখা নরম্যানকেও ধরেছে। সবাই চিৎকার করছে, সাহেব, তুমি পালিয়ে এস, জলে ঝাঁপিয়ে পড়।' গম্ভীর আদেশ শোনা গেল, 'জাহাজ নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত আমি জাহাজ ছাড়তে পারি না,...ফায়ার ব্রীগেড, আমার দিকে একটা জলের ধারা দাও—Direct one jet to my body—' শেষ আদেশ শোনা গেল, 'ইঞ্জিনম্যান, তুমি এবার জাহাজ ত্যাগ কর।' গায়ের জামায় আগুন লেগে যাওয়ায় আগেই জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নরম্যান। দণ্ডায়মান বীরের দেহ জাহাজের মাস্তুলের পাশে পড়ে গেল, তখনও ফায়ার ব্রীগেডের একটা ধারা তাঁর গায়ে জল ছিটচ্ছে। অন্য চারটি ইঞ্জিন জাহাজের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। জাহাজ রক্ষা পেল। একটি মাত্র প্রাণী

ছাড়া কেউ মরেনি সে দিন। এ যুগের ক্যাসাবিয়ানকা, মহান ক্যাপ্টেন নরম্যানের অঙ্গারীকৃত দেহখানি পরদিন সমাহিত করা হয়েছিল যোদ্ধসুলভ সম্মানের সাথে। আজও বজবজ ইউরোপিয়ান সেমিট্রির উত্তর কোণে শায়িত সেই কর্তব্যরত সেনাপতি।'

পিছনে পড়ে থাকল অচিপুর, বিড়লাপুর, বাহিরকুঞ্জ আরও কত গঙ্গাতীরের শান্ত নিভৃত জনপদ। ফলতার কাছে এসে চোখে পড়ল, দূরে ডান দিকে দামোদর এসে মিশেছে ভাগীরথীর বুকে। ত্রিমোহনার পাশে গঙ্গার জলের মধ্যে দেখা গেল, একটা নিমজ্জিত জাহাজের মাস্তুলের অংশ। কাহিনী শুনলাম—১৯৩০ সাল, চারিদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ চলেছে। সেদিন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দলে দলে সত্যাগ্রহী লবণ-আইন অমান্য করতে এগোচ্ছে। সেই দিনই সূর্যোদয়ের ঠিক সাথে সাথে জাহাজখানি লিভারপুল থেকে বিলিতি লবণ নিয়ে আসছিল কলকাতা বন্দরে। বিন্দুমাত্র আকাশে ঝড়-বাদল ছিল না, কি অদৃশ্য কারণে জানা যায় না, এইখানে হঠাৎ জাহাজখানি দুলে উঠল। তারপরই একদিকে কাত হয়ে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও জাহাজটিকে বাঁচান গেল না। ঐ বিশেষ দিনে লবণ আইন অমান্য মুহূর্তে লবণের জাহাজের সলিল-সমাধি হোল।···গল্প শুনছি, মন ভেসে চলেছে সুদূর অতীতে। 'এই যে দাদা খাবেন আসুন,' কাব্যানুভূতি বাষ্পে মিলিয়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম। বেঁটেখাট শক্তসমর্থ যুবকটি। প্রয়োজন মত কথা বলে, সদা হাস্যমুখ, কাজ না থাকলে যেন কথা একটু বেশীই বলে, কিন্তু আধুনিক বাংলার বাকসর্বস্ব চালিয়াৎ ছেলেদের ঠিক উল্টো। কথা যত বলে, কাজের প্রয়োজন হওয়া মাত্র আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করে তার শতগুণ। এক কথায় খাঁটি মানুষ, আজ যার অভাব হয়েছে আমাদের সমাজে। সব চেয়ে অবাক হলাম খেতে ব'সে ব্রহ্মর সহযোগী পরিমল, নিবারণ, শিবু, শম্ভুদের দেখে। এরাও আমাদেরই মত বেড়াতে এসেছে কিন্তু আন্তরিকভাবে

হাত লাগিয়েছে ব্রঙ্কের সাথে। এরই মাঝে কিভাবে সহযাত্রীদের যাত্রাকে আনন্দমুখর আরামদায়ক হয়ে ওঠে, বুড়ো শিববাবু থেকে থেকে রকমারী হালকা মন্তব্য করে চলেছেন। তিনি এদের দেখে কিন্তু গম্ভীরভাবে বললেন, 'দেশটা একেবারে গোল্লায় যায়নি, ছেলেদের মাঝে দু'চারটে নবকুমার এখনও আছে দেখছি।'

আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে। লঞ্চের খোলের মধ্যে সতরঞ্চি বিছিয়ে একটু বিশ্রাম করছি। কানে এল সারেঙের আদেশ! শুনলাম, জোয়ারের তোড় এত বেশী যে ইঞ্জিনের সর্বশক্তি দিয়েও লঞ্চ ঘণ্টায় দু' তিন মাইলের বেশী এগোতে পারবে না, ঘণ্টাদুয়েক বয়ার সাথে লঞ্চ বেঁধে রেখে জোয়ারের বেগ একটু কমা মাত্র লঞ্চ আবার যাত্রা করবে। সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই, লঞ্চ বেশ জোরেই এগিয়ে চলেছে। যাত্রীরা সবাই এসে বসেছে লঞ্চের ছাদের উপর, প্রাণভরে গঙ্গার শোভা উপভোগ করছে। গঙ্গার বিস্তার ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। একটা জায়গায় নদীর বিস্তার খুব বেশী। মাঝ-গঙ্গায় চড়া পড়েছে। সারেঙ জানাল, 'বাঁদিকে ঐ নুরপুরের বাতিঘর, সাহেবরা বলতেন, হুগলী পয়েন্ট লাইট হাউস আর ডানদিকে রূপনারায়ণ এসে মিশেছে গঙ্গায়।' সারেঙের কথা শুনেই বোধহয় রবীন্দ্রভক্ত পরিমল নিজের মনেই আবৃত্তি ক'রে চলেছেন,—

"রূপনারায়ণের মুখে পড়ি বালুচর,
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর।
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে,
উত্তাল উদ্দাম। তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।"

"না না, লঞ্চ এখন বেশ চলেছে, এই সময় যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। তরণী এখন আর তীরে ভিড়িয়ে কাজ নেই'—রসিকতা করে মন্তব্য করলেন শিববাবু। সবাই হেসে উঠল।

লজ্জিত পরিমল থেমে গেল।

লঞ্চের উপরের অনেকেই শিববাবুর এই মন্তব্যে ও ঘটনায় মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন। শিববাবুও দেখা গেল যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। একজন বললেন, 'বেশ আবৃত্তি হচ্ছিল। হোক না।'

জ্ঞানবৃদ্ধ নীতিশবাবু রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ধৃত ক'রে বললেন,

"হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে,
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে।"

এখন আর ঐ কবিতা আবৃত্তি হয় না। বরং পরিমল,তুমি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটি আবৃত্তি করতে পার কিনা দেখ। পরিবেশটাও মিলেছে, আমরা জানি না আমাদের এই সোনার তরী কখন কোন পারে ভিড়বে, পশ্চিম আকাশেও দেখ ডুবন্ত সূর্য দিনের চিতা জ্বালিয়েছে।'

পরিমল প্রথমটা একটু সংকোচ বোধ করছিল। সবার অনুরোধে আরম্ভ করলেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল :

"আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জল কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
'কোথা আজ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি।'
কহিবেনা কথা, দেখিতে পাবনা নীরব হাসি॥"

পরিমল থামল। চঞ্চ চলার শব্দ ও জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ নেই। প্রথমেই নীতিশবাবুর একটি মাত্র কথা কানে এল, 'সুন্দর'।

গঙ্গার বুকে, সন্ধ্যা আকাশে ততক্ষণে স্বর্ণ আলোক ঢাকা পড়েছে।

ঘড়ির কাঁটায় ৮-১৫ মিঃ। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল ডায়মণ্ড হারবার বন্দরে বিশাল একখানা অতিকায় সমুদ্রগামী সওদাগরী জাহাজের গায়ে এসে খোলামকুচির মত নোঙর করল আমাদের লঞ্চ। কয়েকটি জিনিষপত্র কিনে নিয়ে ফেরার জন্য কয়েকজন নেমে পড়ল। আদেশ হ'ল বিনা প্রয়োজনে কেউ নামবে না। লঞ্চ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার বুকচিরে আমাদের লঞ্চ নিউ ওরিয়েণ্টাল ছুটে চলেছে। শীতের নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতের ভয়ে সবাই লঞ্চের ভিতর নেমে এসেছে কিন্তু তাকিয়ে আছে বাইরে। রাত্রি এগারটা, যাত্রীরা একে একে শুয়ে পড়বার ব্যবস্থা ক'রছে। সারেঙকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদূর এসেছি?' উত্তর হ'ল, 'পয়লা নম্বর লাট'।

'পয়লা নম্বর লাট?' অবাক হয়ে সারেঙের মুখের দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ কর্তা, ঐ যে বাঁ দিকে গোল্লা দেখা যাচ্ছে।'

পাশে বসেছিলেন নীতিশবাবু। আমার অজ্ঞতায় হেসে ফেললেন, বললেন, 'পয়লা নম্বর মানে লট নম্বর ওয়ান।'

সতের শ ষাট সালে মীরকাশিম নবাব নাজিমের সিংহাসনে বসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে সিংভূম পর্যন্ত বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায়ের স্বাধীনতা দেন, প্রবর্তন করেন দস্তক প্রথা। দস্তক নামে ছাড়পত্র দেখালে তারা বিনা শুল্কে মাল বিদেশে চালান দিতে পারত, কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা দস্তকের সাহায্যে অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা করায় নবাবের সাথে আরম্ভ হল মনোমালিন্য। ফলশ্রুতি উদয়নালার যুদ্ধ, মিরকাশিমের পদচ্যুতি, লর্ড ক্লাইভের কেনা গর্দভ মীরজাফরের নামে মসনদ লাভ, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ। ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের আগে পর্যন্ত সারা বাংলার জঙ্গলমহলের লোকেরা ছিল কার্যত বিশ্বপিতার প্রজা, তারা কাউকে খাজনা দিত না। বনসম্পদের উপর ছিল তাদের নিজস্ব অধিকার। ইংরেজ দেওয়ানী পেয়ে বনকর বিভাগ বসালেন

এবং এর ফলে মেদিনীপুর ও মল্লভূমের বনাঞ্চলে আরম্ভ হয় চোয়াড় বিদ্রোহ। ইংরেজরা মেদিনীপুরের এই প্রথম গণবিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে দলে দলে মেদিনীপুরের বনাঞ্চলের লোকেরা এসে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল সুন্দরবনের ভিতর। সুন্দরবন দুর্গম, খুব অভ্যন্তরে না ঢুকতে পারলেও তারা জনপদের কাছাকাছি বনের ভিতর বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বসতি আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে সুন্দরবনে ঐ এলাকাগুলির বন হাসিল হয়ে কৃষিজমিতে পরিণত হতে লাগল। সুন্দরবন তখন কনজারভেটর অফ ফরেষ্ট যশোর ডিভিশনের অধীন, (পরে নাম হয় Conservator of forest Khulna) বনবিভাগ সমস্ত বনাঞ্চলকে ছোট ছোট এলাকা বা lot-এ ভাগ করে ফেলে। এইখান থেকে আরম্ভ হয় লট নম্বর এক, এর দক্ষিণপূর্ব লট নম্বর দুই, তারপর পূর্বদিকে তিন, চার, দক্ষিণে পাঁচ এই ভাবে প্রায় তিনশ লটে ভাগ করা হয়। পরবর্তী কালে এই লটের অনেকগুলি জনপদে পরিণত হয়েছে। বনবিভাগও রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এগুলিকে ২৪ পরগণা জেলার কালেক্টারের অধীনে হস্তান্তরিত করে দিয়েছে। নোতুন গ্রামের নামও হয়েছে কিন্তু স্থানীয় লোকে আদি সুন্দরবনের যে অঞ্চল বর্তমানে জনপদে পরিণত হয়েছে তাকে লাট অঞ্চল বলে, গ্রামগুলিও আগের নম্বরের স্মৃতি বহন করছে। যেমন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পাঁচের নম্বর লক্ষ্মীপুর বা কাকদ্বীপ সহর চোদ্দ নম্বর কাকদ্বীপ নামে স্থানীয় লোকের কাছে পরিচিত।

রাত প্রায় দুটো। নিশুতি বিশ্বচরাচর। লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজও থেমে গেল, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, প্রাগ্ ঐতিহাসিক কালের অতিকায় জন্তুর মত কুয়াশা নেমেছে নদীর বুকে। লঞ্চ নদীর মধ্যে পাড় থেকে একটু দূরে নোঙর করেছে। পাড় কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না কিন্তু খুব একটা দূরে নয় বোঝা যাচ্ছে। পাড়ের বুকে জল ঝাঁপিয়ে পড়ার আওযাজ কানে আসছে। চতুর্দশীর চাঁদ একটু

পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। মরা শকুনের চোখের মত ঘোলাটে চাঁদ; আলো কুয়াশায় মাথামাখি হয়ে যেন শ্বেত চন্দনে সারা দুনিয়াকে ডুবিয়ে দিয়েছে। যাত্রীরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হতভাগ্যের দল। একদিকে মৌসুমীর জঙ্গল অন্যদিকে চেমাগুড়ি—মাঝে যোজন বিস্তৃত বিশাল জলরাশি কুয়াশা ও চাঁদের আলো বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে; দিকপ্লাবী মনোরম দৃশ্যের মাঝে নির্জন নিশীথে সাগরের মুখের কলসংগীত উপভোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করল।

সূর্যদেব পূর্ব আকাশে আসছেন সংবাদ পেয়েই যেন কুয়াশার রাশি সরে পড়ল। চোখে পড়ল বিশাল ভয়ঙ্কর সুন্দর সমুদ্র। নাকে এল ফ্রেজারগঞ্জ ফিসারীর শুঁটকি মাছের গন্ধ। দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর, যার গভীরতা ভৌগোলিকের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। কোথাও কোথাও এত গভীর যে আলোকরশ্মি তার প্রতিফলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসেনা বলে জল দেখে মনে হয় কাজল-কালো, তাইতে এর আর এক নাম কালাপানি। এই বিস্তৃত সাগরের দক্ষিণে ঘন গর্জিত ভারত মহাসাগরের বিশাল ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলাম রাত্রি জাগরণের গ্লানি। নিজের অস্তিত্বও যেন বিস্মৃত হলাম। লঞ্চ নোঙর করল ফিসারীর পাশেই। মেয়ে পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সবারই নেমে পড়বার হুটোপাটি। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও আমরা মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন নই, তবু মাটির মানুষের মা-টিকে পাবার জন্যে কি ব্যাকুল আগ্রহ।

এই ফ্রেজারগঞ্জই প্রকৃতপক্ষে কলকাতা থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী সমুদ্রসৈকত। ফ্রেজারগঞ্জের জন্মকাহিনী শুনলাম। শতবর্ষ আগে ইংলণ্ডের এক অভিজাত পরিবারের সন্তান ফ্রেজার সাহেব এসেছিলেন কলকাতায় বাংলার লাট হয়ে। প্রথমে আসবার সময় ভয় পেয়েছিলেন, সাথে করে নিয়ে আসতে উন্নাসিকা, লর্ড দুহিতা শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে। যোগ্য শাসক কর্মবীর যুবক অবসর পেলেই বাংলার পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে দেখতেন কি করে কোন এলাকার উন্নয়ন করা যায়।

নৌকাযোগে এলেন সুন্দরবনের প্রান্তের এই সাগরসৈকতে। এল অসময়ে কাল বৈশাখীর ঝড়। নৌকা ও নাবিকেরা নোঙর করে থাকল টেমিয়ার গাছের মধ্যে। লাট সাহেব কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে আশ্রয় নিতে নামলেন নদীর পাড়ে, বনের মাঝের জনপদের এক কিষাণের চালায়। মুগ্ধ হয়েছিলেন সাগরসৈকতের প্রাকৃতিক দৃশ্যে, মুগ্ধ হলেন কিষাণ কন্যার আতিথেয়তায়।

সমুদ্র তীরের অনাগত ভবিষ্যৎও বুঝি তার মানসচক্ষেও ভেসে উঠেছিল সেদিন। উঠে পড়ে লেগে গেলেন এই জনপদের উন্নতির কাজে। বন কাটালেন। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মুলিয়াদের এনে বসালেন মৎস-শিকারের কাজে। দরাজহাতে জমি পত্তন দেওয়ালেন মেদিনীপুরের ছিন্নমূল চাষী ও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের। প্রথমে এসে তাঁবু গেড়ে থাকতেন বর্তমান ফিসারীর উত্তরদিকে, পরে সেখানে গড়ে তুললেন সৈকতাবাস। শাসকের শত কাজের মাঝে অবসর পাওয়া মাত্র, তিনি কলকাতা ছেড়ে ছুটে চলে আসতেন সৈকতাবাসে। হাজার হাজার মানুষের শ্রমে গড়ে তুলতে হবে সাগরবেলায় নূতন সুখী জনপদ, একদিন হয়ত ফ্রেজারের এই মানসপুত্র হবে পূর্ব-দুনিয়ার লিসবন সহর। লাটসাহেবের প্রধান প্রেরণা ছিল কিষাণ-কন্যা নারায়ণী। অষ্টাদশী, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল সুশ্রী চেহারা। সুন্দর-বনের উর্বর মাটিতে জন্ম; নোনাজলে খোলা-হাওয়ায় বন্যলতার মত বেড়ে উঠেছিল। তেজে গতিশীলতায় যেন একটা সোদরবনের ফণাধরা গোখুরা। নারায়ণী ভালবেসেছিল ফ্রেজার সাহেবকে, দিনের পর দিন উদ্বুদ্ধ করেছিল তাকে নূতন জনপদ গড়তে। এই সাগরবেলায় এসে ফ্রেজার ভুলে যেতেন তিনি বাংলার লাট। গৌর বর্ণ, দীর্ঘকায় ইংরেজ যুবক পুঁতে চলত এখানকার মাটিতে নারকেলের চারা একটার পর একটা আর কোমরে সাড়ীর আঁচল জড়িয়ে এক উদ্ভিন্নযৌবনা শ্যামলা মেয়ে ছুটে ছুটে সেই গাছের গোড়ায় দিত মাটি। মাটির কলসী করে মিঠে পুকুরের জল এনে ঢালত সেই চারার মূলে।

ফ্রেজারের সৈকতাবাসের জীবনের সুখ সহ্য করতে পারেনি কলকাতার অভিজাত ইংরেজ-কোম্পানীর সাহেবেরা। শত শত ডালপালায় পল্লবিত হয়ে ফ্রেজারের জীবনযাত্রার কাহিনী পৌঁছেছিল সাগরপারের শ্বেত দ্বীপে। কলকাতায় এসে পৌঁছলেন লর্ড-দুহিতা। তারপর আর কোনদিন ফ্রেজার সাহেব আসেন নি এখানের সৈকত ভূমিতে। এখানকার উন্নয়নেরও হল অবসান।

এসেছিল তার কিছুদিন পরে কয়েকজন অভিজাত শ্বেতকায়কে নিয়ে একখানা জলযান রাতের আঁধারে। রাতের আঁধারেই তারা ফিরে গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা পরদিন ভোরে দেখতে পেয়েছিল অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নারায়ণীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। সেই আনন্দ-উচ্ছল মেয়েটির শোকাবহ পরিণামের স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণীতলা, রয়েছে ফ্রেজার সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত তাঁবুপাড়া। ফিসারী অফিসের উত্তরে দেখা যাবে মাটির বুকে ছিটিয়ে রয়েছে সৈকতাবাসের ভগ্ন অংশগুলি।

যেখানে ছিল ফ্রেজার-নারায়ণীর হাতে রোয়া নারকেল বীথি সেখানে দিন দিন সাগর এগিয়ে আসছে। ফ্রেজারগঞ্জের সেই বিশাল নারকেলবীথির সবই প্রায় আজ সাগরগর্ভে, শেষ স্মৃতি মাত্র গুটি কয়েক বৃদ্ধ গাছ কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাগরের ভাঙ্গনের জন্য এখানে স্নান করার সুবিধা নেই।

আমরা উঠে এলাম পাকা রাস্তার ধারে যেখানে নামখানা থেকে আগত বাসগুলি এসে তাদের যাত্রাবিরতি করে। চললাম পায়ে চলা পথ বেয়ে বকখালি টুরিষ্ট লজের দিকে। আমাদের চলা যেন এক শোভাযাত্রা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু-নারী, তরুণ-তরুণীর দলে মোট ষাটজন। পায়ের তলায় কাঁকড়া, জেলিফিস মাড়িয়ে চলেছি। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ঝাউবীথির পাশে ছায়া-ঢাকা টুরিষ্ট লজের ধারে। কাঠের টুরিষ্ট লজ অনেকটা ফরেষ্ট অফিসের ধাঁচে তৈরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বকখালিকে ভ্রমণার্থীদের প্রিয় সমুদ্রসৈকতরূপে গড়ে তোলার

পরিকল্পনা করেছেন, শুনলাম। স্থানীয় চীপ ক্যান্টিনের পরিচালকদের মধ্যে একজন জানাল এখানকার বাস্তব অসুবিধাগুলির কথা। প্রথমতঃ নামখানায় নদীর উপর পুল না থাকায় নদী খেয়ায় পারাপার করে যাতায়াতের অসুবিধা। নিজেদের গাড়ী নিয়ে সরাসরি আসা কষ্টকর, যদিও ওখানে বার্জের ব্যবস্থা করা যায় তবুও সেটি সময় ও খরচ সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বকখালি কেবল দুর্গম নয়—সুন্দরবন-সংলগ্ন বলে সাপ, পোকা, মাকড় ও জোঁকের উপদ্রবের জন্য সৌখিন ভ্রমণার্থী আসে না। ফলে বছরে চার পাঁচ মাস বন্ধ থাকার জন্য হোটেল, দোকান, ক্যান্টিন গড়ে তোলা কঠিন। তৃতীয়তঃ অতি নির্জনতার জন্য ভ্রমণার্থীরা একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠেন, এখানে ছুটি কাটানোর হলিডে হোম হিসাবে কেউ থাকতে চায় না। ফলে ভ্রমণকে এখানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শিল্প হিসাবে, দীঘা বা পুরীর মত গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য। এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পূর্বদিকে সুন্দরবনের সুন্দরী, হেঁতাল, গরানের বনভূমি, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সাগরের অনন্ত বিস্তার ও উত্তরের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেতের মাঝখানে বকখালি, জনবহুল কলকাতা বা সহরবাসীর কাছে এক নূতন অপরূপ রূপে ভেসে উঠে, মনে হয় অন্য জগতে এসেছি।

আমরা স্নান করলাম দারুণভাবে। ঢেউ নেই, শান্ত সমুদ্র। হেঁটে হেঁটে আধ মাইল এগিয়ে যেয়েও মাত্র বুক জল। বহু দূরে এসে গেছি বলে আর এগোতে ভয় ক'রল।

ব্রহ্ম তার দুই সহযোগীকে নিয়ে আগেই চলে গেল লঞ্চে। ফিসারীজের কাছে জেলেদের নৌকা থেকে মাছ কিনতে হবে, বেলাও বেড়ে উঠছে, দুপুরের মধ্যেই জোয়ার এসে যাবে আমাদের ফেরার জন্য তখনই লঞ্চ ছাড়তে হবে। কর্তব্যবোধে ব্রহ্মকে চলে যেতে দেখে আমাদেরও কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। কিন্তু একে অতবড় দল, এ উঠতে চায় তো ও ওঠেনা, তার উপর সংসারে নিত্য হাঁড়ীতে বাঁধা মেয়েরা নির্জন সাগরসৈকতে ছাড়া পেয়ে যেন নোতুন জীবন

পেয়েছে। জল ছেড়ে উঠল তো ভিজে কাপড়ে বালির উপর দৌড়া-দৌড়ি আরম্ভ করল, একজনকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে সবাই মহা খুশি, হাসিতে ফেটে পড়ছে।

কেউ ঝিনুক কুড়ুচ্ছে। অবশেষে নীতীশবাবুর গম্ভীর গলার ধমক সবাইকে সংযত করল।

লঞ্চে ফিরে শুরু ভোজন পর্ব। যদিও সামুদ্রিক মাছ তবুও একসঙ্গে একই বেলায় মাছ ভাজা, মাছের ঝাল ও মাছের ঝোলের আস্বাদ বহুদিন আমরা ভুলে গেছিলাম। ব্রজের ব্যবস্থায় আবার স্মরণে এল।

গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় শীত বোধ করলেও লঞ্চের ছাদে বসবার লোভ সামলাতে পারি নি। যাবার সময়ে রাত্রি জাগরণ ছিল, ফেরার পথে ঠাণ্ডা লাগল। বকখালির ভ্রমণ-পর্ব সেরে এসে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বেশ কিছুদিন ঘরে আটকা পড়ে যাই। সেদিন দুপুরে আহারাদি সেরে একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছি, কড়া নাড়ার শব্দে উঠে দরজা খুললাম।

দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্কর।

## পাঁচ

### গোসাবা

'হঠাৎ স্কুলের ছুটি হয়ে গেল। একদা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন ঘোষদস্তিদার মশায়, গত রাত্রে বিগত হয়েছেন। সেইজন্য অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম'—বললে শঙ্কর। সাউথ সেমিনার স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক, বয়সে নবীন, চোখে-মুখে কথা বলে, কিন্তু আধুনিক চালিয়াৎ ছেলেদের মত নয়। আগে দু'একবার আমাদের সাথে বেড়াতে বেরিয়েছে, সুন্দর সহযাত্রী। সব কিছু দেখার চোখ-

আছে, কষ্টসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী, বেড়াতে যাবার আগ্রহ খুব বেশী কিন্তু স্কুলমাষ্টার, অনেকটা কাবুলিওয়ালার মত আসলির চেয়ে সুদের তাগাদা বেশী। স্কুলে মাঝে মাঝে ছুটি মেলে কিন্তু টিউসনির মাত্রা শঙ্করের নাকি দিনের পর দিন লম্বা হচ্ছে। তাদের কাছে ছুটি মেলা ভার, ফলে ইচ্ছে থাকলেও শঙ্কর, সব সময় বেরুতে পারে না। কিছুক্ষণ হালকা আলাপ করার পর শঙ্কর আসল কথাটা পাড়ল, 'সামনেই মুসলমান পর্ব, সঙ্গে রবিবার ও গুরু নানকের জন্মদিন, তিন-দিন ছুটি, ছেলে পড়িয়ে-পড়িয়ে বড্ড একঘেয়ে লাগছে, চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

মনে মনে খুশি হলাম কিন্তু মুখে রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'শঙ্কর' তোমার নামটার প্রতি আমার একটু এলার্জি আছে।' শঙ্কর কথাটি কানে আসা মাত্রই আমার মনে পড়ে সৃষ্টির আদিকালের কথা। দীর্ঘদিনের দেবাসুরের দ্বন্দ্ব মিটে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সমুদ্র মন্থন, শেষ নাগের সহস্র মুখনিঃসৃত হলাহলের জ্বালায় দেব-দৈত্য সবাই শেষ হয়ে যেতে বসেছে, অবসান হবে চিরন্তন বিবাদের। গণ্ডগোলটা জিইয়ে রাখল শঙ্কর, সেই বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ ক'রে।

জাতিভেদের অভিশাপ, হরিজন সমস্যা জ্বালাচ্ছে ভারতভূমিকে যুগ যুগ ধরে। এলেন তথাগত, মহাবীর। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম অস্বীকার করল জাতিভেদের বাধা, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল বন্যায় জাতিভেদ ভাসিয়ে নিয়ে যেত ভারত সাগরের পারে। গণ্ডোগোল বাধালেন শঙ্কর। বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যা রুদ্ধ করল তাঁর অদ্বৈতবাদ এনে। ভারতের বুকে পুনর্জীবিত করলেন জাতিভেদ প্রথার অভিশাপকে।

সাধারণ লোক দু'পয়সা আয় বরকত করে সুখে দুঃখে বেশ থাকবে নিজের ছেলে-মেয়ে বৌ-নাতি নিয়ে। বুকটা তাদের ভরে যায় পুত্রের মুখখানি দেখে। গণ্ডোগোল বাধালেন আর এক শঙ্কর। মারলেন তাঁর মোহমুদ্গরের বাড়ি মানুষের মাথায়। শোনালেন,

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারায়ং অতীব বিচিত্র।" সংসার বিচিত্র হোক তাঁর কি মাথা-ব্যথা, তাদের পুত্রমুখ দেখে একটু শান্তিতে থাকতে দিলেন না।

যাক্‌গে পুরান দিনের কথা। আমি কলমপেশা নির্বিরোধী মানুষ, একটু শান্তিতে থাকব তার উপায় নেই। এ কালের শঙ্কর তার শঙ্করস্‌ উইক্‌লিতে আমাদের নিয়ে কর্টুন ছবি এঁকে পাগল করে তুলছে।

শঙ্কর একটু বিব্রত বোধ করল। তার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে ব'ললাম, 'তোমরা প্রকৃতির সন্তান মানব-শিশু, তোমরাই বিজ্ঞানরূপী অবিদ্যা দিয়ে এখানে প্রকৃতি মাকেই দন্তহীনা ধূমাবতীতে পরিণত ক'রেছ। সেই—

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘাচ মলিনাম্বরা
বিবর্ণ কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরল দ্বিজা।

বৃক্ষহীনা, বিবর্ণা রুক্ষা ধূমাবতী কলকাতার বাসিন্দা কোথায় তোমায় যেতে বলি বল। তুমি যদি বুড়ো মানুষ হতে তাহলে বলতাম চল কোন তীর্থে বেড়িয়ে আসি, যদি মরণকালে কানে দুটো হরিনাম আসে। তুমি এ কালের মডার্ন ছেলে তায় শঙ্কর, তুমি নিজেই জড়প্রকৃতির ছল করে সংহার-লীলার প্রতীকের পায়ের তলায় পড়ে আছ:

রুধির বদনা বামা ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা
বহ্নি বরুণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে,
জড় প্রকৃতির ছলে শঙ্কর সে পদতলে
নৃমুণ্ড মালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।

এক যেতে পার জড় প্রকৃতি দেখতে। সেই অঞ্চলে যেখানে নৃমুণ্ডমালিনীরূপা কালো জলরাশি লাফিয়ে পড়ছে জড়রূপা প্রকৃতির বুকে। আর প্রকৃতি যেখানে ছল করে তার রূপরাশি লুকোতে চাইছে সুন্দরী বনের মাঝে।'

শঙ্করের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'কোথায় আমার জানার দরকার নেই। আপনিও যাচ্ছেন তো? শনি, রবি, সোম ছুটি, কবে কখন কোথা থেকে যাত্রা করব?

'শুক্রবার সন্ধ্যায়, শয়ালদহ সাউথ স্টেশনে বুকিং অফিসের সামনে।'

প্রয়োজনীয় দু'চারটি কথা তখনকার মত জেনে নিয়ে শঙ্কর বিদায় নিল।

সন্ধ্যা ছটা কুড়ি, ক্যানিং লোকাল ছাড়ল। ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভীড়। পরস্পর অফিসের কথা, তাসখেলা নিয়ে ব্যস্ত, আমরা দু'জন 'হংস মধ্যে বকো যথা।' সোনারপুর, কালিকাপুর ও চাম্পাহাটি তিন ষ্টেশনেই গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রী নেমে গেল। পৌণে আটটার মধ্যে এসে নামলাম ক্যানিং ষ্টেশনে। যাত্রী-সংখ্যা কম কিন্তু সবাই ব্যস্ত, ছুটেছে লঞ্চ ঘাটের দিকে। আমরাও সামিল হলাম। বিস্তীর্ণ মাতলা নদীর পাড়ে অতি নোংরা সহর ক্যানিং। থানা, পোষ্ট অফিস, সাবরেজেষ্ট্রি অফিস, বনকর অফিস, সুন্দরবন লঞ্চ সিণ্ডিকেটের অফিস সবই আছে। অফিসগুলিও কর্মব্যস্ত, ক্যানিংকে প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের গেটওয়ে বলা চলে। নদীর পাড়ে বিরাট বাজার, বহু হোটেল, তার মধ্যে দু'তিনটি আবাসিকও আছে, কিন্তু এত নোংরা খাবারের দোকান ও হোটেল পশ্চিম বাংলার আর কোথাও দেখা যায় না। হোটেলগুলির চেহারা—গোয়ালন্দের ঘাটের মুসলমান হোটেলগুলির স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে। একটা জিনিষ দেখে অবাক হলাম। রাত আটটা বেজে গেছে, অন্য সব জায়গায় দোকান বাজার বন্ধ হয়ে যায় আর এখানে দেখে মনে হ'ল কেবলমাত্র খোলা হচ্ছে। কোন কোনটা তখনও খোলা হয়নি। হোটেলগুলিতে রান্নার আয়োজন দেখে বেশ বোঝা গেল প্রতিটি হোটেলে অনেক লোকই খায়, কিন্তু বাজারে বা হোটেলে ক্রেতা-বিক্রেতা নেই

বললেই চলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ক্যানিং বাজার রাতের বাজার। সুন্দরবনের দূর দূরান্তের জনপদগুলি থেকে মাছ তরকারী ও অন্যান্য কৃষি ফসল-ভরা নৌকো এসে হাজির হতে আরম্ভ করে ক্যানিং বাজারের ঘাটে রাত নটা-দশটার সময় থেকে। কলকাতার ফড়েরাও এসে হাজির হয় সেই সময়, গভীর রাত্রে আরম্ভ হয় কেনাবেচা কলকাতা-গামী ভোর সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে সমস্ত মালপত্র চলে যায় কলকাতায়, বাজারও যায় বন্ধ হয়ে। দিনের বেলায় ক্যানিংএর বাজার রাতের বাজারের শতাংশের এক অংশ মাত্র। নোতুন লোকে মনে করবে হয়ত বাজারে আংশিক হরতাল হয়েছে।

আমরা প্রথমে গেলাম লঞ্চ সিণ্ডিকেটের অফিসে। বেশ বড় অফিস, সামনে মুসাফিরখানা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ক্যানিং থেকে গোসাবাগামী লঞ্চ ছাড়ে ৬ খানা। যেতে সময় লাগে কম বেশী চার ঘণ্টা। জোয়ার-ভাঁটার জন্যে, মরা কোটাল ও ভরা কোটালের টানের জন্যে যন্ত্রচালিত লঞ্চ হলেও সময়ের একটু-আধটু তারতম্য এড়ান যায় না। লঞ্চই সুন্দরবনের সর্বত্র যাতায়াতের একমাত্র সার্বজনীন পরিবহন। লঞ্চে ভীড় হয় খুব বেশী এবং এই ভীড় সহরবাসী ভদ্রলোকেদের পক্ষে খুব আরাম-দায়ক নয়, কারণ, যাত্রীদের বেশীর ভাগই খালি গায়ে-চসা কৃষিজীবি বা মৎসজীবির দল। লঞ্চের উপরে ড্রাইভারের পাশে কয়েকটা করে ঢাকা সিট থাকে, ঐগুলি লঞ্চের ফার্ষ্টক্লাশ, কিছু বেশী ভাড়ায় ওখানে একটু কম ভীড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু লঞ্চ যাত্রার সবচেয়ে বড় অভিশাপ ওর একটানা ধক্ ধক্ আওয়াজ। লঞ্চে যাওয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমরা ঠিক করে ফেললাম একখানা ছোট্ট নৌকা, নৌকার এক পাশে একটুখানি ছৈ। অনেকটা পূর্ববাংলার টাবুরে নৌকার মত। একাই মাঝি বৈঠা চালায়, কোন দাঁড়ির বালাই নেই। এখন জোয়ার, রাত্রি শেষে ভাঁটা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়বে জেনে নিয়ে আমরা এলাম রেলওয়ে ওয়েটিং রুমে

একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে। আমাদের মন্দ কপাল, রাত যত বাড়ে একখানার পর একখানা ট্রেন এসে পৌছায় ক্যানিং ষ্টেশনে। প্রতি ট্রেনে কোলাহলমুখর যাত্রীর ভীড় বেশী। একবার করে তন্দ্রা আসে, ওদের হল্লায় পালিয়ে যায়। রাত একটায় যে ট্রেনটা এল, তখন হল্লা চরমে উঠেছে। বেরিয়ে দেখি, ঝুঁড়ি কাঁধে শয়ে শয়ে ফোড়ের দল নেমেছে কলকাতা থেকে এসে। যারা আগের গাড়ীতে এসেছে, তারা কেউ কেউ ইতিমধ্যে দু' চার ঝুঁড়ি মাছ বা কাঁকড়া এনে ফেলেছে ষ্টেশনে। রাত্রি শেষ হয়ে আসে, ক্যানিং এর কর্মব্যস্ততা বেড়ে চলে।

শুক্লা চতুর্দশীর সুন্দরী রজনীর শেষ প্রহরে রেলওয়ে বিশ্রাম-ভবনে বিশ্রামের অকাল-বিরতি ঘটিয়ে ধীরপায়ে আমরা এগিয়ে গেলাম জেটি ঘাটের দিকে। তারপর—

"স্নিগ্ধ সরল চন্দন রসে সিক্ত করিয়া বিশ্ব,
চন্দ্র যখন মাতলার আড়ে হইল বিগত দৃশ্য।
নিশা অবসানে ভোরের বেলায় ভেদিয়া কুহেলি ঘোর,
শ্রাবণ সাঁঝের বলাকার মত ছুটিল তরণী মোর।"

নীল আকাশের বুকে বকেরা যেমন আলতো ভাবে গা-ভাসিয়ে দিলেও গতিবেগ তাদের বেশ থাকে তেমনি বেগেই আমাদের সাদা পাল-তোলা কালো নৌকো নীল জলের বুকে ভেসে চলল। কানে আসছে —একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মনে হল তবলায় চাঁটি দিচ্ছেন ওস্তাদ আল্লারাখা খাঁ! শেষ রাতের ফুর ফুরে বাতাসে শীতের আমেজ। বাঁকুড়ার যে চাদরটি বিছানায় পাতার জন্য এসেছিল তাকেই গায়ে জড়ালাম।

ধীরে ধীরে প্রকৃতির রূপ বদলায়। ঘোলাটে আলো হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। একটু পরেই পূর্ব আকাশে দেখা দেয় লালিমা। মনে হয় যেন বালিকা-ধরণী ধীরে ধীরে কিশোর বয়সে পা দিচ্ছে। শঙ্কর মাঝির কাছ থেকে নদীর দু'পাড়ের গ্রামগুলির নাম জেনে নিতে

লাগল। বটতলা, নারায়ণতলা, রোদোখালি, গোরাবাড়ী হাটতলা —সুন্দর সুন্দর নোতুন নোতুন নাম। দিনকর যৌবন-উদ্ধত হবার আগেই নৌকো এসে পৌছল বিশাল মাতলা নদী ছেড়ে শীর্ণা একটি খালের মুখে। অনেকে একে গোসাবা নদী বলে। আসলে এটি মাতলা ও বিদ্যা নদীর সংযোজক খাল। চওড়া কম কিন্তু গভীরতা ও টান খুব বেশী—।

খালের মুখেই এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গঞ্জ বাসন্তী। বাজারের লোকজনের হাঁকডাক শোনা যায় দূর থেকেই. চোখে পড়ে সিনেমা হলের উঁচু টিনের চাল। এক সময় এখানে ছিল বনপুলিসের অফিস, সেটি চলে গেছে সজনেখালি। পরিবর্তে এখানে ব'সেছে সহর পুলিসের থানা। নদীর যে পারে বাসন্তী তার বিপরীতদিকে আর একটি খাল চলে গেছে উত্তরদিকে—তারই পাড়ে পাঠানখালি। সুন্দর বন অঞ্চলের একমাত্র কলেজ এই পাঠানখালিতে। এখানে অনেক জায়গারই নামের শেষে 'খালি' দেখা যায়; যেমন বেগুয়াখালি, রোদোখালি. সজনেখালি. পাঠানখালি প্রভৃতি। বহুদিন আগে শুনেছিলাম 'খালি' একটি আদিবাসী শব্দ, অর্থ জনপদ। জানিনা পাঠানখালি কোনও পাঠান শাসকের বা বীরের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে কিনা।

মাঝি নৌকা চালাতে চালাতেই তোলা-উনুনে নৌকার খোলের মধ্যেই আমাদের জন্যে চা তৈরী করে দিয়েছিল ঠিক সময়টিতেই। আমাদের চা খাইয়ে নিজের কলাই-এর গেলাসে চুমুক দিয়ে তারিফ ক'রল চায়ের ফ্লেভারের। দক্ষিণা গাঙের মাঝি জানেনা কোথায় দার্জিলিং; কিন্তু দেখলাম হিমগিরির পাদমূলে জাত চায়ের মর্যাদা বোঝে। যাত্রা সুরু করার আগেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম চা, চিনি, গুড়ো দুধ, টিফিন, এক বেলার চাল ডাল আলু ডিম। মাঝিই রান্না ক'রল ভাতে ভাত। বললে, 'আপনারা খাবা কৈর‍্যা খান বাবু, প্যাসাদ তো পামুই।'

মাঝি শোনাল শৈশবের কাহিনী। হঠাৎ একদিন শান্ত গ্রামের বুকে জ্বলে উঠেছিল হিংসার আগুন কেন সে জানে না। রাতের আঁধারে মা-বাপের হাত ধরে ছেড়েছিল জন্মের ভিটে। গাঁয়ের মানুষ তার মা-বাপ জানতো না কোন্ দিকে নিরাপদ আশ্রয়। পথে দাঙ্গায় নিহত মা-বাপের মৃতদেহ ফেলে কিভাবে সে অকূলে ভাসতে ভাসতে এসেছিল এপার বাংলায়। আরও বুঝি তার অকূলে নাও ভাসানয় তাই এত আনন্দ। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। কানে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। আড় চোখে তাকিয়ে দেখি মুখটা গলুই-এর দিকে ঘুরিয়ে অলক্ষ্যে কাঁধের গামছাখানা দিয়ে চোখটা মুছে নিল মাঝি।

একভাটি একজোয়ার প্রায় শেষ। সূর্যদেব পশ্চিম-আকাশে ঢ'লে পড়ছেন। আমাদের নৌকা এসে পড়ল বিত্তানদীতে। সামনেই নদীর ধারে গোসাবা বাজারের ঘাট। এককালের আদর্শ জনপদ এখন মরণ-উন্মুখ। বড় হাইস্কুল বাড়ী, গেস্ট হাউস, গীর্জা অনেক কিছুই চোখে প'ড়ল—কিন্তু জৌলুস আর নেই। লোহার খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মাথায় এক সময় বিজলী বাতি জ্বলত। বহুদিন হ'ল বাতি নিভে গেছে, জানিনা আর কখনও জ্বলবে কি না।

প্রায় শতাব্দী কাল আগে ভারতে এসেছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এক ধনী মনীষী—স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। প্রথমে এই উত্তাল বিত্তা-নদীর তীরে দুর্গম ব্যাঘ্র-শংকুল অরণ্য কেটে করলেন বসতি প্রতিষ্ঠা। অর্থনীতি সম্পর্কে ছিল তাঁর নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারা। নিজের চিন্তাধারাকে রূপ দেবার জন্য তিনি পরবর্তী কালে সাতজেলিয়া ও হ্যামিলটন আবাদ নামে আরও দুটি বৃহৎ দ্বীপ ইজারা নেন বন-বিভাগের কাছ থেকে। দিনের পর দিন তিনি ভেবেছিলেন এদেশের ঘুণ-ধরা দরিদ্র অর্থনীতি নিয়ে। বুঝেছিলেন এ দেশের অর্থনীতি কতটা কৃষি-নির্ভর। তাই, সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন তিনি গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার উপর। 'ড্যানিয়েলের মতে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির

মেরুদণ্ড হচ্ছে সমবায়-ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন। সমবায় ভিত্তিক কৃষি-উৎপাদনে দেশের যুবশক্তিকে অংশগ্রহণ করানোয় তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি এটাও বুঝেছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষাও দরকার। সাগরপারের চিন্তাবিদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল অরণ্যময় শ্বাপদ-শংকুল বাইশ হাজার একর জমি। প্রকৃতির সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যে ঐ অঞ্চলকে চাষ-আবাদের উপযুক্ত করে তোলা ছিল সাধারণ মানুষের চিন্তায় অসাধ্য। কিন্তু সমবেত কৃষকদের শক্তি প্রমাণ করল যে ঐ কাজ অতি সহজসাধ্য। গোসাবায় গড়ে উঠল ভারতের প্রথম সমবায় সংস্থা। হ্যামিলটন সাহেব—অশিক্ষিত মানুষদের মাথায় এই চিন্তাটি ঢোকাতে পেরেছিলেন যে তরুণদের শিক্ষিত করা ও যুবকদের পরিপূর্ণ সমবায়-ভিত্তিক শ্রম বিনিয়োগের মধ্য দিয়েই ভারতের মত অনগ্রসর বিশাল দেশের অর্থ নৈতিক মুক্তি সম্ভব। এখানকার কৃষকেরা হ্যামিলটনের সাহায্য ও সহায়তায় গড়ে তুলেছিল অনেকগুলি কো-অপারেটিভ।

সমবায় পরিচালিত বিদ্যালয়, কো-অপারেটিভ কনজুমার্স-ষ্টোর্স, বিরাট ধর্মগোলা, কো-অপারেটিভ রাইস মিল। ফলশ্রুতি, বাংলার তথা ভারতের প্রাদেশিক রাজধানী সহরগুলিতেও যখন তেলের বাতি টিম টিম করে জ্বলছে তখন গোসাবা বিদ্যুতালোকে সমুজ্জ্বল। ১৯৩১ সালের আদম-সুমারিতে দেখা গেল সারা বাংলার শিক্ষিতের সংখ্যা যখন মাত্র শতকরা চার জন তখন গোসাবায় শিক্ষিতের হার শতকরা পঁয়তাল্লিশ। হ্যামিলটনের সহায়তায় অনুশীলন সমিতির সভ্যদের নিয়ে বেঙ্গল ইয়ংম্যানস্ জমিদারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়।*

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখাৎ ব্যক্তিরাও নাকি স্বাগত জানিয়ে-

---

*লেখক যখন পোষ্টাল ইন্‌সপেক্টর ছিলেন, তখন গোসাবা ডাকঘর পরিদর্শন করতে যেয়ে নিজে সুধাংশুবাবুর মুখে যেরকম শুনেছিলেন। তাঁরই ডাইরি থেকে উদ্ধৃত।

ছিলেন এই বিদেশীর পরিকল্পনাকে। রবীন্দ্রনাথ নাকি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন হ্যামিলটনের সাথে কিন্তু গান্ধীজীর সাথে বহু বিষয়ে তাঁর মত-পার্থক্য ছিল। গোসাবা স্টেটের প্রাক্তন ম্যানেজার বৃদ্ধ সুধাংশু-বাবুর মুখে শুনলাম তাঁর সঙ্গে ভারতীয় এই দুই মহামানবের প্রায়ই পত্র-বিনিময় হ'ত। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আহ্বানে জানিয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সমবায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন.

'প্রিয় স্যার ড্যানিয়েল,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। খুশী হয়েছি আপনার চিঠি পেয়ে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার নেই যে, একমাত্র এই ধরণের সমবায়-ভিত্তিক উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ভারতের মত দেশের অর্থনৈতিক দাসত্বের মুক্তি সম্ভব। আমার সীমিত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও চেষ্টা করছি ধারে-কাছের গ্রামের মানুষের মধ্যে আপনার মতবাদ প্রচার করতে। এবং সেই হিসাবে, সরকারের সমবায়-বিভাগের উদ্যোগে যুবকদের সমবায় শিক্ষাদানের জন্য একটি কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে স্থাপনের। আপনার প্রস্তাবকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই।.........

আপনার অনুগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

ড্যানিয়েল নাকি প্রায়ই কতকগুলি অদ্ভুত মন্তব্য করতেন। যেমন (১) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল ব্যারিষ্টারেরা মুখস্থ বিদ্যা, কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ও ধাপ্পা দিয়ে নিজের দু'পয়সা গোছাতে পারে ও বাইরে সুনামের সাথে দিন কাটাতে পারে কিন্তু চাষীর চাই প্রকৃত শিক্ষা, বসুমতী কখনও ধাপ্পারাজ্যের মেটারনিটিতে ফল প্রসব করেন না।

(২) কৃষককে বাঁচানোর জন্য শিল্পী, কৃষিকে বাঁচানোর জন্য শিল্প—, শিল্পকে বাঁচানোর জন্য কৃষি নয়। এর ব্যাখ্যা করে তিনি ব'লতেন,

দেশে কৃষির উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, হয়ে যাক কৃষি উৎপাদন অতিরিক্ত বেশী। দুধ, শস্য, মাছ, তরকারী হোক সারপ্লাস তখন সেই কৃষিজাত দ্রব্যকে সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য গড়ে উঠুক শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

ড্যানিয়েল সাহেব নেই। নেই গোসাবার সেই সুদিন। এল মহাযুদ্ধের হিড়িক। যুদ্ধের প্রধান কুফল নৈতিক অধোগতি ঢুকে গেল মানুষের মধ্যে। সমবায় চিন্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা। কো-অপারেটিভে সৃষ্টি হোল ফাটল। সাময়িক দু'চারজন ক'রল লাভ। রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীরা এসে ঢুকে পড়ল গোসাবায়, সৃষ্টি করল কো-অপারেটিভের ভিতর দলাদলি। ফলশ্রুতি, আজ গোসাবার সমস্ত কৃষক অন্যান্য জায়গার কৃষকের মতই অন্নহীন। 'ঋণ কাকে বলে একদিন গোসাবা জানত না, আজ গোসাবার চাষী সারা বাংলার চাষীদের মতই ঋণ নিয়ে জন্মায়—'

বাংলা দেশের এই নবজাগরণের সময় (১৯০৮ সাল) বাংলার হিতকামী একজন ইংরাজ স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটন (Sri Daniel Hamilton) সুন্দরবনে কৃষিকার্য কতখানি লাভজনক তা প্রমাণ করে বাঙালী যুবকদের চাকরির পরিবর্তে ওটাই জীবিকা-অর্জনের প্রধান উপায় বলে পরামর্শ দেন। তদানীন্তন হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও তাঁর হরিপালস্থিত জমিচাষের অভিজ্ঞতা থেকে তার সমর্থন করেন। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট বা সমবায় আইন প্রনয়ণ করেন। তারই সুযোগ নিয়ে ও হ্যামিলটন সাহেবের আন্তরিক সহায়তায় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ১৯০৯ সালে বেঙ্গল ইয়ংমেনস জমিদারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই হল বাংলায় দ্বিতীয় সমবায় সমিতি। এটি মুখ্যত: অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের নিয়েই গঠিত। সতীশচন্দ্র এর গঠনে ও সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তার কাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা

করেন। ডেনিয়েল সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ডের আদর্শ অনুকরণে বাংলায় সমবায় সমিতি গঠন করা। তিনি বাঙালী যুবকদের চাকরিমাত্র ভরসা করতে নিষেধ করতেন। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হতে উপদেশ দিতেন। তাঁর বদান্যতার বিষয় এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই কাজে সফলতার জন্য তিনি এক কোটি টাকা দান করতে চেয়েছিলেন। অপর দিকে অনুশীলন সমিতির সভ্যদের যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ডেনিয়েল সাহেব এই প্রতিষ্ঠান গঠনের সম্পূর্ণ ভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত করেছিলেন। বাংলা দেশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে উপযুক্ত বিবেচনা করেননি। ওই এক কোটি টাকাও এই সমিতির হস্তে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। বাঙালীর অন্ন-সমস্যার এটাই প্রকৃষ্ট উপায় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এটাই, তাঁর উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল।

হ্যামিলণ্টন সাহেবের যুগের তৈরী গেষ্টহাউসে আমরা জায়গা পেয়েছিলাম রাতটুকু কাটানোর। হাইস্কুলের হোষ্টেলেও হয়ত থাকবার ব্যবস্থা হ'ত। শঙ্কর এড়িয়ে গেল কেন বুঝলাম না, নিজে শিক্ষক হয়ে শিক্ষকের সাহচর্য ও সবসময়ই দেখেছি এড়িয়ে চলতে চায়।

নদীপথে পাখিরালা গোসাবা থেকে মাইল ছয় সাত। আগের দিন গোসাবা পৌঁছে মাঝিকে বিদায় দিয়েছিলাম বলে অমি ভোরে উঠে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাঁটা পথ ধরলাম। মাইল চারেক পথ, মাত্র একঘণ্টার একটু বেশী সময়েই এসে পৌঁছে গেলাম গোমর নদী ও পাখিরালা বা সজনে নদীর সংযোগের কাছে। এখান থেকে দক্ষিণ দিকের সজনে নদী পার হলেই রিজার্ভ ফরেষ্ট আরম্ভ হ'ল। নদীর পাড়ে ফরেষ্টের মধ্যে সজনেখালি ফরেষ্ট অফিসের বাংলো বাড়ী। পূর্ব দিকের গোমরের ওপারে হ্যামিলটন আবাদের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, নদীর ধারে একটি ছোট জলপদ ফরেষ্ট অফিসের নদীর মুখোমুখি

---

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস ( ৪র্থ সং ) পৃ ২২ জীবনতারা হালদার।

উত্তরপারে যে গ্রাম তার নাম পাখিরালা। মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট চালাঘর, এলোমেলো ভাবে তৈরী।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাঁকা হাঁকি করে প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় ফরেষ্ট অফিসের বাবুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম। ওরা একখানি ডিঙ্গি পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে গেল অফিসে।

ফরেষ্টবাবু ছিলেন না। গিয়েছেন ক্যানিং বনকর অফিসে কি সরকারী কাজে, ছোটবাবুও তাঁর সঙ্গে গেছেন। অফিসে আছেন খাকি সার্ট পরা ফরেষ্ট গার্ডবাবু ও জনকয়েক বোটম্যান। আমরা পরিচয় দিলাম। জানতে চাইলাম জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখা সম্ভব কিনা? পাখিরালা বার্ড-স্যাংচুয়ারী দেখার অনুমতিও চাইলাম। তার চেহারা দেখে ও ইংরেজী উচ্চারণ 'গুড মোরনিং' শুনেই বুঝে নিয়েছিলাম বিদ্যা ও পদমর্যাদার দৌড়, তবুও কাজ হাসিল করার জন্য রেঞ্জার সাহেব বলে সম্বোধন করে কথা বলেছিলাম। দেখলাম, কাজ হ'ল। তিনি নিজে তাঁদের ডিঙ্গি করে আমাদের অফিসের সামান্য পশ্চিমদিকে একটি বনের মধ্যে ঢোকা খাঁড়িতে নিয়ে এলেন। সেখানে গরাণ গাছের ডাল দিয়ে তৈরী একটা সাঁকো বেয়ে উঁচু মাচায় উঠতে হল। মাচায় দাঁড়িয়ে বনের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়, পাশেই পাখিরালা বার্ড-স্যাংচুয়ারী। আমরা শামুকখোল, ও আরও মাত্র দু'তিন রকমের কিছু পাখি দেখতে পেলাম। শুনলাম, আগে শীতকালে এখানে দলে দলে দেশ বিদেশের পাখি এসে ডিম পাড়ত ও গ্রীষ্মের সূচনায় উড়ে চলে যেত। গত দু'তিন বছর বনবিভাগের নারকেল গাছ লাগান প্রচেষ্টা সুরু হওয়ায় হৈ চৈ ও উপদ্রবের ফলে পাখি আসা কমে গেছে। গার্ডবাবু মনে করলেন তাঁকে যখন রেঞ্জার-সাহেব বলে সম্বোধন করছি তাঁর অন্ততঃ সাহেবের মত গাম্ভীর্য রাখা দরকার। তিনি গম্ভীর হয়ে আমাদের জানালেন, 'নিচে জঙ্গলের মধ্যে তিনি আমাদের ঢুকতে দিতে পারেন না, তাঁর তো একটা দায়িত্ব আছে। সুন্দরবনের বাঘ চোখের নিমেষে আমাদের মুখে পুরে উধাও

হয়ে যাবে। গোসাবা থেকে নদী পথে নৌকায় এলে বনের মধ্যে না ঢুকেও, সজনেখালি বনের চার পাশের নদী ঘুরে, নিরাপদে বনের শোভা খানিকটা উপভোগ করা যায়।

ফরেষ্ট গার্ডবাবু আমাদের সঙ্গে আধঘন্টাখানেক থেকে তাঁর ডিঙ্গিনৌকায় ফিরলেন ফরেষ্ট অফিসে। কাঠের বড় বড় খুঁটির উপর ১০ ফুট উঁচুতে পাটাতন করে তারই উপর অফিস। হঠাৎ বন্য জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। অফিসে এসে দেখি, জনা চারেক লোক অফিসের হাতায় বসে আছে। তাদের দেখেই গার্ডবাবু বলে উঠলেন, 'কি রে বাগের পো, টাকার জোগাড় হ'ল?' 'আজ্ঞে বাবু, সাতজেলের শচীনবাবুর কাছ থেকে হাওলাত করলাম। দেন, আজই লাইসেনটা করে, জ্যোৎস্নারাত গোনে গোনে বেরোয় পড়ি।' 'আপনারা একটু আমাদের অপিসের সামনে নদীর ধারে বেড়াতে থাকুন। সাবধান, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবেন না। আমি এদের পাশ কটা ইস্যু করে দিই, ওরা এখনই ওপার যাবে। ওদের ডিঙ্গিতেই আপনারা চলে যাবেন।' আমার দিকে মুখ করে বললেন গার্ডবাবু।

আমরা নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম, ওরা সবাই অফিসে ঢুকল।

মাত্র দশমিনিট সময়। বেরিয়ে এলেন সবাই, মুখে হাসি। গার্ডবাবু বললেন, 'বাগের পো, বাবুদের যত্ন করে ওপারে নিয়ে যা। সাথে করে নিয়ে গোমরের খেয়াটা পার করে দিস। বাবুরা খবরের কাগজের লোক, কলকাতা থেকে এয়েছেন, দেখিস যেন অযত্ন না হয়।'

ডিঙ্গিতে উঠলাম। অতি ছোট ডিঙ্গি, ছ'জন আরোহণ করায় জল কানার কাছে এল, কিন্তু দেখলাম ওরা পাকা মাঝি, দুখানা বৈঠার ঘায়ে তীরবেগে নৌকো ছুটিয়ে সজনে নদী পার করল। ডাঙ্গায় উঠে ওরা তিনজন আমাদের সাথে নেমে এল, একজন ডিঙ্গিটা নিয়ে এগোলো একটা খাড়ির দিকে। বললাম, 'চল ভাই কোনদিকে খেয়া ঘাট।'

'সেটা কি হয় বাবু। আমরা নাহয় ছোট জাত, জঙ্গল করে খাই, ভরতপুরে গাঁয়ে এসে না খেয়ে কোথায় যাবেন? আমাদের এখানে বাবু খাওয়ার কিছু নেই তবু দুটো মোটা চালের নুন-ভাত মুখে দিয়ে পিত্তিটাকে ঠাণ্ডা করা আর কি। খেয়াঘাট বেশী দূর নয়, পার হয়ে দু'ক্রোশ হাঁটা পথ। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরুলেও বেলা-বেলি গোসাবা পৌঁছে যাবেন। আজই যদি ফিরতে চান বাবু, সন্ধ্যে ৬-টার লঞ্চও পাবেন গোসাবা থেকে।'

প্রশ্ন করে জানলাম, বক্তার নাম নির্মল বাগ। নদীর পাড়েই ওর চালা। সঙ্গী অবিনাশ গায়েন ও বিজয় মণ্ডল। জঙ্গল করে খায়। অর্থাৎ জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করা ও কাঠ কেটে এনে বিক্রি করাই এদের জীবিকা। সাধারণ লোকের কাছে এরা মৌলী নামেই পরিচিত। নির্মল সরল লোক। আমাদের নিয়ে তার চালাঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসাল। অবিনাশ খালের দিকে মুখ ক'রে 'ফুফু ও ফুফু' বলে হাঁক দিল। তার ডাকে খালের ধার থেকে একহাতে খালুই অন্য হাতে গোল ছাকনি জাল নিয়ে এগিয়ে এল নির্মল-গৃহিনী। অবিনাশ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। অবিনাশের মুখের ফুফু শব্দ শুনে বুঝলাম, এরা হিন্দু হলেও এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কারের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান কৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে।

মোটা লাল চালের ভাত, মাছের ঝোল, দুধ ও মধু সহযোগে আহারাদি সেরে বিশ্রাম করতে বসে নির্মলের কাছে শুনলাম, 'সজনেখালি ফরেষ্ট অফিসের বড়বাবু বা বনকরবাবু হলেন নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। উনি আজ নেই। সিল্‌ভি কালচারিষ্ট আশুতোষ রায় ও তিনি বড়বাবুর সাথে ক্যানিং-এ কি সরকারী কাজে গিয়েছেন। গার্ড বাবুই আজ বড়বাবুর কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। ঐ যে অবিনাশ গায়েন, আমাদের সাথে পার হয়ে এল, ওর বাড়ী দয়াপুর। গত সাতাশ বছর ধরে মধুর কারবার করছেন। নির্মল আর বিজয় এই পাখিরালা গাঁয়েই থাকে, ওরা অবিনাশ গায়েনের মৌলী বা মুনিষ।

কারবারের আসল মালিক অবিনাশ। নির্মল অবিনাশের স্ত্রীকে গ্রাম সম্পর্কে পিসিমা বলে ডাকে। অবিনাশও নির্মলকে ছেলের মত স্নেহ করেন। নির্মলের বৌ অবিনাশের মেয়ের সমবয়সী বলে অবিনাশ তাকে উল্টে পিসি বা ফুফু বলে ডাকে।

মধুর কারবার সম্পর্কে নির্মলের মুখে শুনলাম: সরকারী নিয়ম অনুসারে মৌলীরা নিজেদের পাশ (লাইসেন্স) করে বনে ঢুকবে কাঠ বা মধু সংগ্রহ ক'রতে এবং বন থেকে বেরনোর সময় পাশ জমা দিয়ে আসবে। অন্য ভাবে বনে ঢোকা বা বেরুনো বেআইনী কাজ। ধরা পড়লে সাজা, জেল। মৌলীরা মোট যতটা মধু সংগ্রহ করবে তার অর্ধেক পাশ-এর সঙ্গে বনকর অফিসে জমা দিতে হবে। মৌলী তার জন্য সরকারের কাছ থেকে দাম পাবে টিন পিছু ২৫ টাকা হিসাবে। মোম যা কিছু সংগ্রহ হবে, সরকার নিয়ে নেবে ছ'টাকা ও তিন টাকা কেজি হিসাবে। বাকী অর্ধেক মধু মৌলী খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারবে।'

নির্মল সৎভাবে মধুর কারবারের হিসাব দিল—

চার জনের একটি দলের খরচ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪জন মৌলীর ৩৫ টাকা হিসাবে বনে ঢোকার পাশের ফি | | | ১৪০ টাকা |
| নৌকার রেজেষ্টারী ফি | ... | ... | ২ টাকা |
| ঐ ছই " | ... | ... | ১ টাকা |
| তিরিশটি খালি টিনের দাম ৪ টাকা হিসাবে | | ... | ১২০ টাকা |
| জলের জালা ৩টি, ৫ টাকা হিসাবে | | ... | ১৫ টাকা |
| হাঁড়ী কলসী | ... | ... | ১৫ টাকা |
| কাটারী চারখানা (১ বছরে প্রায় শেষ হয়ে যায়) | | | ২০ টাকা |
| ২টি আড়ি বা ধামা | ... | ... | ৪০ টাকা |
| চারজনের ছ'মাসের খোরাক | ... | ... | ৪০০ টাকা |
| বাড়ীর খোরাকী বা দাদন ৪ জনের ৬০ টাকা হিসাবে | | | ২৪০ টাকা |
| নৌকা ভাড়া | ... | ... | ৫০ টাকা |
| মোট খরচ | ... | ... | ১০৪৩ টাকা |

তার উপর মহাজনের কাছ থেকে এই হাজার টাকা নেবার সুদ, কমপক্ষে ২৫০ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট, তেরশ টাকা।

আইন মত বনকর-অফিসে জমা দিলে, আয় হয়:

| | |
|---|---|
| সরকারকে দেওয়া ১৫ টিন মধু ২৫ টাকা হিঃ | ৩৭৫ টাকা |
| „ ৫ কেজি ১নং মোম ৬ টাকা হিঃ | ৩০ টাকা |
| „ ১০ „ ২নং „ ৩ টাকা হিঃ | ৩০ টাকা |
| খোলা বাজারে বিক্রি ১৫ টিন ৭০ টাকা হিঃ | ১০৫০ টাকা |
| মোট | ১৪৮৫ টাকা |

অর্থাৎ চারটে লোকের দু'মাসের আয় মোট ১৮৫ টাকা। তার উপর এই কাজে মৌমাছির কামড় আছেই এবং প্রতি বছর বিশ পঁচিশ জন যায় সাপ আর বাঘের পেটে। কুমিরেও দু' এক জনকে নেয়।

'তবে এই কারবার করতে যাও কেন?'

'প্রথম কথা বাবু, সুন্দরবনের গরীব মানুষের আয়ের অন্য কোন উপায় নেই। আর ঐ যে হিসাব নিলেন, ওতো সৎপথে কারবার করার। আবাদ অঞ্চলে সব-কিছুই চলছে বে-আইনী। বাবু, আমরা অবিনাশ-পিসের দল, চার জন মৌলী ও এক খানা নৌকার পাশ করলাম; এর সাথে বনকর বাবুদের দিতে হ'ল চারশ টাকা প্রণামী। আমাদের অন্ততঃ আট দশটা দল এই চারখানা পাশ দেখিয়ে জঙ্গলে ঢুকে মধু জোগাড় করবে। একখানা নৌকা আইন মত জঙ্গলের মধ্যে থাকবে আর ছোট ছোট ডিঙ্গি দিনে-রাতে পাড়ি মারতে থাকবে। বাবুরা চারশ টাকা প্রণামী পেয়েছে বলে পিসের দলের নৌকা চোখের সামনে এলেও দেখতে পাবে না। দু'মাসে কম করে দুশ টিন মধু পাচার হয়ে যাবে, তারপর—একদিন পাঁচ টিন মধু অফিসে জমা দিয়ে ওরই অর্ধেকের দাম ও বাকী আড়াই টিন মধু সদর রাস্তা ধরে পিসে ফিরবে। বাবুদের চারশ টাকা দিয়ে পিসে চোদ্দ হাজার টাকা কামিয়ে নেবে। আমাদের অবস্থা পেটে-ভাতে। কারবারি দু'পয়সা

কামায়। বাবুদের কথা নাই বললাম, কিন্তু মৌলীর ছ'মাসের জন্য বাড়ীতে দিয়ে যায় গোটা-ষাটেক টাকা, খোরাকীর জন্য কাটা যায় একশ টাকা। ছ'মাসের চার টাকা হিসাবে মজুরী ২৪০ টাকার ১৬০ টাকা কাটা গিয়ে সম্বৎসরের প্রাণ-হাতে কামাই হয়, গোটা আশি টাকা।

কারবারি জঙ্গলে যান না, উনি থাকেন গ্রামে। ডিঙ্গি আসামাত্র তড়িঘড়ি মাল-পাচারের ব্যবস্থা করেন আর মৌলী চারটাকা রোজ পেয়ে সাপের মুখে বাঘের পেটে যায়। ঐ যে আমার পাশের চালায় বুড়ি বসে আছে, ওর ছ'দুটো ছেলে পর পর ছ'বছরে বাঘের পেটে গেল। তবুও পোড়া পেটের জন্যে ছোট টারে এবার আমাদের সাথে দিয়েছে। আর মাছির কামড়, ও তো আমাদের নিত্যকারের পাওনা।' বলে সে হাত দুখানা বাড়িয়ে দেখাল। মৌমাছির বার বার কামড়ে এক অদ্ভুত মনসা গাছের ডালের মত চেহারা হয়েছে।

নির্মল বাগ আমাদের গোমর নদীর খেয়া পার ক'রে মাঠের মাঝের পায়ে-চলা গোসাবার পথ ধরিয়ে দিল। বিদায় নেবার সময় আমার হাতে তুলে দিল কাগজ দিয়ে মুখ বাঁধা একটি মেটে ভাঁড়। বললে, 'একটু চাক ভাঙ্গা মৌ আছে বাবু, নিয়ে যান, বাড়ীর ছেলেপেলেরা খাবে।' পকেট থেকে টাকা বের করে দাম দিতে গেলে জিব কামড়ে উত্তর দিল 'বাবু, আমরা নীচু জাত মৌলী, তাই বলে কি মানুষ নই? আমাদের দূর গাঁয়ে অতিথি এসেছেন, একটুখানি মৌ, তারও দাম নেব?'

দু'জনে পথ চলেছি, অন্য জনপ্রাণী নেই। শঙ্করের হাতে ভাঁড়টি দিলাম। ও হাতে নিয়ে হঠাৎ বলল, 'সুন্দরবনের খাঁটি মধুর স্বাদ নোনতা।'

একটু থেমে আবার বলল, 'আপনার সঙ্গে আর বেড়াতে বেরবো না। কি দরকার ছিল আমাদের এই-সব বেচারীদের সুখ দুঃখের কথা শুনে। আপনিও তেমনি, কোথায় মাঝির মা-বাপ মরল দাঙ্গায়,

কোথায় গোসাবার চাষীরা ঋণ বুকে নিয়ে মরে, কোন মৌলীর কি ব্যথা, স্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবেন। খিদের মুখে তখন দুধ-মধু দিয়ে ভাত খুব আনন্দে খেয়েছিলাম, এখন মনে হচ্ছে মৌলীদের চোখের জলে মধু নোনতা হয়ে গেছে। এর চেয়ে ভালো, টাকা ফেলে সরকারী লাকসারী লঞ্চে চেপে মাতলা নদী দিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে গেলাম, বেয়ারা ট্রে করে চা খাওয়াল। কানে শুনতে লাগলাম রেডিও, সেই বেশ ভাল সুন্দরবন দর্শন। আর মধু খেতে হল রাইটার্স বিলডিং-এর গেট থেকে কিনে নিলেই হয়।'

বুঝলাম, শঙ্কর শিক্ষক হলেও ভিতরে একটা সংবেদনশীল মন আছে। কিন্তু বর্তমান যুগের ভ্রমণ-বিলাসীদের মত সেও হৃদয়বৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে ভ্রমণকে বিলাস হিসাবে দেখতে চায়। ওদের কাছে ভ্রমণ —জ্ঞান আহরণ করার জন্যে নয়, মানুষে মানুষে আত্মিক সম্বন্ধ গড়ার জন্যে নয়, ওদের ভ্রমণ শুধুমাত্র নিত্যকার জীবনের একঘেঁয়েমির মাঝে একটু বৈচিত্র্য পাবার চেষ্টা, নিছক হালকা আমোদ মাত্র।

গোসাবা থেকে ফেরার পর এক মাসও পার হয় নি, এক শনিবার সন্ধ্যায় সবান্ধব শংকর ফের এসে হাজির।

'চলুন আগামীকাল ফুলিয়ায়। ফার্স্ট ট্রেন ধরতে হবে কিন্তু।

'সেকি! গোসাবার মাঠের মাঝে আসতে আসতে প্রতিজ্ঞা ক'রলে আমার সাথে আর বেরুবে না—'

শংকর হো হো করে হেসে উঠল। 'সেই কথা মনে করে বসে আছেন। আমাদের প্রতিজ্ঞা ভুষুণ্ডির কাকের মত। ভুষুণ্ডির মাঠে গাবগাছে কাকের বাস। পাকা গাব দেখামাত্র ঠুকরে খেতে আরম্ভ করে যেই গাবের বিচি গলায় আটকে যায়, বলে :

আর গাব খাব না, গাব তলায় যাব না।' কিন্তু যেই মাত্র বিচিটি গলা থেকে বেরিয়ে যায় অমনি বলে ওঠে :

'গাব খাবনা খাব কি'. গাবের মত আছে কি ?'

উচ্চ হাসির মধ্যে চা-পর্ব আরম্ভ হল।

## ছয়

ফুলিয়া

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য মাঘমাস,
তিথি মধ্যে জনম লইনু কৃত্তিবাস"

শ্লোকটি উচ্চারণ ক'রে শংকর যুক্তি দিতে লাগল, 'যোগেশ বিদ্যানিধি মশায়ের জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী দিনটি ছিল রবিবার, শ্রীপঞ্চমী ও মাঘমাস। অতএব কৃত্তিবাসের জন্ম-সাল ১৩৫৭। সঙ্গী নারায়ণবাবুর যুক্তি উল্টো, কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে তাঁর জন্মের সাল উল্লেখ করেননি বটে কিন্তু পুঁথির এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের প্রেরণাতেই তিনি রামায়ণ লিখতে উৎসাহিত হন। রাজা গণেশ ছিলেন সেই যুগের একমাত্র হিন্দু গৌড়েশ্বর, তাঁর রাজত্ব কাল মাত্র দু'বছর, ১৩৩৭ থেকে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দ। তখন তাঁর বয়স যদি আঠারো বা কুড়ি বছরও হয় তা হলেও কৃত্তিবাসের জন্ম সন ১৩৫৭ হতে পারে না, হবে ১৩৫৭ বা তার কাছাকাছি। কারণ, হিন্দু রাজা ছাড়া মুসলমান কোন রাজার পক্ষে রামায়ণ লিখতে কৃত্তিবাসকে উৎসাহিত করা স্বাভাবিক নয়। শান্তিপুর লোকালে বসে দুই বিদগ্ধ পণ্ডিতের যুক্তি শুনতে মন্দ লাগছিল না। হঠাৎ পাশ থেকে ময়লা জামা-কাপড় পরা এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবু, আপনারা কোথায় যাবেন?'

'ফুলিয়া। কৃত্তিবাসের জন্মভিটা দেখতে।'

'তাই বলেন ফুলেয়, না-বয়ড়ায়?'

বৃদ্ধের কথায় আলোচনায় বাধা পড়ল, ফুলেয় না বয়ড়ায় বলে

আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আমরা যাচ্ছি ফুলিয়ায় যেখানে কৃত্তিবাসের জন্মভিটা।' বললে শংকর। জবাবে বৃদ্ধ বললেন, 'সেই কথাই তো বলছি বাবু। আপনাদের মত লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত লোককে আমাদের বড় ভয়, আপনারা হয়কে নয় করেন আর নয় কে হয় করেন। বছর বিশেক আগে কলকাতা থেকে এক ডজন জ্ঞানী-গুণী লেখাপড়া-জানা লোক এলেন, মিটিং হোল। তারপর তাঁরা কথায় ফুলঝুরি উড়িয়ে ঠিক করে দিলেন, রামায়ণ-লেখা কৃত্তিবাস ঠাকুর জন্মেছিলেন ১৯৫৫ সালে। গেলে দেখবেন সেই কথা লিখে একখানা পাথরও বসিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার আপনারা পণ্ডিত মানুষেরা চলেছেন। একজন বলছেন ১৯৫৫ আর একজন বলছেন ১৯৫০। কি জানি কবে হয়ত আর কোন পণ্ডিত বলবেন কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন আরও তিনশ বছর আগে। আমরা ওই ওঝা ঠাকুরদেরই দেবোত্তর ভিটেবাড়ীর প্রজা, তাঁত বুনে খাই। আমরা জানি, আমাদের গাঁয়ের নাম বয়ড়া। আমাদের জমির পাট্টা, কবুলিয়তেও তাই লেখা। বাপ-পিতেমোর সময় থেকে শুনে আসছি ফুলিয়া গ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বাড়ুয্যে ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) বামুনেরা বাস ক'রত। তাঁদের সাথে আমাদের বয়ড়া গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রের মুখুজ্যেদের রেশারেশি চিরকাল। নৃসিংহ মুখুজ্যের ছাত্র ছিল ফুলের বাড়ুজ্যেরা, তবু কোনদিন নৃসিংহ ঠাকুর নাদা, ধাঁধাঁ, মুলুক জুড়ী দোষের জন্য ফুলিয়ার মাটি মাড়ায়নি আর কিনা আপনারা লেখাপড়া-জানা লোকেরা বই-কেতাবে সর্বত্র লিখছেন, ফুলিয়াতে কৃত্তিবাসের জন্ম। আপনাদের অসাধ্য কর্ম নেই, কবে আপনারা বলবেন, সূর্ষ্যি ঠাকুর রোজ সকালে উত্তর দিক থেকে ওঠেন। বললেই হোল, যত্ত সব—' মুখখানি একটু বিকৃত করে ঘুরে বসলেন বৃদ্ধ।

নারায়ণবাবু খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। তিনি বৃদ্ধকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে তাঁর কাছ থেকে ধীরে ধীরে অনেক তথ্য বের করলেন। বৃদ্ধ নিজে জাতিতে তাঁতি হলেও স্থানীয় সমস্ত জাতি-ধর্মের লোকের

জাতি, গোত্র, কুল আচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এক কথায় সেকেলে গ্রামের মোড়ল। তাঁর কাছেই শুনলাম, ব্রাহ্মণকুলের এক ইতিহাস। বৃদ্ধের সামাজিক তথ্যের শ্লোক-কাহিনী সব যেন কণ্ঠস্থ।

'মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ আনেন ও তাঁদের বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এর প্রায় তিনশ বছর পরে বল্লাল সেন এঁদের বংশধরদের কৌলীন্য মর্যাদা দেন। পরবর্তীকালে কুলীনদের মধ্যে অনেক রকম দোষ ঢুকে পড়ে। পঞ্চদশ শতকে দেবীবর ঘটক এক-এক রকম দোষযুক্ত কুলীনদের এক-এক দলভুক্ত করে এক-এক মেলের নামকরণ করেন। তখন ফুলিয়া ছিল শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এঁরা হলেন ফুলিয়া বা ফুলে মেল। নাদা, ধাঁধাঁ, মুলুকজুড়ী ও বারুইহাটি এই চারটি দোষের সমন্বয়ে ফুলিয়ামেল গড়া হয়। বর্ধমানের নাদা গ্রামের বংশজের মেয়েকে বিয়ে করে মনোহর দোষদুষ্ট হন। শ্রীনাথ চাটুয্যের মেয়ে বাঁধাঁঘাটে জল আনতে যেয়ে ঝড়বৃষ্টি হবার জন্য কাছের এক মুসলমান বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই মেয়েকে বিয়ে করে গঙ্গাধর বাড়ুয্যে যবন-দোষে দুষিত হলেন, একে বলে ধাঁধাঁ দোষ। এই রকম আর কি—, বলেই বৃদ্ধ এণ্ডু মিশ্রের এক শ্লোক বললেন:

ফুলে-মেলের কারিকা হোল—
"নান্দা ধান্দা বারুইহাটি পাইয়া মূর্ছিত,
নানা দোষে শ্রীনাথ ক্ষেম্য দেখিতে কুৎসিত
নাথাই চট্টোর কন্যা হাসাই খানদায়ে,
সেই কন্যা বিয়া করে বন্দ্য গঙ্গাধরে।
কাটাদিয়ার শ্রীনাথ বন্দ্যো ক্ষেম্যতার পরে,
মুলুকজুড়ী ভ্রাতৃ পুত্র শিবাচার্য বরে।
এই সকল দোষে ফুলিয়া-এণ্ডু মিশ্র ঘোষে
শ্রীনাথ হইল পালটি সমাজগত দোষে।"

ভরদ্বাজ গোত্রের মহর্ষি শ্রীহর্ষক থেকে ষোড়শ পর্যায়ের বংশধর নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় ফুলিয়ার সওয়া ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গঙ্গাতীরে বয়রা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ও টোল খোলেন। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং চার বেদে সমান অধিকারী চতুর্বেদী। সারা বঙ্গদেশ তথা কাশী ও কনৌজ থেকেও তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বেদের পাঠ নিতে আসতেন, এজন্য তিনি উপাধ্যায় বলে কথিত হতেন। মুখে মুখে উপাধ্যায় থেকে তাঁর বংশধরেরা উপাধ্যায় বা ওঝা বলে কথিত হলেন। নৃসিংহের পৌত্র মুরারীও বিখ্যাত ওঝা বা উপাধ্যায় ছিলেন। মুরারী ওঝার পৌত্র হলেন কবি কৃত্তিবাস। মুরারী ওঝার কাছে দলে দলে ফুলিয়ার ছাত্র বেদ পড়তে আসতেন, কিন্তু তিনি সমাজ-দোষ এড়ানোর জন্য কোনদিন ফুলিয়ায় পদার্পণ করেন নি, এমনকি যাতায়াত করতেন গঙ্গা পার হয়ে গুপ্তিপাড়া দিয়ে। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস, মুরারী ওঝার এক পৌত্র লক্ষ্মীধরের পৌত্র গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় বিয়ে করেন ঐ ফুলেমেলের বাড়ুয্যে বাড়ীতে আর দুনিয়ার লেখাপড়া-জানা লোকের মুখে কৃত্তিবাসের জন্মভূমি হল ফুলিয়া, যেখানকার মাটিতে তিনি ভুলেও কোনদিন পা দেন নি।' ঐ বৃদ্ধের মুখেই শুনলাম: 'শাণ্ডিল্য গোত্রের ভট্টনারায়ণের বিশতম বংশধর ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের কানুনগো ছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে অভিযানের সময় গোপনে অনেক সাহায্য করেন। এই জন্য মোগল-সম্রাটের কাছ হতে বিশখানা পরগণার জমিদারী পান। ভবানন্দের ছেলে গোপাল রেউই গ্রামে রাজধানী করেন ও নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর। রাজার সাহায্য লাভের আশায় লোক ঐ দিকে

*"বেদ-বাণাঙ্ক-শকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছাণ্ডড়ো বেদগর্ভকঃ॥
অথ শ্রীহর্ষনামা চ সাগ্নিক বংশ সম্ভবাঃ।
আয়তাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জ প্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহ পুত্রৈশ্চ সহভৃতৈশ্বতে তথা॥—(কুলমিশ্র)

চলে পড়ল ফুলিয়ার বড়লোক ও পণ্ডিতেরা চলে গেল কেষ্টনগরের দিকে। তার উপর এল ম্যালেরিয়া রাক্ষসী। গ্রাম দিল উজাড় করে। বয়ড়া হল মনুষ্যশূন্য জঙ্গল। ফুলিয়াও হল জনবিরল। ইংরেজ এল, শান্তিপুর অবধি রেল হোল, তখনও ফুলিয়া জনবিরল। ছোট্ট রেলষ্টেশন নামেই ছিল, বাজার বা হাট ব'সত হপ্তায় দুদিন। টিম টিম করে দুটো কেরোসিনের বাতি জ্বলত। মাত্র একটা চায়ের দোকান ছিল সম্বল। দিনে রাতে দুটো ট্রেন চ'লত। একটা কাঁচা রাস্তা ছিল শিমুলিয়া নবলা অবধি বিস্তৃত।

……১৯৪৭ সালের পর ফুলিয়ার আবার রূপ বদলের পালা সুরু হোল। তৈরী হল পীচ-ঢালা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। উদ্বাস্তু স্রোতে ঘুমন্ত ফুলিয়া জেগে উঠল। এখন দিনে রাতে বাইশখানা ট্রেন যাতায়াত করে। জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রাইভেট মটর বা লরী যাতায়াতের তো সীমা-সংখ্যা নেই। এই পথ দিয়ে ফুলিয়া হয়ে ঘন ঘন চলেছে বাস, শুধু স্থানীয় নয় কলকাতা থেকে উত্তর-বাংলার সব বাসও চলে এখন এই পথে।

আমরা ষ্টেশনে নেমে প্রথমেই গেলাম স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কৃত্তিবাস সাহিত্য-পরিষদের সহ সভাপতি, সদানন্দ সিকদার মহাশয়ের বাড়ী। ইনিও পূর্ববঙ্গাগত কিন্তু উদ্বাস্তু নন, বরং বলা যায় দেশত্যাগের ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৫০ সাল থেকে সরকারী সহযোগীতায় ফুলিয়ায় বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছে। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, দিকে দিকে পাকা পীচের রাস্তা, টেকনিক্যাল স্কুল, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক উচ্চ বিদ্যালয়, টেলিফোন যোগাযোগ সমেত ফুলিয়া কলোনী নামে বিরাট ডাকঘর প্রভৃতি সহর জীবনের সমস্ত সুযোগ ফুলিয়া কলোনীতে আছে। শান্তিপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের অফিসও ফুলিয়ার হওয়ায় সরকারী সুযোগ-সুবিধা শান্তিপুরের লোকদের চেয়ে ফুলিয়া কলোনীর লোকেরা অনেক বেশী আদায় ক'রে নেয়।

সদানন্দবাবু সত্যই সদানন্দ। তিনি আমাদের দেখে হাসিমুখে আন্তরিক ভাবে জড়িয়ে ধরলেন।

'দেরী করতে পারব না। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন।'

সদানন্দবাবুর শরীর ভাল ছিল না, তবুও তিনি আমাদের সাথে নিয়ে ফুলিয়া কলোনী ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য তৈরী হয়ে নিলেন। তিনি মোটেই দেরী করলেন না কিন্তু সদানন্দ-গৃহিণীর মুড়ি, নারকেল-কোরা, দু'রকম মিষ্টি ও চা-সহযোগে গুরু-জলযোগের ব্যবস্থা করায়, সেগুলির সদ্‌ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু সময় দিতে হোল।

১৯৪৭ সালের পর থেকে কয়েক হাজার পূর্ববঙ্গাগত পরিবার ফুলিয়ায় এসে নোতুনভাবে ডেরা গেড়েছেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার ও বিভিন্ন বৃত্তির লোক থাকলেও ময়মনসিংহ ও ঢাকার বসাক সম্প্রদায়ের লোকেরাই সংখ্যাগুরু। এদের পেশা তাঁতশিল্প। আধুনিক ফুলিয়া মূলতঃ তাঁতশিল্পের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। লাইনের দুধারে দু'টি বড় তাঁতিপাড়া। উত্তরে ফুলিয়া কলোনী ও দক্ষিণে বসাকপাড়া নামে পরিচিত, যদিও দু'পাড়াতে বসাকদেরই সংখ্যাধিক্য। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় মুসলমান যুগের প্রথম থেকেই এক নিজস্ব বয়ন-শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল। এখানকার প্রায় সব বয়ন-শিল্পীই সেই কাজে বেশ ওয়াকিবহাল। এক কথায় বলা যায়, ফুলিয়া স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার টাঙ্গাইলে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন বৃদ্ধ শিল্পীকে দেখলাম যাঁরা জামদানী সাড়ীর নক্সা নিজেরাই করতে পারেন। ফুলিয়ায় সাধারণতঃ আমেদাবাদ মিলের একশ কাউণ্টের সুতার চলনই বেশী। একশ কুড়ি কাউণ্টের কাজ মহাজনের অর্ডার না থাকলে বড় একটা করা হয় না, কিন্তু অনেকেই একশ কাউণ্ট বললেও টানায় আশি কাউণ্ট ভেজাল হিসাবে চালিয়ে দেয়। কাপড়ের পাড়ে থাকে নক্সা ও জরীর কাজ এবং কাপড়ের গায়ে বুটি তোলা। স্থানীয় ভাষায় এই সাড়ী 'জ্যাকেট' নামে পরিচিত। এখানকার তাঁতিদের চলতি

ভাষায় যে সব সাড়ীর পাড়ে নক্সা থাকে না সেগুলি 'মাটা' নামে পরিচিত। ফুলিয়া কলোনী ও বসাক পাড়ায় প্রায় সবই জ্যাকেটের কাজ। মাটার কাজ নেই বললেই চলে। শিল্পগত উৎকর্ষের বিচার করলে ফুলিয়ার তাঁতীদের হাতের কাজ খুবই উন্নত পর্যায়ের, কিন্তু তাঁতীদের শতকরা নব্বই জনেরই আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়।

সদানন্দবাবুর মুখে শুনলাম, ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এখানের তাঁতশিল্পের অবস্থা সুতো ও মূলধনের অভাবে খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া মাত্র কিছু কিছু তাঁতি পূর্ব বাংলায় ফিরে গেছে। ১৯৭২ থেকে বড়বাজারের মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ধনীরা মূলধন যোগাচ্ছে। এরা একটা সময় দাদন দেয় ও সারাবছর তাঁতীদের উৎপাদন খুব কম দামে নিয়ে নেয়। ফলে তাঁত-শিল্পে কাজ বাড়লেও তাঁতীরা অনাহারে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছে। লাভের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, আমেদাবাদ অঞ্চলে। সদানন্দবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, ব্যাঙ্ক ও পশ্চিম বাংলা সরকার কেন এদের সাহায্য করছে না। জবাব সদানন্দবাবু দিতে পারেন নি, পরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-এর একজন অফিসারের মুখে শুনলাম। মূল চাবিকাঠি কেন্দ্রীয় সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকারের হাতে। তারা সুতো না দিলে কাজ বন্ধ। ইউ. বি. আই. কোন কোন মধ্যবিত্ত তাঁতীকে টাকা ধার দিয়েছিল কিন্তু তারা ন্যায্য মূল্যে সুতো না পেয়ে ক্রমে ক্রমে সর্বহারা হয়েছে। ব্যাঙ্কের ঋণও শোধ দিতে পারেনি, ফলে তাঁত নিলেম হয়ে গেছে। বড়বাজারের মালিক শ্রেণীর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের আমদানী বিভাগের পরিচিতি একটু ঘনিষ্ঠ, ফলে কলকাঠি নাড়ার ক্ষমতা তাঁদেরই। বসাকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা কলকাতা বড়বাজারের যোগানদার দালালদের কাজ করে প্রচুর আয় করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ও দু'চারজন তাঁতীকে নিয়ে দু'একটা সমবায় গড়ে দিয়ে মাড়োয়ারী মালিক নেপথ্যে থেকে সমবায়ের নামে সরকারী সুযোগ-সুবিধা,

ব্যাঙ্কের ঋণের সুযোগ প্রভৃতির সম্পূর্ণ রসটুকু নিঙড়ে নিচ্ছে : সমবায়গুলি সাইন বোর্ড মাত্র।

তাঁত শিল্পের কথায় জানা গেল, ফুলিয়া থেকে আরম্ভ করে শান্তিপুর এলাকার জাতীয় সড়কের দু'পাশের গ্রামেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁতীরা এসে নূতন করে বসতি স্থাপন করেছে। যেমন তারাপুর, চাঁপাতলা, ঘোড়ালিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বর্তমানে কয়েক হাজার পূর্ববঙ্গাগত তাঁতীর বাস। তবে বিভিন্ন গ্রামের বয়নশৈলী বিভিন্ন। অধিবাসীরাও এসেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। যেমন ঘোড়ালিয়ায় জ্যাকেটের কাজ নেই বললেই চলে, সবই মাটার কাজ। আবার চাঁপাতলা ও তারাপুরের মোড়ে বা বয়ড়ার জ্যাকেটের কাজ কিছু কিছু হলেও, পাড়ে জরীর ব্যবহার খুব কম। এখানে সুতীর পাড়ে টাঙ্গাইল সাড়ীর মত নক্সার কাজ হয়। ঘোড়ালিয়ার বর্তমান অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশ এসেছে যশোর ও খুলনার নড়াইল, ফুলতলা, সিদ্ধিপাশা, এলাকা থেকে।

সদানন্দবাবু আমাদের ফুলিয়া কলোনী ঘুরিয়ে দেখিয়ে, বাজারের পাশ দিয়ে এসে হাজির করলেন জাতীয় সড়কের মোড়ে। এখানেই বাস থামে। ২০।২৫ মিনিট পর পর বাস চলাচল করে। বাসে মাইল দেড়েক যেয়ে শান্তিপুরের দিকে রাস্তার বাঁ দিকে প্রায় পৌণে এক মাইল হেঁটে গেলে বয়রা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কৃত্তিবাসের জন্মভিটা বটগাছের তলায় শ্বেতপাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। গায়ে লেখা রয়েছে :

"মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব ১৪৪০ খৃঃ মাঘ মাস
শ্রীপঞ্চমী রবিবার
হেথা দ্বিজোত্তম, আদিকবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থ
হে পথিক সম্ভ্রমে প্রণাম।"

স্মৃতিস্তম্ভের উত্তর দিকে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ

মাঠের পাশেই একটি বহুদিনের পুরান ইঁদারা, গায়ে লেখা: 'কৃত্তিবাস কূপ।'

স্মৃতিস্তম্ভের পাশের বটগাছটির গোড়া বাঁধান, তার গায়েও শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা আছে:

"এই বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া কবি কৃত্তিবাস তাঁহার প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচনা করিয়াছিল।"

রেবতীবাবু বিজ্ঞানের শিক্ষক, সব কিছুকেই একটু সন্দেহের চোখ নিয়ে যাচাই করে দেখেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন, 'কৃত্তিবাস অন্ততঃ পাঁচশো বছর আগে রামায়ণ লেখেন। তার উপর ছায়াওয়ালা গাছের তলায় বসতে হলে তখন গাছের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর। তা হলে এই গাছের সাড়ে পাঁচশো বছর বয়স হওয়া উচিত। কিন্তু এই গাছ দেখে কি পুরানো গাছ বলে মনে হয়?'

নলিনীবাবু উত্তর দিলেন, 'দু'ঘণ্টা রোদে ঘুরে যা অবস্থা হয়েছে তাতে কৃত্তিবাস শীতল ছায়ায় বসে রামায়ণ লিখুন আর নাই লিখুন, আমি অন্ততঃ চাই দর্শকেরা এর শীতল ছায়ায় উপবেশন করুন। এই বলেই তিনি গাছের বাঁধান গোড়ায় বসে পড়লেন।

একসময় এই বটগাছের সামনে দিয়েই ভাগীরথী বয়ে চলত। এখন প্রায় আধ মাইল দূরে সরে গেছে। নদীর চড়ায় ধানের সমারোহ। তার উপর দিয়ে ফুরফুরে বাতাস বয়ে আসছে। বট-গাছের ছায়ায় বসে বা কাত হয়ে শুয়ে পড়ে সবারই চোখ বুজে আসতো যদি না ভেতর থেকে ব্রহ্মাদেব জ্বালা সৃষ্টি করতেন।

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে ১৩৭০ সালে। সুন্দর একতলা বাড়ী, সামনে ফুলের বাগান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, রবিবারে এই পাঠাগার ও সংগ্রহশালা বন্ধ থাকে। বাইরের অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখেই আমাদের ফিরতে হোলো, ভিতরের রূপ দেখা হোলো না।

এরই অল্প দূরে একদা ফুলিয়ায় বিখ্যাত শ্মশান ও হরিদাস-ঠাকুরের ভজনস্থলী। নদী সরে যাওয়ার ফলে প্রায় তিনশো বছর আগের শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে। শুধু তার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পড়ে আছে কৃত্তিবাসের ফুল-সমাধি। স্থানটি মনোরম। বড় বড় কয়েকটা আম, বেল, নিম ও অশ্বত্থ গাছে ঢাকা শান্ত পরিবেশে একটি ছোট কুটুরিতে দুটি ভক্তের বিগ্রহ, সামনে ছোট নাটমন্দির। পাশেই নিমগাছের তলায় মহানাগের গোফা। প্রাচীন নিমগাছের গোড়াটি বাঁধানো, তার উপর শ্বেতপাথরে ঠাকুর হরিদাসের ফুলিয়া লীলার কাহিনীর কিছু অংশ কবিতা ছন্দে খোদিত—

"মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল.
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল।
ভাসিতে ভাসিতে আইলেন ফুলিয়া নগরে,
কৃষ্ণ নাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে।
এক মহানাগ ছিল গোফার ভিতরে,
ফুলিয়াবাসী সবে কয় গোফা ছাড়িবারে।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত কাহিনীর মর্মার্থ হচ্ছে : 'ঠাকুর হরিদাস পূর্ব জন্মে ছিলেন ঋচীক মুনির ছেলে। তুলসী পাতা তুলে না ধুয়েই বাবাকে দিয়েছিলেন বলে ঋচীক মুনি অভিশাপ দিলেন—যবন হয়ে জন্মাও। অভিশপ্ত হয়ে যবনরূপে যশোর জেলার বুঢ়ন গ্রামে জন্মালেন। শান্তিপুরে বাসকালীন তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান, উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম, নৃত্যকীর্তন করতেন। যবন হ'য়ে হিন্দু-আচার করার জন্য স্থানীয় কাজী ফৌজদারের কাছে নালিশ করলেন। ফৌজদারের অনুরোধেও হ'রিদাস নাম গান ত্যাগ না করায় হুকুম হোলো বাইশ বাজারে নিয়ে কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করতে হবে। পাইকেরা ফৌজদারের আদেশে হরিদাসকে একের পর এক বাইশটি বাজারে নিয়ে চরমভাবে বেত মারলেন। হরিদাস মরলেন না। তার মুখে দুঃখের ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না।

হাসিমুখে তিনি হরিনাম করছেন, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তাকে বেত মারার জন্য যবন-পাইকদের কোন অমঙ্গল না হয়। পাইকরা বিস্মিত হোলো। যে ভাবে তাকে বেত মারা হয়েছে তাতে অতি শক্ত লোকও অনেক আগেই মরে যেত, কিন্তু হরিদাস মার খেয়েও হাসছে। পাইকরা হরিদাসকে বললো—'ঠাকুর তুমি তো মরলে না, কিন্তু আমাদের মরণ নিশ্চিত। তোমাকে মেরে ফেলতে না পারার জন্যে ফৌজদার আমাদের গর্দান নেবেন।' হরিদাস হেসে বললেন, 'আচ্ছা তাহলে মরছি।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ চিন্তা করে সমাধিস্থ হোলেন। সমাধিস্থ দেহকে মৃতদেহ ভেবে কাজী বললেন, 'কবর দিলে এই ধর্ম-বিরোধী উদ্ধার পাবে, ওকে জলে ভাসিয়ে দাও; যেন চিরকাল কষ্ট পায়।' তাঁকে মরা ভেবে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হোলো। তিনি ভেসে এসে ফুলিয়ায় পৌঁছলেন। ধ্যানভঙ্গ হলে সামনে এক গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। ঐ গর্তে এক মহাসর্প বাস করত। সে হরিদাসের কোন ক্ষতি না করে নিজেই গুহা ত্যাগ ক'রল।'

চারিদিকে গাছে-ঢাকা ছায়া শীতল নির্জন হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলীতে দাঁড়িয়ে মনে হোল, আমরা যেন সেই পঞ্চদশ শতকে ফিরে গিয়েছি। স্কুলের পাশে একটি মাত্র ছোট্ট খাবারের দোকান তার উপর রবিবার ছুটির দিন বলে দোকানদারও অতি সামান্যই যোগাড় করেছিল। ঐ দোকানে যা-কিছু পাওয়া গেল তাই দিয়েই সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি করে আমরা ফিরে এলাম জাতীয় শড়কের মোড়ে। পাশেই একটি চায়ের দোকানে শুনলাম এই মাত্র একখানা বাস চলে গেল ফুলিয়ার দিকে, পরবর্তী বাস আধ ঘণ্টা পর। সকাল-বিকাল কুড়ি মিনিট পর-পর বাস চললেও দুপুরের দিকে সময়ের ব্যবধান একটু বেশী হয়।

কানে আসছিল একটানা মাকুর খট্ খট শব্দ। দোকানের সামনে না দাঁড়িয়ে থেকে পাশের একটি বাড়ীতে ঢুকলাম সাড়ী তৈরী

দেখতে। এখানে মাটার কাজই বেশী। ঐ বাড়ীতে দেখি সংসারের সবাই কাজ করছে। বৃদ্ধ গৃহকর্তা ও আর একজন বেতনভুক কর্মচারী তাঁত বুনছে। গৃহণী দেখি সুতোয় রং করছেন। একটি ছোট মেয়ে সাটাইয়ে সুতো জড়াচ্ছে। আমাদের আহ্বান জানাল বৃদ্ধের ছেলে ২২।২৪ বছরের নওজোয়ান, একটু-আধটু লেখাপড়া জানে মনে হোল। সে আমাদের দেখেই বললে, 'মাল নিতে হলে বাবার সাথে কথা বলুন, কিন্তু মাল পেতে দু'হপ্তা দেরী হবে। শান্তিপুর হাটের অর্ডার ছিল, আমি মাল দিতে যাচ্ছি, আগামী দিন-দশেকও ঐ মহাজনের মাল দিতে হবে।' বুঝলাম সে আমাদের কলকাতার খরিদ্দার মনে ক'রেছে। আমরা কোন কথার জবাব দেবার আগেই সে এক গাঁটরি কাপড় সাইকেলের কেরিয়ারে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধের সাথে কথা বলে জানলাম, তার আদি বাড়ী ছিল খুলনা জেলার ফুলতলা থানার অধীন এক গ্রামে। দেশে গামছা বুনত। এখানে এসে প্রথমে কিছুদিন ছিল ফুলিয়ার সরকারী আশ্রয় শিবিরে। সেখানে থেকেই সে টাঙ্গাইলের মাটার কাজ শিখে নিয়েছে। জ্যাকেটের কাজ খুব কঠিন, চেষ্টা করেও শিখতে পারেনি। তারপর—পুনর্বাসনের কিছু টাকা ও এই জমি পেয়েছিল। ঘরবাড়ী না করে কোন মতে খড়-ছাওয়া চালা করে একখানা তাঁত কিনে কাজ আরম্ভ করে ও রবিবার-রবিবার শান্তিপুর হাটে নিজে হাতে মাল বেচে আসে। মহাজনের দাদনের পাল্লায় পড়েনি। সেইজন্য কোন মতে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন ছেলে বাইরে কেনা-বেচার কাজ করে, বৃদ্ধ বাড়ীতেই থাকেন। তাঁতীর মেয়ে এখনও কন্যাপণ দিয়ে ঘরে আনতে হয়। টাকা সঞ্চয় করতে পারছে না বলে ছেলেটির বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিতে পারছে না। ঘোড়ালিয়ার অক্ষয় বসাকের মেয়েটি পছন্দ, কথাবার্তা চলছে, কিন্তু পণের শ' পাঁচেক টাকার জন্য দেরী হচ্ছে। দূরে বাসের হর্নের আওয়াজ শুনে ছুটে এলাম রাস্তার মোড়ে।

বিকেলবেলায় ফুলিয়া থেকে ফিরে বাড়ীতে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। প্রায় পনের দিন আগে অপরেশকে কথা দিয়েছিলাম, রবিবার দিন আমরা ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থান দেখতে যাব। কিন্তু ভুলে-গিয়েছিলাম সে কথা। আগের দিন অর্থাৎ শনিবারে বিকেলে হঠাৎ শঙ্কর এসে ফুলিয়া যাবার কথা বললেন। সেইমত ভোরে উঠেই তাদের সাথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। অপরেশ-গৃহিণী শিপ্রা অনুযোগ করতে লাগল, 'আপনি আমাদের এড়িয়ে যেতে চান। নইলে কোথায় বেড়াতে যেতে হবে—সে কথা কেউ ভুলে যায়? আমার তো কোথাও বেরুনোর কথা হলে আগের দিন রাতেই ভাল ঘুম হয় না, বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এই বুঝি বেলা হয়ে গেল।'

ওদের দু'জনকে সেদিন বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছিলাম। কথা দিলাম, পরের রবিবার আমি নিজে গিয়ে ওদের বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যাব।

## সাত

**কাঞ্চনপল্লী**

'তোমা লাগি কাঁদি আজ, হে কবীন্দ্র রসরাজ,
হাস্যোজ্জ্বল সদামুক্ত প্রাণ।'

'শিপ্রা, চল। রসরাজের জন্য কেঁদে আর কাজ নেই। এদিকে রোদে ঘুরে ঘুরে আমি যে একেবারে রসশূন্য হয়ে গেলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখে সর্ষেফুল দেখছি।'

অপরেশের কথায় কান না দিয়েই, শিপ্রা তার নোট বুক খুলে লিখেই চলল……।

আমি নির্বাক, আমার অবস্থা অপরেশের চেয়ে করুণ। গলা জিব ঠোঁট বহু আগেই এমনভাবে শুকিয়েছে যে জিব দিয়ে চেটে-

ঠোঁট ভিজছে না। তার উপর পেটের অবস্থা শোচনীয়, বহুক্ষণ দানাপানি পড়ে নি।

সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে সামান্য জলযোগ সেরে কথামত অপরেশের বাড়ীতে আসি। ওদের দুজনকে সাথে নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে ন'টার মধ্যেই হাজির হয়েছিলাম। ছ' নম্বর প্লাটফরমে গাড়ী দাঁড়িয়ে, উঠে বসলাম বেশ সুযোগ মত কোণ নিয়ে। নটা পঁচিশ মিনিটে কৃষ্ণনগর লোকাল ছাড়বে। কানে এল ঘোষণা: 'ছ'নম্বর প্লাটফরমের গাড়ী কারসেডে যাবে, যাত্রীরা কেউ ঐ গাড়ীতে উঠবেন না।' গাড়ী এদিকে যাত্রী বোঝাই, তারা ছাড়বার জন্যে অপেক্ষা করছে। রেলকর্তৃপক্ষের নির্মম রসিকতায় ক্ষুব্ধ যাত্রীদলের সাথে নেমে পড়লাম প্লাটফরমে। রেল-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে যেখানে আমাদের দশটা চল্লিশ মিনিটে কাঁচড়াপাড়ায় পৌঁছানোর কথা, সেই গাড়ী পৌঁছল ঠিক বারটা দশ মিনিটে।

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের সামনে থেকে কল্যাণীগামী বাস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে আসে, নইলে হয়ত আমরা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন রোডের ভাল-ভাল খাবারের দোকানের যে কোন একটায় ঢুকতাম। ষ্টেশন থেকে ২৩ পয়সার টিকিট কিনে আমরা বাসে এসে নামলাম কল্যাণী। সহরের প্রবেশদ্বার বুদ্ধ পার্কের পাশে। বুদ্ধ পার্কের বিরাট বটের ছায়ায় কয়েকজন শ্রমিকশ্রেণীর লোক শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমনি পৌঁছতে দেরী হয়ে গিয়েছে বলে আমরা বিলম্ব না করে পশ্চিমদিকের গ্রাম কাঞ্চনপল্লীর দিকে এগোলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটীশে এখানকার তিপান্নটি গ্রাম উচ্ছেদ করে গড়ে উঠেছিল আমেরিকান এয়ার বেস। গ্রাম কাঞ্চনপল্লী সেই নোটীশের হাত থেকে রেহাই পেলেও গ্রামবাসীরা ভয় পেয়েছিল। দু'চার দিনের মধ্যে তাদের গ্রামটিও ওরা দখল করবে, তখন হয়ত জিনিষপত্র পর্যন্ত সরানোর সময় হবে না। ভীত গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসে বাগের খালের দক্ষিণে অর্থাৎ নদীয়া জেলা থেকে চব্বিশ-

পরগণা জেলার সীমানার মধ্যে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমেরিকান এয়ারবেসের এক অংশে গড়ে উঠেছে অধুনিক নাগরিক জীবনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কল্যাণী সহর। পাশে পড়ে আছে অতীত দিনের লক্ষ স্মৃতিবিজড়িত ছেড়ে-আসা গ্রাম কাঞ্চনপল্লী। বড় বড় বাড়ীর ভাঙ্গা ইটের ঢিবি ঢেকে আছে ঢোল, কমলী ও ভারবেনার জঙ্গলে। মাঝখান দিয়ে সরু সরু পায়ে-হাঁটা মেটে পথ। জঙ্গলের মাঝে এখানে সেখানে কোন মতে বাস করছে সেইসব হতভাগ্যেরা, যাদের সামর্থ ছিল না ভয় পেয়েও ভিটে ছাড়বার।

কাঞ্চনপল্লী বৈষ্ণবতীর্থ মধ্যে গণ্য শ্রীচৈতন্য ও তার পার্ষদদের জীবনস্মৃতি-মণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বচর সেন শিবানন্দের শ্রীপাঠ ও কবিকর্ণপুরের জন্মস্থান খুঁজতে গিয়ে আমরা ভর-দুপুরে হয়রাণ হয়েছি। বহু চেষ্টায় খুঁজতে খুঁজতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত আমরা দেখতে পেলাম এক গোয়ালার খাটালের পাশে দুটি পাথরের ফলক। একটিতে লেখা—

চৈতন্য জয়তু—

'১৪৩৬ শকে কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শ্রীচৈতন্যদেবের কাঁচড়াপাড়ায় শুভ পদার্পনের স্মৃতি এবং তাহার এই স্থানবাসী ভক্তমণ্ডলী শিবানন্দ সেন তৎপুত্র কবিকর্ণপুর, তাঁহাদের গুরু কৃষ্ণদেব পূজক শ্রীনাথ জগদানন্দ পুতস্মৃত ইত্যাদি ইত্যাদি।'

পাশের ফলকটি একটি নলকূপ স্থাপনের উপলক্ষে গড়া। শুনলাম এখানেই ছিল কাঞ্চনপল্লীর বিখ্যাত সেন-পাড়া। কবি কর্ণপুরের জন্মভিটাও নাকি ছিল ওখানে। সেই প্রাচীন সেনবাটির ভগ্নস্তূপ সমান করে বর্তমানে সেখানে ঐ গরুর খাটাল হয়েছে। আরও কিছুটা পশ্চিমে গঙ্গার দিকে যেয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে পেলাম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিস্তম্ভ। চারিদিকে আগাছায় ভরে উঠেছে। এক অশ্বত্থ, রসিক-কবির নীরস শুকনো ইটে-গড়া স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে তার শিকড় ঢুকিয়ে রস সংগ্রহ করছে।

শিপ্রা স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে শ্বেতপাথরের ফলকে খোদিত কথাগুলি লিখে নিচ্ছিল :

ঈশ্বরগুপ্ত—জন্ম ১২১৮, ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার
মৃত্যু ১২৬৫, ১০ই মাঘ শনিবার
"তোমালাগি কাঁদি আজ, হে কবীন্দ্র রসরাজ,
হাস্যোজ্জ্বল সদা মুক্ত প্রাণ।
ব্যঙ্গ কবিতার রঙ্গে একদিন এই বঙ্গে
তুলেছিল আনন্দ তুফান"

শিপ্রার লেখা শেষ হলে আমরা দক্ষিণ দিকে ( রথতলার দিকে ) এগোলাম। দূর থেকেই নজরে পড়ল ৭০ ফুট উঁচু কৃষ্ণ রায়ের মন্দিরের চুড়ো। একটা বাঁশবাগানের মাঝ দিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে এগোলাম। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মন্দির। পাঁচিলের বাইরে অনেক ঘুরে মন্দিরের দক্ষিণ দিকে সদর-ফটকের সামনে এলাম। মন্দিরের সামনের রাস্তা গেছে বাঁশবেড়িয়া খেয়াঘাট পর্যন্ত। রাস্তাটিতে হালে পীচ দেওয়া হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি ঘিরে মন্দিরের বাইরের পাঁচিল। তার ঠিক মাঝখানে প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর দ্বিতীয় পাঁচিলে ঘেরা মন্দির। অনেকটা সেকেলে দুর্গের মত ব্যবস্থা। দুটি মন্দিরের মাঝের জমিতে চাষ হচ্ছে। পুব দিকে বাইরের পাঁচিলের ভিতর কৃষ্ণ রায়ের রাসমঞ্চ। রাসের সময় মন্দির থেকে শ্রীবিগ্রহ এখানে নেওয়া হয়।

কৃষ্ণ রায়ের বর্তমান মন্দিরটি বাংলা আটচালা মন্দিরের এক অপূর্ব নিদর্শন। বর্তমান মন্দির ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে পাথুরেঘাটার নিমাই ও গৌরবরণ মল্লিক তৈরী করিয়ে দেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের নীলাচল লীলাকালে প্রতি বৎসর শিবানন্দ সেনের এই কাঞ্চনপল্লীর বাসভবনে গৌড়ীয় ভক্তেরা এসে হাজির হোতেন এবং এখান থেকে সকলে মিলে নীলাচল যাত্রা করতেন। শিবানন্দ সেন পথে সকলের আহার, বাসস্থান, ঘাটিদানাদি সমাধান

করতেন। মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর শিবানন্দ বৃন্দাবন থেকে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ রায়ের শ্রীবিগ্রহ এনে নিজগৃহে সেবা-প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির কালক্রমে ধ্বংস হলে যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের খুড়তুত ভাই কচু রায় বর্তমান জমিতে নূতন মন্দির তৈরী করিয়ে দেন এবং মুখোপাধ্যায় বংশীয় পূজকদের হাতে মন্দির উৎসর্গ করেন। কচু রায় নির্মিত মন্দির ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেই পুরানো মন্দির ভেঙ্গে ফেলে সেইখানেই ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমান মন্দির তৈরী হয়। মন্দিরের মধ্যে যাত্রীদের থাকবার জন্য ছোট দু'খানি ঘর আছে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কারের অভাব।

মন্দিরের মাঝের টিউবওয়েলে মুখ হাত পা ধুয়ে আমরা প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় সাড়ে সাতফুট উঁচু মন্দিরের ভিতের উপর উঠলাম। লম্বায় ৫০ ফুট, প্রস্থ ৩৪ ফুট ও ৭০ ফুট উঁচু দক্ষিণমুখী মন্দিরের বাংলা গড়ন। একমাত্র সামনের দিকে পোড়ামাটির অনেকগুলো পদ্মই মন্দিরের অলংকরণ। মন্দিরের সামনের দরজা ত্রিখিলানযুক্ত, তার পরই আবৃত অলিন্দ। অলিন্দের পিছনে গর্ভগৃহটি বেশ প্রশস্ত। দরজায় নানারকম পৌরাণিক দৃশ্য খোদাই করা। বেলা চারটের আগেই পূজারী এসে মন্দিরের দরজা খুললেন। পূজারী পূর্ববঙ্গের লোক। মাত্র কয়েক বছর হোলো এই মন্দিরের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

শিপ্রা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বিগ্রহের সামনে বসে আকুল চোখে অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত বিগ্রহটির দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইল। শিপ্রা যেন সমাহিত। তার এই ভাব-বিভোর অবস্থায় তাকে ডাকতে আমি সংকোচ বোধ করছিলাম। অপরেশ বললে, 'খিদে ও তেষ্টাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত না।' অপরেশের ডাকে শিপ্রা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার শব্দ কানে এলো। আমাদের কারও মুখে কথা নেই। ধীরে ধীরে আমরা ফিরলাম।

হেঁটে প্রায় ৮।১০ মিনিট লাগল বাগের মোড়ে পৌছতে। মোড়ের

উপরেই মিষ্টির দোকান। খরিদ্দারের ভীড় আছে, খাবারও ভাল। ওখানে জলযোগ ও চা-পান সেরে বাসে তেত্রিশ পয়সা ভাড়া দিয়ে সোজা নৈহাটী রেলষ্টেশনে পৌঁছলাম। কারণ, কাঁচড়াপাড়ার চেয়ে নৈহাটীতে ফেরার গাড়ী অনেক বেশী পাওয়া যাবে। বাসে আসতে পথের ধারে পড়ল চৈতন্যডোবা, নিগমানন্দ আশ্রম ও রামপ্রসাদের ভিটে। কোথাও নামা হোলো না। শিপ্রাকে কথা দিলাম আর একদিন এসে কুমারহট্ট দেখে যাব।

## আট

### কুলীনগ্রাম

'এই জন্যেই তো আমি বলি পথে নারী বিবর্জিতা, লিভিং লাগেজ যখন ঘাড়ে নিয়েছেন, এবার উঠুন, প্রকৃতির রুদ্র রূপ দেখে আর কাজ নেই, ঝড় এলো বলে'। উত্তেজিত অপরেশের কথায় চুপ করেই ছিলাম কিন্তু জবাব দিল শিপ্রা। অতি ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'দরকার হলে আমরা এই নাটমন্দিরে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব। আর যদি তোমাদের ক্ষমতায় কুলোয়, চলনা, মাত্র সাড়ে তিন মাইল পথ, লিভিং লাগেজও ঠিক তোমাদের সাথে সাথে জৌগ্রাম ষ্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে।'

'এখন এই জল-ঝড় মাথায় সাড়ে তিন মাইল রাস্তা যাওয়া? তোমায় না নিয়ে এলে আমরা কি-আরামে আশ্রমে কাটিয়ে কাল সকালে ধীরে সুস্থে ফিরতে পারতাম। তুমি সঙ্গে আছ বলেই তো আশ্রমে আমাদের থাকতে দিল না'—বললে অপরেশ।

'তা থাকোনা তোমরা আশ্রমে, আমি একলাই গোপালজীর এই নাটমন্দিরে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব। আমার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।'

শিপ্রার কথা শেষ হতে না হতে কালবৈশাখীর ঝড় সুরু হয়ে গেল। মিনিট তিনেক বাতাসের মাতামাতি, তারপরই আরম্ভ হোলো বাতাসের সাথে মুসলধারে বর্ষণ।

আমরা তিনজন নির্জন গোপালজীর মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে। নাটমন্দিরের দক্ষিণেই বিরাট গোপাল দিঘি, লম্বায় প্রায় আধ মাইল। দীঘির জলে রীতিমত ঢেউ হচ্ছে, কিন্তু প্রচণ্ড বর্ষায় বেশীদূর চোখ যাচ্ছে না। জলের ঝাপটায় নাটমন্দিরের অনেকটা ভিজে যাচ্ছে। আমরা একটা জোড়া পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে বর্ষণ-মুখর গোপাল-দীঘির রূপ দেখছি বাইরে প্রকৃতির ঝড় সুরু হবার সাথে সাথে ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথার ঝড় থেমে গেছে।

গত সপ্তাহে, আমরা কাঞ্চনপল্লী দেখে ফেরার সময়, সেন শিবানন্দের পাট দেখতে গিয়েছিলাম শুনে ট্রেনের মাঝে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, আপনারা যখন প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ দেখতে উৎসাহী একবার বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম দেখে আসবেন। এক সময় কুলীনগ্রামকে "গুপ্ত বৃন্দাবন" বলা হোত। স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন—

'কুলীন গ্রামের মধ্যে যে হয় কুকুর,
সেও মোর প্রিয়, অন্য জন বহুদূর।'

সেই ভদ্রলোকের কথায় উৎসাহিত হয়ে আজ ভোরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ট্রেনে মেমারী ষ্টেশনে আসবার উদ্দেশ্যে। ব্যাণ্ডেলে এসে ট্রেন পৌছল পৌনে সাতটার মধ্যেই, কিন্তু ব্যাণ্ডেল এসেই ষ্টেশনে ঘোষকের নির্দেশ কানে এল: 'বর্ধমান ষ্টেশনে চালের চোরাকারবারী-দের সাথে রেল-পুলিশের সংঘর্ষ হওয়ার জন্য আপাততঃ আর কোন ট্রেন ব্যাণ্ডেল থেকে ছাড়বেনা।' যখন বেরিয়ে পড়েছি, ফিরে না গিয়ে চার নম্বর মেল বাস ধরলাম। (চুঁচুড়া থেকে মেমারী) ভাড়া নিল একটাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা (ব্যাণ্ডেল থেকে মেমারীর ট্রেনভাড়া ১·৭০)।

মেমারীতে বাস থেকে নামামাত্র দেখি পাশেই খানপুর-মালাঙ্গা

ভায়া জৌগ্রাম-এর বাস দাঁড়িয়ে। এক বৎসর হোলো এই পথে সাময়িক বাস চলবার রুট পারমিট দেওয়া হয়েছে। বাসে মেমারী থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে রাণাপাড়ার মোড়ে নামলাম ( ভাড়া '৪০ পয়সা )। আধ মাইল মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ পার হয়ে গ্রামে ঢুকলাম। বহু পুরানো সিঁড়ি-বাঁধান পুকুর ও ছোট ইটের বড়-বড় ভাঙ্গা বাড়ী গ্রামের প্রাচীনত্বের প্রমাণ। রাণা পাড়ার কেন্দ্রস্থলে কালীতলা দিয়ে এগোনোর সময় দেখি, সমস্ত আঙ্গিনাটিতে চট, মাতুর, সতরঞ্চি প্রভৃতি বিছান। শুনলাম রাত্রে এখানে যাত্রা হবে, তাই গ্রামের লোকেরা ভোরবেলা থেকে যে যার জায়গা দখল করার জন্য নিজ নিজ বসার সরঞ্জাম পেতে রেখেছে। রাণাপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ রাধাগোবিন্দ মন্দির দেখে আমরা চৈতন্যপুর পাড়ার দিকে এগোলাম।

রাণাপাড়া, চৈতন্যপুর প্রভৃতি জায়গাগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম নয়। প্রাচীন কুলীনগ্রামের বিভিন্ন পাড়া। কুলীনগ্রাম বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তের গ্রাম। এ অঞ্চলে এক সময় জৈন ও পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। কুলীনগ্রামের কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে জামালপুরে এখনও বৌদ্ধ-প্রভাব রয়েছে। জামালপুরের বুড়োরাজের ওখানে বুদ্ধপূর্ণিমায় এখনও কয়েক হাজার পাঁঠা, ভেড়া, শূকর, পায়রা বলি হয়। বলির রক্ত মেখে তান্ত্রিক সিদ্ধাইদের তাণ্ডব নৃত্য দেখলে অতি সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে। কুলীনগ্রামের অপর পার্শ্বে আবুজহাটি বোলপুরই নাকি সুরথ রাজার লক্ষ বলির পীঠ। গ্রামের মাঝেই আছেন কালু রায়।

যতদূর জানা যায়, অপারমন্দারের ( আরামবাগের ) রাজা ভূশূরের ( ৯৫২ খৃঃ—৯৭০ খৃঃ ) সময় থেকে কুলীনগ্রামে শৈব প্রভাব বাড়তে থাকে। এই সময়ে গ্রামের পাশ দিয়ে দামোদরের এক শাখা কীর্তি নদী প্রবাহিত ছিল। তদানীন্তন যোগাযোগ ব্যবস্থা অপার-মন্দার থেকে আম্বুয়া ( বর্তমান কালনা ) সড়ক ছিল এই গ্রামের উত্তর সীমা দিয়ে, জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও ছিল কীর্তি নদী

পথে। অপারমন্দারের শূর-রাজারা ছিলেন প্রচণ্ড বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং গোঁড়া হিন্দু। বাংলাদেশে বৌদ্ধ-প্রভাব প্রতিহত করে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুনঃ প্রবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন শূরসেন বা আদিশূর ও তার বংশধরেরা। আদিশূর কর্তৃক কনৌজ থেকে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও সহায়তায় প্রচুর জমি লাভ করেন ও নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন।

"বেদ-বাণাঙ্ক-শকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্চান্দড়ো বেদগর্ভকঃ ॥
অথ শ্রীহর্ষনামা চ সাগ্নিকবংশ সম্ভবাঃ।
আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জ প্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহ পুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চ তে তথা ॥"—( কুলমিশ্র )

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের শ্লোক থেকে জানা যায় ৯৪২ খৃষ্টাব্দে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সঙ্গে সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের সঙ্গে কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের সঙ্গে গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, সাবর্ণ গোত্রীয় ছান্দড়ের সঙ্গে মদ্গৌল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত এবং বাৎস্য গোত্রীয় বেদগর্ভের সঙ্গে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র আদিশূরের পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য আসেন এবং রাঢ় দেশেই বসতি স্থাপন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন জন সন্তানকে বেদ প্রচার ও বাসস্থানের জন্য ভূশূর ছাপ্পান্নখানি গ্রাম দান করেন। পরে মহর্ষি-ছান্দরের আরও তিন পুত্র জন্মে এবং তারাও পরবর্তীকালে তিনখানা গ্রাম পান। এই সব গ্রামের নাম থেকে ব্রাহ্মণদের পাক্রি বা গাঁই-এর উৎপত্তি হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য, জমির উর্বরতার জন্য এবং শূর রাজাদের সহায়তায় গ্রামের পূর্বদিকে পুরুষোত্তম দত্তের এক বংশধর এসে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে গৌতম গোত্রীয় মাধব বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্রের এক বংশধর, ঘোষ বংশের

কয়েকজন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও কাশ্যপ গোত্রীয় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণও এসে একই জায়গায় বসবাস সুরু করেন।

আনুমানিক ১০৮০ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি কান্যকুব্জাগত হিন্দুদের মধ্যে উনিশজন ব্রাহ্মণ ও তিনজন কায়স্থকে কৌলীন্য মর্যাদা দান করেন। বল্লাল সেনের প্রথমবার কৌলীন্য মর্যাদা দেবার সময় বিচার্য বিষয় ছিল নয়টি গুণ—সামাজিক উন্নত ব্যবহার বা আচার, বিনয়, বিদ্যা, সমাজে প্রতিষ্ঠা বা সম্মান তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতা, কার্যে নিষ্ঠা, স্বাধীন ও সৎ বৃত্তি, দেবার্চনা ও দানশীলতা।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানম্ নবধাকুল লক্ষণম্॥

শোনা যায় বর্ধমান জেলার এই একটি মাত্র গ্রাম থেকেই সেই উনিশ জনের মধ্যে চারজন এই কৌলীন্য মর্যাদা লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে যখন কৌলীন্য প্রথা গুণগত না হয়ে বংশগত মর্যাদায় পরিণত হোলো, তখন বৈবাহিক ও অন্যান্য সূত্রে আরও কয়েক ঘর কুলীন এসে এই গ্রামে বসতি করলেন। বহু কুলীনের বাস বলেই গ্রামের নাম হয় কুলীনগ্রাম।

আমরা যখন গ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত অধিকারী মহাশয়ের সাথে গ্রামের নামের উৎপত্তি প্রভৃতির আলোচনা করছিলাম, তখন তিনি কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন, কালের প্রভাবে যুগে যুগে রুচি পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় গুণ থাকলে হোতো কুলীন, তারপর হোলো কুলীনের বংশের এঁড়ে হলেও কুলীন তার পরের যুগে সমাজে হোল সম্পত্তিগত কুলীন:

"দালান গোত্র পুষ্করিণী গাঞি
এ ছাড়া আর কুলিন নাই"
যদি থাকে দু'এক ঘর
লোহার সিন্ধুক আর টিনের ঘর।

চৈতন্যপুরের ভিতর দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে তারই উত্তরে একটা অতি পুরানো ইটের স্তূপ দেখলাম। সামনের সিংদরজার সামান্য অংশমাত্র এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এটিই শ্রীবসু রামানন্দের ভিটা। বিশাল বাসভবনের ভগ্নস্তূপ। তিনদিকে মাঝে মাঝে গড়খাতের চিহ্ন রয়েছে। বসু রামানন্দের পিতার নাম (সত্যরাজ খাঁ) লক্ষ্মীনাথ বসু এবং পিতামহ (গুণরাজ খাঁ) মালাধর বসু। মালাধর বসু ছিলেন গৌড়ের মুসলমান শাসক হুসেন সাহের মন্ত্রী এবং কার্যত রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক। কিন্তু শত রাজকার্যের মধ্যেও তাঁর কাব্য ও সাহিত্য চর্চার অবকাশ করে নিতেন। এঁর কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে হুসেন সাহ একে উপাধি দেন গুণরাজ খাঁন। ইনিই বাংলা ভাষায় প্রথম বৈষ্ণব-সাহিত্য লেখেন। গুণরাজ খাঁর রচিত লক্ষ্মীচরিত্রই বোধহয় আধুনিক বাংলার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য লিখে মালাধর বসু সারা বাংলা দেশে ভাগবত ভক্তির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়, শূকর চরায় ডোম সেও কৃষ্ণ গায়।"

মজে-যাওয়া গড়খাই-এর উঁচু-নীচু জমি ভাঙা ছোট ছোট কাঠে পোড়ান ইটের স্তূপের উপর জঙ্গল ও আগাছা ঢাকা। কাছে এগোতে ভয় করে, এর ভিতর শতাব্দীকাল ধরে কত সর্পকুল বাস করছে কে জানে। প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু দোতলা সিংদরজার যে সামান্য অংশটুকু মাত্র এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে শিপ্রা মন্তব্য করল, 'এই গুণরাজ খাঁর ভিটে কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের তীর্থ নয়, বৈষ্ণব-সাহিত্যকে যখন আধুনিক বাংলা ভাষার জনক বলা হয় তখন বাংলা সাহিত্যিক সমাজের পিতার জন্মভিটার তুল্য। সরকারী আর্কিওলজি বিভাগ না হয় ঘুমিয়েই আছে, বাংলার সংস্কৃতিবান মানুষ কি কেউ নেই যে একটু চেষ্টা করেন যাতে এই প্রাচীন স্মৃতিগুলি রক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা করেন। এখনও যদি চেষ্টা না করা যায় আর দশ বছর পর এর চিহ্ন মাত্র থাকবে না।'

আমাদের দেখে কৌতুহলী দু-তিন জন প্রৌঢ় চাষী সাঁওতাল কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন শিপ্রার কথা শুনে মন্তব্য করল, 'মা, এই মালাধর বসুর বংশেরই ছেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আমাদের এই গাঁয়েরই ছেলে অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ মশায়। এই গাঁয়ে বিশ-তিরিশ বিঘে করে জমি আছে এমন অন্ততঃ এক কুড়ি বাবু কলকাতায় আছেন। তাঁরা সবাই বড় বড় চাকরী করেন, সবাই বি. এ. এম. এ পাশ। তাঁরা বছরে একবার দু-বার দু'এক দিনের জন্যে গাঁয়ে আসেন, ধান বেচে কিনে চলে যান। গাঁয়ের রাস্তায় এক ঝুড়ি মাটি দেবার পয়সাটা চাইলে তাদের কাছে পাওয়া যায় না। এমন কি গাঁয়ের ছেলে বলে তারা পরিচয় দিতে চান না। গাঁয়ের মান-মর্যাদা রাখার চিন্তা গাঁয়ের ছেলেরা করতে চায়না, তোমাদের কি মাথাব্যথা, মা।'

তার কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। তারই মুখে শুনলাম, 'মহাপ্রভু, বসু রামানন্দের বারবাড়ীতে একটা কদম গাছ ছিল, তারই তলায় বসে রামানন্দকে গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেন। এজন্য লোকে গ্রামের এই বসু চৌধুরী পাড়াকে চৈতন্যপুরও বলে। ভদ্রলোক আধুনিক শিক্ষায় ডিগ্রীধারী না হলেও চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বাংলা ভাষায় লেখা বৈষ্ণব-গ্রন্থ ভালভাবেই পড়েছেন বোঝা গেল। তিনি সত্যরাজ খাঁন সম্পর্কে আমাদের কাহিনী শোনালেন: 'মহাপ্রভু সত্যরাজ খাঁনকে জগন্নাথের রথ টানবার একগাছা ছেঁড়া দড়ি দিয়ে আদেশ করেন, "এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতিবর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ।" তদবধি যতদিন মহাপ্রভু নীলাচলে ছিলেন, প্রতি বৎসর রথের সময় সত্যরাজ খাঁন পট্টডোরী নিয়ে যেতেন। এই সত্যরাজ খাঁনকে মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ কি নিজে মুখে বলেন।'

শিপ্রা জিজ্ঞাসা ক'রল, 'মহাপ্রভু প্রকৃত বৈষ্ণবের কি লক্ষণ বলেছেন?' উনি জবাব দিলেন, 'কৃষ্ণ নাম মুখে আনলেই বৈষ্ণব।

তার প্রকৃত ও নকল বলে কিছু নেই কারণ গীতায় আছে ভীতু, জ্ঞানহীন প্রশ্নকারী, অর্থলোভী, প্রকৃত জ্ঞানী, সবাই বিষ্ণুর ভজনা করে অর্থাৎ বৈষ্ণব : "চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতার্জুন আর্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ।" তবে মহাপ্রভু সত্যরাজকে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। প্রথম, 'যার মুখে একবার হয় কৃষ্ণনাম সেই বৈষ্ণবতো করি তাহার সম্মান।' বৈষ্ণবতর হচ্ছে, 'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে।' বৈষ্ণবতম হলেন, 'যাঁহার দর্শনে মুখে আসে কৃষ্ণনাম তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান।'

বৈশাখের প্রখর রোদে আর দেরী না করে আমরা সোজা হাটখোলার দিকে এগোলাম। মিত্র পাড়ায় কালু রায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম নোড়াকৃতি একখণ্ড পাথর, ইনিই কালু রায় নামে পূজিত হন। এর পূজারীরা ডোম-সম্প্রদায়ের লোক, উপাধি পণ্ডিত। বর্তমান পূজারীরা তিন ঘর পালা করে পূজা করেন। একজন লক্ষীকান্ত পণ্ডিত, দ্বিতীয় কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত ও তৃতীয়ের নাম ভোলানাথ। এরা কালু রায়কে কোন সিদ্ধ অন্ন ভোগ দেন না, দিনে অপরাহ্নে একবার চাল-কলার ভোগ দেওয়া হয় মাত্র। গাজনের সময় কালু রায়ের গাজন হয় শিবের গাজনের মত। পূজার মন্ত্রের একটি পংক্তি : 'ভক্তানাং সুর নর বরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং ইত্যাদি ইত্যাদি।' এই পণ্ডিতেরা ও ডোম ভক্তেরা আবার প্রায়ই কালু রায়ের সামনে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করেন।

হাটের পাশেই একটি আধভাঙ্গা চালাঘর দেখিয়ে একজন বল্লেন, ইনি কুলীনগ্রামের প্রাচীন দেবী মা শিবানী। ঘরের দরজায় শিকল আঁটা। শিপ্রা যেয়ে দরজা খুললো। ঘরে কোন জানালা না থাকলেও ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে রোদ্দুর ঢুকছে। মূর্তিটি কাল পাথরের একটি শিয়াল। ডোম পণ্ডিত মশায় বললেন, 'পাল বংশের বৌদ্ধ তান্ত্রিক রাজাদের আমলেরও আগে থেকে যখন কুলীনগ্রামে কোন

ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসেননি, যখন এ অঞ্চলে কেবলমাত্র ডোম, কপালী, হাড়ি প্রভৃতি জাতের বাস ছিল, তখন থেকে ইনি পূজিত হয়ে আসছেন।' তখন কে বা কারা পূজা করতেন এদের জানা নেই। আগে একটা পুরানো মন্দির ছিল। সে মন্দিরটি পড়ে মাটিতে মিশিয়ে যাবার পর এইখানে চালাঘরে শিবানীমাকে আনা হয়েছে। তবে জমিদার সত্যরাজ খাঁনের সময় থেকে ব্রাহ্মণ পূজারীরা মায়ের পূজা করছে, এখবর তিনি জানেন। মায়ের নামে সত্যরাজ খাঁ নাকি একটি দীঘি ও বহু জমি দেবোত্তর করেছিলেন। ঐ দীঘি শিবা দীঘি নামে খ্যাত। বর্তমানে জমিজমা প্রায় নেই, শিবা দীঘি মজে দহে পরিণত হলেও এখনও জলকর চল্লিশ বিঘা, পাড় নিয়ে এলাকা প্রায় নব্বই বিঘার মত। শিবানী সম্পর্কে পরে ব্রাহ্মণ পাঠক মহাশয়ের (এরা খাঁটি কনৌজী ব্রাহ্মণ) কাছে অন্য কাহিনী শুনলাম। তিনি বললেন, 'শিবা মূর্তি সত্যরাজ খাঁ দীঘি খুঁড়তে গিয়ে পান। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার ব্যবস্থাও করেন। দশভুজা দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে শিবানী মায়ের পূজা হয়।'

শিবানীর চালাঘরের মন্দিরে বিপরীত দিকে দেখলাম, স্থানীয় ডাক্তার ত্রিগুণেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর পিতামহের স্মৃতিরক্ষার্থে সুন্দর পাকা দুর্গামণ্ডপ (নাটমন্দিরসহ) তৈরী করে দিয়েছেন। সেখানে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হয়। পাশেই একটি মিষ্টি ও চায়ের দোকান। সেখানে আমরা জলযোগ করতে বসলাম। অপরেশ দেখি, শিবানী মায়ের চালাঘরের সামনের একখানা বড় কালো পাথরের গায়ে হাত ঘসছে। চা পানের জন্য উঠে এসে সে মন্তব্য করল, ঐ কালো পাথর পুরানো মন্দিরের অংশ। ওর বয়স অন্ততঃ সাত-আটশ বছর হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিবানী মূর্তি নিশ্চয়ই সত্যরাজ খাঁর বহু আগে থেকেই এই গ্রামে রয়েছে।'

বাইরের লোকেরা গ্রামে এলে থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার আমাদের প্রথমেই গ্রামের দক্ষিণ

প্রান্তে গঙ্গারামপটি পাড়ায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে যেতে বললেন। তার কথামত আমার একটা প্রায় ৩০০/৩৫০ বছরের পুরান গাবগাছের পাশে আশ্রম-বাড়ীতে গেলাম।

এই জায়গায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কালে শ্রুতি বা বেদ অধ্যাপনাকারী ব্রাহ্মণ জগদানন্দ পাঠকের বাড়ী ছিল। তিনি প্রৌঢ় বয়সে মহাপ্রভুর নির্দেশিত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন ও নিত্য লক্ষ নাম জপ করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার পর ফুলিয়া ত্যাগ করে, বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি জগদানন্দ পাঠকের বাড়ী এসে এখানে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন। একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় শ্রীশ্রীহরিদাস নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। ঐ জায়গাই হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান বলে প্রচলিত। বটগাছতলায় একটা বেদী ছিল। বর্তমানে বটগাছটি নেই। ১৭৭৩ শকে ( ১৮৪৯ খৃঃ ) বৈদ্যপুরবাসী দীননাথ নন্দী মশায় বেদীর উপর একটা ছোট বাংলা মন্দির তৈরী করান।

রামানন্দ বসু জগদানন্দের মৃত্যুর পর তার শ্রীপাটে হরিদাস ঠাকুরের, মহাপ্রভুর ও শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীহরিদাসের দারুময় বিগ্রহ মুসলমান ফকিরের বেশ। আশ্রমের পাশে আশ্রমেরই একটি বিরাট পুকুর, জল স্বচ্ছ ( কালো মনে হয় )। স্থানীয় লোকে পুকুরটিকে যমুনা বলে ও ভক্ত বৈষ্ণবেরা—যমুনার জলে স্নান বা মাথায় দেওয়া পুণ্য কাজ বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে স্থানীয় ডাক্তার ত্রিগুণেন্দ্র মিত্র ও ভূতেন্দ্র মিত্র আশ্রমের নূতন একটি মন্দির, সেবক খণ্ড, রান্নার ঘর, ধানের গোলা, পাকা প্রশস্ত নাটমন্দির তৈরী করান ও সমস্ত আশ্রম-বাড়ী পাকা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেন।

আশ্রমের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিত্র মহাশয় আশ্রমটির দায়িত্বভার গৌড়ীয় মঠের ( শ্রীমায়াপুরের ) উপর অর্পণ করেছেন ১৯৭১ সালে। আশ্রমের যে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে গৌড়ীয় মঠের

স্থানীয় সন্ন্যাসীর সুষ্ঠ পরিচালনায় তা দিয়েই মন্দিরের নিত্যসেবা চলে যায়।

গৌড়ীয় মঠের তরফ থেকে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার দিন উদয়াস্ত নামকীর্তন ও মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৮/১০ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আমরা যখন আশ্রমে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় সওয়া বারটা। মন্দিরে ঠাকুরের ভোগরাগ হচ্ছে। অভুক্ত আমাদের তিন জনের আগমনে মনে হোল মঠের অধিবাসী সন্ন্যাসীপ্রবর একটু বিব্রত। তার ভ্রূ বেশ একটুক্ষণ কুঁচকে থাকল। তারপরই 'জয়গুরু' বলে তিনি এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘর ধোয়ায় ব্যস্ত অন্য এক মহারাজকে বললেন, 'গোঁসাই ও-কাজ একটু রাখ, আধসের খানেক প্রসাদ চাপিয়ে দাও।' আমরা একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

ভোগারতি হবার পর আশ্রমবাসীদের সাথে আমাদের অন্ন-প্রসাদ গ্রহণপর্ব শেষ হোলো। অবেলায় খিদের মুখে আমাদের সবারই একটু গুরুভোজন হয়েছিল। মন্দিরের ঠাণ্ডা বারান্দায় খানিকটা কাত হয়ে মহারাজজীর সাথে আলাপ করে জানলাম, কুলীনগ্রামে ও সংলগ্ন গ্রাম দত্তপাড়ায় মোট বিয়াল্লিশটি ছোট-বড় মন্দির বা বিগ্রহ আছে। দত্তপাড়ায় একই জায়গায় আছে বারটি শিবমন্দির। আমরা যেভাবে দর্শনীয়গুলির প্রাচীন ঐতিহ্যের খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি এবং এখান থেকে যাতায়াতের যে অসুবিধা, তাতে একদিনের মধ্যে সব কিছু দেখে ফেরা অসম্ভব। এক বা দুজন পুরুষযাত্রী হলে আশ্রমে থাকবার ব্যবস্থা হোত কিন্তু গৌড়ীয় মঠের কঠোর নির্দেশ, সূর্যাস্তের পর আশ্রম-এলাকার মধ্যে বা ত্রিসীমানায় কোন মহিলার থাকা নিষেধ। ঐ গুরুভোজনের পর তৎক্ষণাৎ উঠবার কথা চিন্তা করতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল। মহারাজজীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, 'গ্রামে ঐ শিবানী-মন্দিরের কাছে একটিমাত্র খাবারের দোকান ভিন্ন অন্য কোনখানে খাবার পাওয়া যাবে না। রাত্রে থাকবার আবাসিক হোটেল

তো দূরস্থান, তবে পূর্ব-পরিচিতি থাকলে, গ্রামের লোকের বাড়ীতে আতিথ্য জুটতে পারে, কিন্তু বর্তমান যুগে অপরিচিতকে কেউই ঘরে আশ্রয় দেবে না।'

বাধ্য হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দির কিন্তু সেগুলির সংস্কার হচ্ছে না। আমরা দেখলাম, রামনাথ শিব প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দির।

ভুবনেশ্বরী মাতা—পাথরের দশভূজা মূর্তি। প্রবাদ, রায় রামানন্দ বসুর বংশধর আনন্দ বসু মুর্শিদাবাদে আলিবর্দীর নবাব-সরকারে চাকুরী করতেন। তিনি একবার নৌকা করে ফেরার পথে এই পাথরের বিগ্রহ গঙ্গাতীরে পান ও এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরও কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। বর্তমানে রঘুনাথ-মন্দিরের পাশে বসু-বংশের এক বংশধরের ঘরে বিগ্রহ রয়েছে, পাশে লাগান একটি পাথরের ফলক, শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মাতা ৺আনন্দমোহন বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত রায় রামানন্দের ভিটা। ফলকটি ও দু'তিনখানি পাথর দেখে বোঝা যায়, প্রাচীন মন্দির থেকে এনে এই একতালা ঘরে লাগান হয়েছে। এই বংশের বর্তমান বংশধরেরা নিয়মিত এখানে থাকেন না। বেশ কিছু জমাজমি আছে। মাঝে মাঝে বাড়ীর বড় বৌ বিজলী বসুরায় এসে দু'চার দিন এখানে থেকে ধানগুলি আদায় করেন ভাগচাষীদের কাছ থেকে। কিছু দিয়ে দেন মন্দিরের পূজারী অধিকারী মশায়কে নিত্য ঠাকুর সেবার জন্য, বাকী বিক্রী করে চলে যান চন্দননগর ফটকগোড়ায়। ঐখানেই ওনারা থাকেন ঘোষ নিবাস নামে বাড়ীটিতে।

রঘুনাথ মন্দির। প্রাচীন মন্দিরের শেষ অবশেষ মাত্র দেখা গেল। পাঁচিলের উপর বাংলা-চালার আকৃতি ইটের তৈরী ফটকের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে রাম-সীতা ও হনুমানজীর দারুময় বিগ্রহ রয়েছে বাংলা ১৩৫১ সালে তৈরী একটি ছোট একতালা দালানে। ঘরের এক কোণে একটি শিবলিঙ্গও রয়েছে, দেখলাম। ঘরটি কুলীন পাড়ার

প্যারীমোহন বসুর জামাতা-বংশের একজন তৈরী করে দিয়েছেন। বিগ্রহের পূজারী গ্রামের পাঠকেরা। নিত্য সেবা হয় দেবোত্তর খাস-জমির আয় থেকে।

রঘুনাথজীর মন্দিরের দক্ষিণেই জগন্নাথ মন্দির ও তাঁর রথ রয়েছে। রথটি রাখবার জন্যে নোতুন পাকা খুব উঁচু প্রায় ৩০ ফুট ঘর তৈরী হয়েছে। শুনলাম, এখানে 'কুলানগ্রাম মন্দির-সংস্কার সমিতি' নামে একটি সমিতি হয়েছে। অল্প দিন আগে তারাই নাকি এই সব কাজ আরম্ভ করেছেন। শ্রীভূতেন্দ্রনাথ মিত্র ও কমলকুমার সরকার নাকি এ বিষয়ে খুব উৎসাহী।

পুরানো ভাঙ্গা দেওয়ালের ভিত দেখে মনে হোল, বর্তমান রঘুনাথ ও জগন্নাথের মন্দির ( দুটিই একতলা দালান ঘর ) এক সময় এটি মন্দিরের এলাকার মধ্যে ছিল। মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ অষ্টধাতুর। রাধাগোবিন্দ ও শালগ্রাম আছে। মন্দির-মধ্যে কালো পাথরের প্রায় আড়াই ফুট উঁচু হনুমানজীর একটি মূর্তি আছে। প্রবাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল অবস্থানকালে প্রতিবৎসর কুলীনগ্রাম থেকে রথের পট্টডোরী যেত। মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর রামানন্দ বসু এখানে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে জগন্নাথে লীন হন ( ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাস রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর )। চৈতন্যমঙ্গল : "চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।" পর বৎসর অর্থাৎ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে কুলীমগ্রামে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা হয় ও রথযাত্রা সুরু। এ থেকে বলা যায়, কুলীনগ্রামের রথযাত্রা ও সেই উপলক্ষে একদিনের আড়ং ( মেলা ) এর বয়স, সাড়ে চারশ বছরের উপর।

বারোয়ারী তলার ধারে টেরাকোটা কাজ-করা পুরানো শিবমন্দিরের ভিতর দেখলাম শিব নাই। সেই মন্দিরে রয়েছে রক্ষাকালীর মৃন্ময় মূর্তি। মন্দিরের দরজায় অনেক ভক্ত মাটির ঘোড়া দিয়ে পূজা দিয়ে গেছে।

বারোয়ারীতলা পেছনে ফেলে আমরা গেলাম গোপাল মন্দিরে। গোপাল মন্দিরই কুলীনগ্রামের বৃহত্তম, সুন্দরতম ও প্রাচীনতম মন্দির। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় আশি ফুট। মূল মন্দিরটিতে উড়িষ্যার শিল্পকৌশল সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভুবনেশ্বর মন্দিরের খানিকটা অনুকরণে গড়া রেখদেউলের রাহাপগ ও আমলক। মন্দির-শীর্ষের কলস ও পতাকাদণ্ড মন্দিরের গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গর্ভ মন্দিরের সঙ্গে লাগান অর্ধ গম্বুজাকৃতি জগমোহন। সামনে নাটমন্দির। পূর্বদিকে গোপাল দীঘি।

সিংহাসনে শ্রীমদনগোপাল, একপাশে রাধিকা, অন্য দিকে দেবী বসুমতী। এছাড়া নাড়ুগোপাল, চণ্ডীদেবী, জগদ্ধাত্রী ও ৩৮টি শালগ্রাম শিলা রয়েছে মন্দিরে। জগমোহনের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দরজা। মন্দিরের দরজার পাথর দেখে অনুমান, মন্দির চৈতন্য-পূর্বযুগের।

মদনগোপালের বর্তমান সেবকরা শাণ্ডিল্যগোত্রের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়, পরবর্তীকালে গৃহীত পদবী অধিকারী। তাদেরই একজনের মুখে শুনলাম, এই মন্দির বল্লাল সেনের সৌজন্যে নির্মিত হয়। মন্দিরের জগমোহনের ভিতরে গেলে দেখা যায়, কাটান ইটের (হিন্দুযুগের স্থাপত্য) খিলান থাক-থাক ভাবে ক্রমে ছোট হয়ে গোলাকার ধারণ করেছে। মূল বিগ্রহ মদনগোপাল অনেকটা প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তির ঢংয়ের। আগে পাশে একমাত্র বসুমতী ছিলেন, রামানন্দ বসুর পরবর্তীকালে শ্রীমতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি আরও বললেন, শালগ্রামের মধ্যে একজন শ্রীধর মালাধর বসু পূজিত, আর একজন কৃষ্ণদেব আচার্য পূজিত, উভয়েই চৈতন্য পূর্বযুগের।

আমরা মন্দিরে এসে পৌঁছানর একটু পরেই আকাশ কালো করে কালবৈশাখীর মেঘ উঠল। তখন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল গোপালদীঘির রূপ। নাটমন্দিরের মধ্যে বসে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

ঝড়ের প্রথম দাপট দেখেই শিপ্রা ও অপরেশ একেবারে চুপ।

একটু পরেই আরম্ভ হল বর্ষণ। জলের ঝাপটা কমে গেল বাতাসের বেগ হ্রাস পাবার সাথে সাথে, কিন্তু ধারা বাড়ল। সামনে গোপালদীঘির বুকে জলের ধারার শব্দ এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করল।

নাটমন্দিরের মেঝের উপর বসে আমরা তিনজন বর্ষণ বিরতির জন্যে অপেক্ষা করছি, পাশে দাঁড়িয়ে পুরোহিত অধিকারী মশায়। শিপ্রা একমনে চেয়ে আছে অদূরে দীঘির পাড়ে গোপেশ্বর শিবের মন্দিরের দিকে। মন্দিরের বারান্দায় কালো পাথরের নন্দীমূর্তি ( ষাঁড় ) চোখে পড়ছে। গোপেশ্বরের সেবাইত ৺বিপিনবিহারী পাঠকের পৌত্রেরা বাংলা ১৩৭৭ সালে মন্দিরটি সংস্কার করেছেন। মন্দিরের নির্মাণকালের কোন নিদর্শন নেই। ঠিক কতদিন আগে মন্দির তৈরী কেউ বলতে পারে না। যণ্ডমূর্তির গলায় লেখা আছে—

"শাকে বিশতি বেদে খে মৌন হি শির সন্নিধৌ
খান সত্যরাজেন স্থাপিতোহয়ং ময়া বৃষ ॥"

শিবের প্রতিষ্ঠা কবে ঠিক জানা না থাকলেও বৃষ যে সত্যরাজ খাঁন প্রতিষ্ঠা করেন সেটি জানা যায়।

অপরেশ কুলীনগ্রামের প্রাচীনত্ব ও সংস্কৃতি নিয়ে অধিকারী মশায়ের সাথে আলোচনা সুরু করল। আমি নীরব শ্রোতা। তাদের আলোচনার সারমর্ম হোলো, কুলীনগ্রামের আনুমানিক সওয়া দু' হাজার অধিবাসীর মধ্যে একহাজার সাঁওতাল, প্রায় পাঁচ ছয়শ কাওরা, দলে বাগ্‌দি, ভূমিজ, খয়রা, ডোম, মাল প্রভৃতি আদিবাসী বা নিম্নকোটির লোক—বাকী বাসিন্দাদের মধ্যে দু'শ থেকে সওয়া দু'শ জন কায়স্থ ও প্রায় আড়াইশ ব্রাহ্মণ। অন্যান্য জাতির মধ্যে দু'চার ঘর মোদক, নাপিত, কর্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি এঁদেরই সেবক-শ্রেণী হিসাবে গ্রামে বাস করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে একদা এ অঞ্চলটি ছিল আদিবাসী অধ্যুসিত। তাদের সংস্কৃতির চিহ্ন 'শিয়াল পূজা' আজও চলছে, যদিও হিন্দুধর্মের অসীম সাঙ্গীকরণের ক্ষমতা

তাকে শিবানীমায়ে পরিণত করেছে ও পূজারীর অধিকার দখল করে নিয়েছে ব্রাহ্মণেরা এবং এই অনার্য সংস্কৃতির কথাটা ঢাকবার জন্য ধূর্ত ব্রাহ্মণেরাই দীঘি খুঁড়ে মূর্তি পাবার কথাটা চালু করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এখানেই নিম্ন জাতির মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ কালু রায়। আদিবাসী কোমের দেবতা প্রথমে বৌদ্ধ শূন্যপুরাণের প্রভাবে, পরবর্তীকালে পৌরাণিক শৈব-প্রভাবে 'সুর নর বরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিং' হয়েছেন। কিন্তু আজও পূজারী ডোম পণ্ডিত।

বৌদ্ধ-প্রভাবকে সংহত করার জন্য শূর বর্মন ও সেন আমলের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে মদনগোপালের পাশে বসুমতী ও গোপেশ্বরের বৃষ মূর্তির মধ্যে। পালযুগের শেষভাগের যত মূর্তি আমরা মিউজিয়মে দেখি তার বেশীর ভাগই বিষ্ণুমূর্তি এবং সেই মূর্তির পাশেই দেবী বসুমতী দেখা যায়। চৈতন্য-পরবর্তীকালের শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু নন, তিনি বৃন্দাবনের শ্রীমতীসহ কৃষ্ণ। মদনগোপালের শ্রীমতী পরবর্তী যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংযোজন। জয়দেবের যুগের অর্থাৎ সেন-আমলের রাজারা বৈষ্ণব হলেও শিবের উপাসনা করতেন। এমন কি দেখা যায় খড়গ-বংশের রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাদের রাজকীয় মুদ্রা বৃষলাঞ্ছন। শশাঙ্কের যে মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতেও দেখা যায়, ঠিক গোপেশ্বর মন্দিরের ষাঁড়ের মত অনুরূপ মূর্তি খোদিত।

মালাধর বসুর পর থেকেই কুলীনগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির বন্যা বয়ে চলেছে। এক কথায় কুলীনগ্রাম পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির বিবর্তনের একটা ভাল এলবাম বিশেষ।

এদের আলোচনা শেষ হবার আগেই সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল। বৃষ্টি ছেড়েও যেন ছাড়তে চায় না। এই অন্ধকারে কোথায় কিভাবে যাব চিন্তা হোলো। গ্রামে ইলেকট্রিক এসেছে বটে কিন্তু পথে আলোর কোন ব্যবস্থা নেই।

রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় নাটমন্দির থেকে আমাদের সাথে

নিয়ে অধিকারী মশায় বেরোলেন। তিনি বললেন, যদি থাকতে চাই, ডাঃ মিত্রের বাড়ীতে হয়ত আশ্রয় হতে পারে। আমরা থাকতে রাজী হলাম না। ওকে অনুরোধ করলাম যদি গ্রামের ভিতরে রাস্তাটুকু দেখিয়ে আমাদের শিবানী মন্দিরের কাছে পৌঁছে দেন তাহলে আমরা নিজেরাই হেঁটে জোগ্রাম ষ্টেশনে চলে যেতে পারব। আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে। পুরোহিত মশায় কোন জবাব না দিয়ে আমাদের তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পুরোহিত মশায় চিরকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁর ভ্রাতৃবধূকে আমাদের ঠাকুর-পূজার ফল, বাতাসা ও মুড়ি খেতে দিতে বললেন। আর ভাইপোকে বললেন, নীলকুঠি থেকে একটা সাঁওতালকে ডেকে আনতে। শুনলাম, এখন যেখানে সাঁওতালপাড়া এক সময় সেখানে নাকি একটি নীলকুঠি ছিল, বর্তমানে তার কোন চিহ্ন নেই। মিনিট দশেকের মধ্যে একটি সাঁওতাল যুবক, নাম সুবল, এসে হাজির হোলো। পুরোহিত মশায়ের হুকুমে সে আমাদের ক্যানালের পাশে পাশে মাঠের মাঝের সোজা রাস্তা দিয়ে গোপালপুর স্কুলের কাছে পাকা রাস্তায় তুলে দিল। এই পথ দিয়ে মেমারী জোগ্রামের বাস চলে (খানপুর-মালস্বা)। শেষ বাস চলে গেছে সাড়ে ছটার সময়। এখান থেকে জোগ্রাম মাত্র মইল দু'য়েক রাস্তা। শিপ্রা সাঁওতাল ছেলেটিকে দু'টি টাকা বকশিস দিতে গেলে সে কিছুতেই নিল না। তার একটিই কথা—সে মজুর খেটে খায়, জমির কাজ করলে সে পুরো চার টাকা রোজ ও এককাঠা মুড়ি জলখাবার নেয়। কিন্তু এ কাজ তো সে গ্রামের অতিথির জন্য করেছে, টাকা নিলে তার নরকবাস হবে। কালু রায় তার পায়ে বাত ধরিয়ে দেবে।

সুবল উরাওকে বিদায় দিয়ে আমরা নির্জন পিচের রাস্তা বেয়ে যখন পৌঁছলাম জোগ্রাম ষ্টেশনে, তখন ঘড়িতে বাজে রাত সওয়া নটা। অপরেশ মন্তব্য করল, জোগ্রাম থেকে গোপালপুর হয়ে মাঠপথে কুলীনগ্রাম তো খুব বেশী দূর নয়, মোট তিন মাইলের মত হবে। গোপালপুর হয়ে মাঠপথে দূরত্ব কম হলেও বর্ষাকালে চলাচল সম্ভব

নয়, গ্রীষ্মকালে আবার আছে সর্পভীতি। মাঠের আলে-আলে কেউটেরা সন্ধ্যার আঁধার নামার সাথে সাথে শিকারের আশায় বেরোয়। বাধ্য হয়ে সবাইকে ঘোরাপথে যাতায়াত করতে হয়।

নিউকর্ড লাইনের বর্ধমান লোকালে ঠিক রাত সাড়ে ন'টায় জৌগ্রাম থেকে উঠে আমরা হওড়ায় পৌঁছলাম রাত এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে।

## নয়

### আঝাপুর

কুলীনগ্রামে মন্দিরের নাটমন্দিরে আমাদের বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কাল-বৈশাখীর কোপে পড়ে। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে পুরোহিতের মুখে শুনেছিলাম, কুলীনগ্রামের শিবানী বা শিবা বিগ্রহের মত আর একটি শিবা বা পাথরের অতি প্রাচীন শৃগাল বিগ্রহ পূজিত হয় আঝাপুর গ্রামের পূবদিকে এক মন্দিরে। আঝাপুর গ্রামে নাকি বহু প্রাচীন মন্দির, দেউল প্রভৃতি আছে। সুযোগ পেলাম। বন্ধুবর কোনারের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল শনিবার সন্ধ্যায় মেমারী যাবার; রাত দশটা-এগারটার মধ্যে কলকাতায় ফেরা যাবে এ আশ্বাসও দিল। আমি সরাসরি তাকে বললাম, 'রাত্রে ফিরতে পারা যাবে শুনে যতটা আশ্বস্ত হচ্ছি তার চেয়ে বেশী আনন্দিত হতাম যদি রাতটা ওখানে কাটাতে পারব শুনলে। পরদিন ভোরে বেরিয়ে আঝাপুর দেখে ফিরতে পারতাম।'

আমার কথা শুনে কোনার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্বের ভীড় থাকবে বটে, কিন্তু তোমার থাকবার ভালই ব্যবস্থা আছে। আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র ২/৩ মিনিটের মেমারী বাজারের মধ্যে আমাদের ধানের আড়তের দোতলায় দু'খানি নূতন ঘর

বাথরুম তৈরী হয়েছে, কেউই সেখানে থাকে না। সরকার মশায় ও দরওয়ান নিচের গদীঘরে থাকে। তোমাকে দিয়ে উপরের ঘর ওপনিং করা যাবে।'

রাত্রে গুরু ভোজনের ফলে ঘুম ভাঙতে একটু দেরী হয়েছিল। সরকার মশায়ের ডাকে উঠলাম। কোনারদের বাড়ী থেকে ডাক এল। চা জলযোগ পর্ব শেষ করে বিদায় চাইলাম। কোনারের কাকা আঝাপুর যাব শুনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন আঝাপুর যাবেন?'

'একাধিক আঝাপুর আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। কুলীনগ্রামের দক্ষিণে আবুজহাটি আঝাপুর বা চক-আঝাপুর আর মশাগ্রামের পাশে সপ্তদেউল আঝাপুর।'

জানালাম, 'আমার লক্ষ্যস্থল সপ্তদেউল আঝাপুর—।'

মেমারী রেলষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে জি. টি. রোডের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। বর্ধমান-তারকেশ্বর বা মেমারী-তারকেশ্বরের বাসে যেতে হবে। বাস ছাড়ে প্রতি আধঘণ্টা পর পর। মেমারী থেকে আঝাপুরের দূরত্ব বড় জোর মাইল চারেক। বাস ভাড়া পঁচিশ পয়সা। ইতিমধ্যে হাওড়া থেকে বর্ধমানের দ্বিতীয় লোকাল ট্রেনটি এসে পৌছল। বেশ কয়েকজন যাত্রী বাসে উঠল। মেমারী থেকে সকাল সাতটা চল্লিশে বাস ছেড়ে ঠিক আটটার সময় আঝাপুর স্কুলের সামনে পৌছল। স্কুলের উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে সামান্য একটু এগিয়ে গ্রামের শিবমন্দির। মন্দিরের বয়স একশো বছরের বেশী হবে না বলেই মনে হয়। মন্দিরের সামনে সুন্দর পোড়ামাটির অলংকরণ।

আঝাপুর গ্রামটি বেশ বড়। প্রায় চার পাঁচ হাজার লোকের বাস। অধিকাংশই কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের হিন্দু। শিক্ষিতের সংখ্যাও প্রচুর। এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন সাহিত্যিক কৃষ্ণধন দে, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি। শিবমন্দিরের পাশেই একটি

চায়ের দোকান। এক বৃদ্ধ বসেছিলেন, তাকে প্রশ্ন করে জানলাম এখানকার প্রচলিত কিম্বদন্তী—গ্রামের নাম এক সময়ে ছিল রাজাপুর, অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে, আঝাপুর। এখানে ছিল (মুসলমান যুগেরও আগে) এক সদ্‌গোপ শৈব রাজা শালিবাহনের রাজধানী। গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে তখন বয়ে যেত কীর্তি নদী। রাঢ়ের গন্ধবণিক তাম্বুলীবণিক ও সুবর্ণবণিক সওদাগরেরা এই নদীপথে তাদের বাণিজ্য-তরী নিয়ে এসে ঢুকত ভাগীরথীতে। সেখান থেকে সরস্বতী নদীপথে তারা যেত তাম্রলিপ্ত হয়ে দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য করতে। কীর্তি-নদীর পাড়ে ছিল সাত ভাই সওদাগরের বাড়ী। মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য সাত ভাই সাতটি বিরাট বিরাট মন্দির বা দেউল তৈরী করেন। সেই গগনচুম্বী সুন্দর মন্দিরগুলি দেখিয়ে বড় ছয় ভাই মাকে বলেন, 'মা তোমার ঋণ তো শোধ হোল, তুমি খুশি তো?' তাদের কথা শেষ হতে না হতে ছ'টি দেউল মাটিতে ধ্বসে পড়ল। ছোট ভাই শুধু মাতৃঋণ শোধ করা যায় না মনে করায় তার তৈরী দেউলটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'ঐ সাত দেউল থেকে গ্রামের নাম হয়েছে সপ্তদেউল-আঝাপুর।' চায়ের দোকানদার রহস্য করে বললে, 'সুদ্ধ ভাষায় সপ্তদেউল না বলে বলুন সাত দেউল (দেউলিয়া) আঝাপুর।' এতবড় গ্রাম, ক্যানেলের জল নিয়ে ধান বেচে অনেকেই হাজার হাজার টাকা করে ফেলেছে, কিন্তু দিল্ এমন দেউলে হয়ে গেছে যে একটা মেয়েস্কুলের বাড়ী বানাবার টাকা জুটলো না গ্রামে। ছেলেদের স্কুল বাড়ীতে কোনমতে ক্লাস করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের এলাকার মধ্যেই একটা রেল ষ্টেশন রয়েছে কিন্তু নাম হয়েছে মশাগ্রাম। কারণ, মশাগ্রাম দু'মাইল দূরে হলেও সেখানে দু-চার জনের কলমের জোর আছে। আর আঝাপুরের লোকেরা দেউলে হয়েছে, তাদের কলমে জোর কোথায় যে সরকারের সাথে লেখাপড়া করে ষ্টেশনের নামটি নিজেদের গ্রামের নামে করে নেবে। তৃতীয়তঃ গ্রামে আপনি বিদেশী এসেছেন, দু'একটা বুড়ো মানুষ ছাড়া

একালের শিক্ষিত ছেলেদের কাউকে গ্রাম-সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে বিষয়ে কিছু বলা দূরে থাক, জবাব দেবার ভদ্রতাটুকু পাবেন না। এবং দেখতে পাবেন, সন্ধ্যে বেলায় মেমারী থেকে মা কালী-মার্কা বোতল হাতে বাস থেকে নেমে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ফিরছেন সেই-সব ছেলেরা।......সব রকমে দেউলে হয়েছে এককালের সপ্তদেউল রাজাপুর। আমি বলি, আমাদের মত হতচ্ছাড়াদের গাঁয়ের নাম সাতদেউলে আঝাপুর।'

এগিয়ে গেলাম হাটতলার দিকে।

হাটতলায় কোনমতে একটা দোকানে এক কাপ চা খেয়ে পুব দিকে সামান্য এগিয়ে পেলাম কৃষিবিভাগের সেচ খাল। খালের ধারে-ধারে প্রায় এক মাইল এগিয়ে গিয়ে একটা পুলের উপর দিয়ে খাল পার হয়ে সামনেই দেউলপোতা গ্রাম। দূর থেকেই প্রাচীন উঁচু দেউলটির চূড়ো চোখে পড়ছিল গাছের উপর ছাড়িয়ে।৹ কাছে এসে দেখলাম, দেউলের অবস্থান যে জমিতে সে জমিটিও চারদিকের মাঠ থেকে প্রায় দশ বার ফুট উঁচু।

মন্দির-সংলগ্ন এলাকা অন্ততঃ ত্রিশ বিঘা জমি, সবটাই প্রাচীন ইটের ঢিবি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটা মামুলি নোটিশ রয়েছে—'এই পুরাতত্ত্ব নষ্ট করলে ৫০০ টাকা জরিমানা হবে।' কিন্তু নোটিশের চোখ থাকলে দেখতে পেত, ঢিবি খুঁড়ে গাড়ী-গাড়ী ভাঙ্গা ইট নিয়ে গ্রামের লোকেরা নিজেদের বাড়ীর সামনের কাঁচা রাস্তা পাকা করে নিয়েছে।

মন্দির বা দেউলের উচ্চতা প্রায় আশি ফুট। চারদিকের ইটের ভগ্নস্তূপ দেখে বোঝা যায়, বিরাট এলাকা জুড়ে এক সময় একটি মন্দিরময় প্রাসাদ ছিল। মূল মন্দিরের কিছুটা দাঁড়িয়ে আছে, সংলগ্ন বাকী ঘরবাড়ী শতাব্দীকাল আগেই মাটিতে মিশে গেছে।

মন্দিরের ভিতর কোন দেবতা নাই। কে বা কারা কিছু দিন আগে আগুন জ্বালিয়েছিল, ছাইয়ের গাদা রয়েছে। মন্দিরের ভিতর

ঢুকে উপরের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। উপরের দিকে মুখ করে আওয়াজ করলে যে ভাবে স্পষ্ট প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, তাতে বুঝলাম মন্দিরের ভিতরের ফাঁকা জায়গার উচ্চতা ৬০।৭০ ফুটের কম হবে না।

যে অঞ্চলে মন্দিরটি রয়েছে তার বর্তমান নাম দেউলপোতা হলেও, প্রকৃতপক্ষে আঝাপুরের এটি একটি পাড়া-বিশেষ। বাসিন্দা প্রায় একশ ঘর, সবাই মুসলমান। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের ঘটনা, আঝাপুরের কিছুলোক বর্ধমানের মহারাজের কাছে এই প্রাচীন মন্দির বা দেউলটির সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন করেন। মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জনকে সাথে নিয়ে এখানে আসেন। লর্ড কার্জনের সৌজন্যে সে সময় দেউলটি কিছু সংস্কার হয়। তখন মন্দিরের চারদিকে আরও কয়েকটি ভাঙ্গা ঘর ছিল, তারই একটির মধ্যে একটি নাক-ভাঙ্গা কালো পাথরের বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া যায়। সেটি বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

স্থানীয় এক বৃদ্ধ মুসলমানের মুখে শুনলাম, আশেপাশে আরও কিছু পাথরের মূর্তি ও প্রাচীন নিদর্শন ছিল। সেগুলি বাইরের লোকেরা নিয়ে গেছে।

খালের ধারের রাস্তা ধরে হাটতলার কাছে ফিরে এসে ঐ খালের ধারে ধারে আরও প্রায় একমাইল দক্ষিণ দিকে গিয়ে পেলাম, শিবানী মন্দির। বিগ্রহ বহু প্রাচীন শৃগাল মূর্তি। মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন।

পুরোহিতের মুখে শুনলাম (চণ্ডীতে আছে), দেবী কালিকা রক্তবীজকে হত্যা করতে গিয়ে দেখলেন তার রক্ত মাটিতে পড়লেই নব রক্তবীজের জন্ম হয়। তখন দেবী কালিকা নিজে শিবামূর্তি ধারণ করে ঐ রক্ত মাটিতে পড়ামাত্র বা পড়ার আগেই পান করে নিতে লাগলেন এবং এইভাবে অসুর-রক্তবীজের বিনাশ হলো। শিবমূর্তি নাকি তন্ত্রোক্ত কালিকার এক বিশেষ রূপ।

শিবা অথবা শিবানী মন্দির থেকে বেরিয়ে পৌঁছলাম আদমপুরের যোগীন চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী। তার বাড়ীতে রয়েছে রাজা শালিবাহন পূজিত জগন্নাথ বিগ্রহ।

সারাদিন অভুক্ত ( আদমপুরে এককাপ চা পাওয়ার মত দোকানও পেলাম না )। ক্লান্ত পা দু'খানিকে কোনমতে টেনে হাজির হলাম বিকাল সওয়া চারটের সময় মশাগ্রাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনের কাছেই বাজার, সপ্তাহে দু'দিন হাটও হয়। মিষ্টির দোকানও মোটামুটি চলনসই। সওয়া পাঁচটার আগে ট্রেন নেই। ধীরে সুস্থে বিশ্রাম ও জলযোগ সেরে ট্রেনে উঠলাম। বাড়তি সুবিধা এই, ট্রেনটি হাওড়ায় না গিয়ে শিয়ালদায় পৌঁছাল রাত্রি সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে।

## দশ

### সোমড়া

জল-ঝড়ে ভিজে ফেরার জন্যই হোক বা রাত এগারটার পর ফেরার জন্যই হোক, তিন-চার সপ্তাহ অপরেশ এণ্ড কোম্পানী আর বেড়ানোর নাম করে না। বেড়ানও এক নেশা। এবার একাই বেরিয়ে পড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধনী কাব্যে পড়েছিলাম :

"গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানা গ্রাম,

সোমড়া শবিড়া বৈষ্ণনিকরের ধাম।"—সোমড়াই ছিল লক্ষ্যস্থল। ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলপথে বলাগড়ের পরের স্টেশনই সোমড়া বাজার। এখানে গঙ্গা পুব থেকে পশ্চিম দিকে গ্রামের কোল ঘেঁষে দক্ষিণ-মুখী হয়েছে। সকাল সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সালার প্যাসেঞ্জারে চেপে বসলাম। গাড়ী নৈহাটী হয়ে জুবিলী ব্রীজ পার হয়ে এল ব্যাণ্ডেলের দিকে। নৈহাটী স্টেশন থেকে উঠে সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক আমার পাশেই আসন নিলেন, সঙ্গে-

লটবহর ও নারীশিশুর এক বিশাল ফৌজ। ফাঁকা গাড়ী কোলাহল-মুখর হয়ে উঠল। গাড়ী ব্যাণ্ডেল পৌছল। এখানে ইঞ্জিন বদলের পালা। গাড়ী প্রায় মিনিট পনের থামবে। নেমে চায়ের তৃষ্ণা মেটানর জন্য এগোলাম। এক চায়ের ট্রলিওয়ালার সামনে বেশ ভীড়। সেইখানেই এগোলাম। বহুদিন বাইরে ঘুরে ঘুরে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে চা ও খাবার খেতে গেলে যে দোকানে সব সময় ভীড় থাকে সেখানে ঢোকা ভাল, কারণ, তাদের অন্ততঃ সাতদিনের পচা মাল ঘরে পড়ে থাকে না। সামনে হাজির হওয়া মাত্র পশ্চিমদেশবাসী চাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'চায়ে ঔর চাফি?'

'চাফি কৌন চিজ?'

পাশেই ভাঁড়-হাতে দাঁড়ান এক ডেলি প্যাসেঞ্জার জবাব দিলেন, 'চা পনের পয়সা আর চায়ের সাথে কফি মিশিয়ে যে মিক্শ্চার তৈরী হয় তাকে আমরা বলি, চাফি। দাম, কুড়ি পয়সা। খাসা চিজ।'

'তবে চাফিই দেখি।' ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে এর ব্যবসায়ী বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না।

ব্যাণ্ডেল থেকে গাড়ী ছাড়বার পর, গাড়ীতে বহু খাবারের ভেণ্ডারের আগমন হোলো। সবায়েরই মাথায় খাবারের বাক্স বা পাত্র, কাঁধে জলের টিন। ত্রিবেণী থেকে গাড়ী ছেড়েছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এখন হঠাৎ এক ভেণ্ডারের মুখে খাবারের দাম শুনে আৎকে উঠলাম। "সন্দেশ! বড়-বড় সন্দেশ টাকায় কুড়িটা।' তাকিয়ে দেখি সন্দেশের আকৃতি মন্দ নয়। কলকাতার আটআনার সাইজের চেয়ে খুব একটা ছোট হবে না।

'খেয়ে দেখুন, খারাপ হলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, দাম লাগবে না। চাই সন্দেশ—'

পাশের সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবেন'? আমরা সোমড়া যাচ্ছি শুনে তিনি বললেন, 'ঐ সব খাবার সোমড়া বাজারের সৃষ্টি। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে অন্ততঃ পঞ্চাশজন খাবারের ভেণ্ডার

আছে যারা এই সব সস্তা মিষ্টি বিক্রি করে সোমড়া থেকে এনে।' 'ব্যাপারটা কি, এরা এত সস্তায় কি করে বিক্রি করে'? ভদ্রলোক বললেন, 'বছর চল্লিশ আগেও সোমড়ার পশ্চিমে বেহুলা নদীর দু'ধারে এবং সোমড়ার পূর্বদিকে শ্রীপুরের ও গুপ্তিপাড়ার চড়ায় ছিল দিগন্ত-বিস্তৃত চারণ খেত। বহু গোয়ালারও বাস ছিল সেখানে। তাদের দুধ-ছানা বিক্রির একমাত্র কেন্দ্র ছিল সোমড়া। সোমড়া-সুখাড়ে অঞ্চলে খানেওয়ালা জমিদারও ছিল বেশ কয়েক ঘর। সেজন্য বহুদিন আগে থেকেই ময়রাদের শিল্প গড়ে উঠেছিল সোমড়া বাজারে। সোমড়ার ময়রারা হুগলী, বর্ধমান, এমনকি কলকাতা পর্যন্ত ক্রিয়াকর্মে মিষ্টি সরবরাহ করত। ক্রমে সমস্ত চারণ খেত উঠে গেছে, গোয়ালারা নির্মূল হয়ে গেছে, ছানা মেলে না। জমিদার বাবুরাও আর নেই। কিন্তু ময়রারা বাঁচার তাগিদে নতুন নতুন ভেজালের পথ আবিষ্কার করে নিয়ে, সোমড়ার সস্তা মিষ্টি পাওয়ার ঐতিহ্যটা বজায় রেখেছে।' ভদ্রলোক আরও বললেন, এদের খাবারে ছানা বেশী না থাকলেও বিষাক্ত জিনিস নেই। সস্তা চাল-ডালই আছে। কাঁচা দুধ থেকে মেসিনের সাহায্যে আগে মাখনটা তুলে নেয়। তারপর তার মধ্যে আলোচালের গুঁড়ো (সবেদা) জলে গুলে জ্বালিয়ে মিশিয়ে নেয়। সেই দুধ থেকে ছানা কাটালে মাখন বিহীন ছানার সাথে চালের গুঁড়ো ও জল মিশে প্রচুর ছানা হয়। সাধারণতঃ ভাল ছানা না হলে রসগোল্লা তৈরী করতে পারে না অন্য জায়গার কারিগরেরা, কিন্তু সোমড়ার কয়েকজন ময়রা আছে যারা ঐ চালের গুঁড়োর ছানার সাথে খেসারীর ডালবাটা ফেটিয়ে মিশিয়ে নিয়ে, সুন্দর দেখতে ও খেতে রসগোল্লা আর সন্দেশ তৈরী করে। এই সোমড়ার কারিগররাই কলকাতায় চিৎপুরের নোতুনবাজারে দত্তপুকুরের মাখন-তোলা ছানায় সস্তা সন্দেশ তৈরী করে কেমন বাজার মাত করে দিয়েছে দেখবেন।'

এক নম্বর দু'নম্বর ছানার নয়, চার নম্বর ছানায়ও দেখনহাসি মিষ্টি তৈরী করাই আমাদের সোমড়ার ওয়ার্কম্যানশিপের বিশেষত্ব।'

তিনি মিষ্টি—ব্যাখ্যা শেষ করে মিষ্টি হাসিতে গাড়ীর কামরাটি সচকিত করে তুললেন।

ভদ্রলোকের মুখেই শুনলাম, সোমড়া অতি প্রাচীন গ্রাম। গঙ্গার ভাঙ্গা-গড়ার ফলে দু'একটা পাড়া ভেঙ্গেছে-গড়েছে, কিন্তু যদি ভালভাবে বিচার করা যায়, বোঝা যাবে, সোমড়ার ইতিহাসের মূল সেই বৌদ্ধযুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে সোমড়া বৈদ্য-প্রধান হলেও এই গ্রামে বৈদ্যদের আগমন আরম্ভ হয়েছে মুর্শিদকুলি খাঁ বা তাঁরই কাছাকাছি যুগ থেকে। অর্থাৎ যখন বাংলার রাজশক্তি এসে ঘাঁটি গাড়ল মুর্শিদাবাদে, তখন থেকে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সোমড়ার প্রাচীনতম হলেন বাড়ুজ্যেরা। এরা যদিও নিজেদের বল্লালী-কুলিন বলে দাবী করেন তবুও বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এরা-কনৌজীয়া নন। এরা আদি বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক অথবা কনৌজীয়া মহর্ষি ভট্টনারায়ণের পুত্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় আদি বরাহের কোন বংশধর পরবর্তীকালে সোমড়ার কোন বজ্রযানী বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের পরিবারে বিয়ে করে তাঁদের কুলাচার গ্রহণ করেছে। প্রাচীন বৌদ্ধমতে পঞ্চ কুলই হচ্ছে সংসারের বীজস্বরূপ। বৌদ্ধতন্ত্রের এই পঞ্চকুলের অন্যতম হচ্ছে, বজ্র। বজ্রযান মতে যিনি নিজের জ্ঞান ও সামর্থ অনুসারে দীক্ষিত হয়ে সাধনা করেন তাঁকেই বলা হয়, কুলীন। এই বজ্রযানীদের তন্ত্রসাধনার দেবী হচ্ছেন একজটা, বৌদ্ধসাধনমালায় তার ধ্যান মন্ত্রটি হোল :

"কৃষ্ণাবর্ন্টাঃ মতাঃ সর্বাঃ ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
এক বক্ত্রা ত্রিনেত্রাশ্ব পিঙ্গোর্ধ কেশ মূর্ধজাঃ।
খর্বা লম্বোদরা রৌদ্রাঃ প্রত্যালীঢ় পদস্থিতাঃ।
রোষ করাল বক্ত্রা মুণ্ডমালা বিভূষিতাঃ।
কুণপস্থা মহাভীমা মৌলাবক্ষোভ্য ভূষিতাঃ।
নব যৌবন সম্পনাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাঃ।

সোমড়ার বাড়ুজ্যেরা যদিও দাবী করেন তাঁদের কুলদেবী তারা এবং

বছর বছর নূতন নূতন শিল্পীর হাতে পড়ে বর্তমানে তাঁদের উপাস্য দেবী তারা হিন্দু শাক্ত সিংহবাহিনী মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন; কিন্তু তাঁদের তারার ধ্যান-মন্ত্রটি হোল পূর্বোক্ত বৌদ্ধ দেবী একজটার ধ্যান-মন্ত্র। এর থেকেই বোঝা যায়, সোমড়ার আদি বংশটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক। ভদ্রলোক আরো বললেন, বছর ত্রিশেক আগে গঙ্গার ভাঙ্গনে দু'টি পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলিও বৌদ্ধ তথাগতের ভগ্ন মূর্তি।

হুগলী জেলার সেন ও দাস বংশের বৈদ্যরা প্রথম এসে বসতি আরম্ভ করেন ১৫৫০ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়, গুপ্তিপাড়ায়। মুসলমান দরবারে এঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নেন। এঁদেরই এক আত্মীয় দেওয়ান রামচন্দ্র রায়। ভাগীরথীর পূর্বপারের পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে এসে সোমড়ায় গড়খাই কেটে বিরাট প্রাসাদ তৈরী ক'রেছিলেন অষ্টাদশ শতকে। যতদূর জানা যায়, রায়-রায়ান রামচন্দ্র ছিলেন সুজাউদ্দিনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

মুর্শিদকুলি খাঁকে মোগল সম্রাট বাংলায় পাঠান প্রথমে দেওয়ান হিসাবে নবাব-নাজিমের অধীনে রাজস্ব বিভাগের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য।

মুর্শিদকুলি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ সন্তান, ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রিত হন এক সদাশয় মুসলমানের কাছে, পরবর্তী জীবনে হয়ে ওঠেন গোঁড়া হিন্দু-বিদ্বেষী। রাজস্ব ও দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য গঠনে মুর্শিদকুলির যোগ্যতার কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। লোক-চরিত্র বিচারেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি বাংলায় এসেই এখানকার রাজস্বের আয় দ্বিগুণ করে ফেলেন। সুবাদারের সাথে তাঁর আরম্ভ হয় মনান্তর শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কাজ নিয়ে। সম্রাট্ ঔরংজেব ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিকে একাধারে সুবাদার ও দেওয়ানের দায়িত্ব দিয়ে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর পরই মুর্শিদকুলি দিল্লী-তক্তের দুর্বলতা উপলব্ধি করলেন এবং বার্ষিক রাজস্ব দেওয়া ছাড়া দিল্লীর সাথে সব সম্পর্ক ছেদ করে—কার্যতঃ হলেন স্বাধীন নবাব। তাঁরই হাতে

গড়া ছাত্র রামচন্দ্র। মৃত্যুর পূর্বে মুর্শিদকুলি সুজাউদ্দিনকে বলে যান, "রামচন্দ্র বয়সে তরুণ হলেও যোগ্যব্যক্তি, ওর উপর ভরসা রেখো। সুজাউদ্দিন ও পরবর্তী নবাব সরফ্‌রাজ খাঁ ছিলেন বিলাসী। সুজাউদ্দিন রামচন্দ্রকে রাজা পদবীতে ভূষিত করলেন। প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র রায়ই সুজাউদ্দিন ও সরফ্‌রাজের আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব-বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সুজাউদ্দিনের অযোগ্য পুত্র সরফরাজকে হত্যা করে আলিবর্দি খাঁ নবাব হলেন। তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, তিনি যাঁদের উপর ভরসা করেছিলেন তাঁরা সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি চাটুবাক্যে হয়ত ভুলে যেতেন। তিনি রাজস্ব-বিভাগের সর্বময় কর্তা অতি বিশ্বাসী রায়-রায়ণের চেয়ে চাটুকার কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তোষাখানার অধ্যক্ষ রায়দুর্লভকে অনেক বেশী স্নেহ করতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালীন হিন্দুসমাজের শিরোমণি ছিলেন। মিষ্টভাষী কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রে ছিলেন কলুষিত। শোনা যায়, আলিবর্দির পেয়ারের লোক হওয়ার জন্য এবং রায়দুর্লভ তাঁর সহায়তায় থাকার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র নিজের জমিদারী সংলগ্ন রায়-রায়ণ রামচন্দ্রের বাড়ীতে নিশাযোগে হামলা করতে সাহস পান। কৃষ্ণচন্দ্রের লক্ষ ছিল, রায়-রায়ণের পরিবারস্থ সুন্দরী তরুণী বিধবা নিরুপমা। কৃষ্ণচন্দ্রের সেই রাত্রের অভিযান কার্যতঃ ব্যর্থ হয়।

আলিবর্দির প্রিয় পাত্র সুবিচারের আশা নেই দেখে বাধ্য হয়ে বাংলা ১১৪৯ সালে রামচন্দ্র সেন সোমড়ায় নিজ আত্মীয় বলরাম রায়ের বাড়ীতে সপরিবারে এসে উঠলেন। এর পর তাঁর পরিবারের মেয়েরা আর কখনও ভাগীরথীর পূর্বপারে যায় নি। রামচন্দ্র যখনই জানলেন সোমড়া বাঁশবেড়িয়ার দত্ত বংশীয় রাজাদের এলাকাধীন এবং গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠের বহু বিলিযোগ্য দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তিনি গুপ্তিপাড়া মঠের সেবাইত দণ্ডী গোস্বামীর কাছে জমি প্রার্থনা করলেন। তাঁরই কাছ থেকে বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে রামচন্দ্র

রায় সোমড়ায় গড় কেটে তার মধ্যে বিরাট রাজপ্রাসাদ তৈরী করেন। তারপরও তিনি নবাব সরকারে কাজ করেন বটে কিন্তু যেটুকু না করলে চলে না ততটুকুই। তিনি ধর্মাচরণে মন দেন। তিনি মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের চণ্ডীমণ্ডপের চেয়ে সুন্দর কাঠের পূজামণ্ডপ তৈরী করান সোমড়ায়, তৈরী করেন জগদ্ধাত্রীর নবরত্ন-মন্দির। এখন দেখবেন শুধু সেগুলির ভেঙ্গে পড়ে-থাকা কঙ্কাল। আচ্ছা আসি ভাই।'

হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'এই বলাগড়েই আমরা নামব। পরের ষ্টেশন সোমড়া বাজার। আমরা জিরেটের মুখুজ্যে আশুবাবুদের একই গুষ্টি।' একটু আভিজাত্যপূর্ণ দাম্ভিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সদলবলে ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

ঠিক সাড়ে দশটায় সোমড়া ষ্টেশনে ট্রেন এল। ষ্টেশন ছোট কিন্তু যাত্রীসংখ্যা সেই অনুপাতে অনেক বেশী। ষ্টেশনে নেমেই প্রথমে লাইনের ধারে ধারে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলাম সুখাড়িয়ার একদা জমিদার মিত্র-মুস্তৌফিদের বাড়ীর দিকে। মিত্র-মুস্তৌফিদের আদিবাস নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামে। এরা রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ। কুল-উপাধি মিত্র মুস্তৌফি, নবাব প্রদত্ত পেশাগত উপাধি। মুস্তাফি বলতে বোঝাত হিসাব-রক্ষক ও হিসাব-পরীক্ষক উভয়কেই অর্থাৎ একাউনটেণ্ট বা অডিটর। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্র-মুস্তৌফি ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁর অধীন রাজস্ব-বিভাগের প্রধান হিসাব-রক্ষক। রামেশ্বর মিত্রের পুত্র অনন্তরাম সুখাড়িয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ বা তারই কাছাকাছি কোন সময়ে। সুখাড়িয়া ও সোমড়া পাশাপাশি গ্রাম। সুখাড়িয়াকে পৃথক গ্রাম না বলে বরঞ্চ সোমড়ার দক্ষিণপাড়া বলাই শোভন। সুখাড়িয়ার জমিদার বীরেশ্বর মিত্র-মুস্তৌফি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সুখাড়িয়ার বিখ্যাত আনন্দময়ীর মন্দির নির্মাণ করেন।

পথের বাঁপাশে পড়ল মিত্র-মুস্তৌফিদের বিশাল দোতলা বাড়ি। বাইরে থেকে দেখেই বোঝা গেল, পরিবার এখন বহু শরীকে ভাগ

হয়েছে। একই বাড়ি কোনখানটা খসে পড়ছে আবার কোন জায়গায় খানিকটা চকচকে রংয়ে রং করা হয়েছে, আবার কোন জায়গায় পলস্তরা ভেঙ্গে পড়েছিল, মাঝে মাঝে তালিমারা হয়েছে। জমিদার বাড়ি ছাড়িয়ে আনন্দময়ী মন্দিরের প্রাঙ্গণ সুরু। মন্দিরের সামনে একটি পুরো ফুটবল মাঠের আকারে উঠান। উঠানের পাশ দিয়ে সারি সারি শিব মন্দির। অন্যদিকে প্রশস্ত দীঘি।

মূল মন্দিরটি বিশাল। পঁচিশ শিখর-সমন্বিত। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর শ্রীধরের মন্দির ও কালনার দু'টি মন্দির ছাড়া পঁচিশ শিখর-মন্দির পশ্চিম বাংলায় আর নেই। মুস্তৌফীরা নদীয়া জেলার উলার পিতৃভিটা ছেড়ে এসে সুখাড়িয়ায় বসতি আরম্ভ করেন এবং তারপরই যেন তাঁদের গোঁ চেপে যায় নদীয়ার রাজাদের সাথে পাল্লা দিয়ে মন্দির নির্মাণে। একমাত্র সুখাড়িয়া গ্রামেই মুস্তৌফীরা বাইশটি মন্দির নির্মাণ করেন। এই বাইশটির মধ্যে আনন্দময়ীর মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ছয় ফুট উঁচু ভিত্তি বেদীর উপর দাঁড়ান একাত্তর ফুট উঁচু বিশালকায় মন্দির। সাঁইত্রিশ ফুট বর্গাকার আসনের উপর দেওয়াল। উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আচ্ছাদনের উপর একতলা, দোতলা ও তেতলার কক্ষ-চালের কমনীয় বক্রতা ও সুঠাম রত্নগুলি নিয়ে মন্দিরটিকে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের এক অনন্যসাধারণ নিদর্শন বলা চলে।

মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরী। একতলের ক্রমনিম্ন ছাদের প্রতি কোণে তিনটি করে বারটি শিখর, দোতলার ছাদে আটটি ও তেতলার ছাদের চারকোণে চারটি ও মধ্যস্থলে বৃহত্তম শিখরটি স্থাপিত। মন্দিরের স্তম্ভ, খিলান-শীর্ষ ও বহির্ভাগ টেরাকোটার সুন্দর অলংকরণে সাজান। মন্দিরের সামনের দিকে তারা, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, গণেশ, মহাবীর প্রভৃতি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি-ফলক উৎকীর্ণ। প্রতিটি মূর্তিই দেড়শ বছরের চেয়ে পুরানো হলেও জীবন্ত মনে হয়। এ ছাড়াও একাগাড়ী, সিদ্ধিঘোটা

অশ্বারোহী প্রভৃতি লৌকিক চিত্রও রয়েছে কার্নিসে আঁকা। মন্দিরের অলংকরণ দেখতে দেখতে মনে প'ড়ে যায় রাণী ভবানীর বড়নগরের চার-বাঙলা ঠাকুরবাড়ীর কথা; একই শিল্পী কি দুটি মন্দিরকে সাজিয়েছিল?

প্রচলিত কাহিনী: অপুত্রক বীরেশ্বর মুস্তৌফির আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বীরেশ্বর জবাব দিলেন, 'আমি একটা পোষ্য কন্যা নেব ঠিক করেছি, যে আনন্দময়ী মেয়েটি আমার ইহকাল-পরকাল আনন্দমুখর ক'রে রাখবে। তার পরই ১৭৩৫ শকে (১৮১৩ খৃঃ) কন্যারূপে আনন্দময়ী কালীমাতার প্রস্তরময়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পৌনে তিন হাত উঁচু শিবের বক্ষোপরি উপবিষ্টা বিগ্রহ। মন্দিরের পাশের দুটি প্রকোষ্ঠে দু'টি শিবলিঙ্গ আছে। মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় তৎকালিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের তেতলার পাঁচটি চূড়া ভেঙ্গে পড়ে। সাতাশ বছর পর বীরেশ্বরের দৌহিত্ররা বহু ব্যয়ে মন্দিরের সম্পূর্ণ সংস্কার করেন।

কিছুক্ষণ আনন্দময়ীর মন্দিরের নির্জন বারান্দায় বসে বিশ্রাম করে জমিদারবাড়ীর ডান দিকের বাগানের মাঝখানের একটি সরু পায়ে-চলা পথ বেয়ে এগিয়ে চলি নিস্তারিণী কালীর নবরত্ন মন্দিরের দিকে এই মন্দিরের বিশেষত্ব দেখলাম মন্দিরটি পশ্চিমদুয়ারী। সাধারণতঃ কালীমন্দির দক্ষিণমুখী হয়। একমাত্র গঙ্গার পূর্বপারের কয়েকটি কালীমন্দির পশ্চিমমুখী, বিগ্রহও পশ্চিমমুখী। এই সব মন্দিরগুলি সম্পর্কে এক সাধারণ প্রবাদ প্রচলিত। ভোর রাত্রি সাধক রামপ্রসাদ গঙ্গা বক্ষ দিয়ে নৌকাযোগে গান গেয়ে যাচ্ছিলেন, মা গান শোনার জন্য গঙ্গার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন, এমন সময় পুরোহিত দরজা খুলল মায়ের মুখ পশ্চিমমুখী হয়ে থাকল। সুখাড়িয়ার পূর্বদিকে দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত, ঐ কিম্বদন্তী অনুযায়ী মন্দির ও বিগ্রহ পূর্বমুখী

হওয়া উচিত। নিস্তারিণী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী: কাশীগতি মুস্তৌফী ছিলেন অপুত্রক, এবং যৌবনেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। কয়েক বৎসর বৃথা চিকিৎসার পর তিনি কালীমাতার দয়ায় যক্ষ্মারোগ থেকে মুক্ত হয়ে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। কাশীগতির মানসিক পরিবর্তন হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশ ফুট উঁচু সমতল ছাদযুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ছত্রিশ ফুট লম্বা উনত্রিশ ফুট প্রশস্ত আয়তাকার ভিত্তি-বেদীর উপর মন্দির, সামনে নাটমন্দির ছিল। তার ছাদটি ভেঙ্গে পড়েছে, দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি। মন্দিরের গর্ভগৃহে শ্বেতপাথরের পদ্মফুলের উপর শায়িত শিবের বুকের উপর দাঁড়ানো কালিকা-মূর্তি। কালোপাথরের সজীব মুর্তির মাথার উপর রূপার চাঁদোয়া।

মন্দির বহুদিন সংস্কার হয় না, পলস্তারা, আলসে ভেঙ্গে পড়ছে। শুনলাম, বসিরহাট মহকুমায় কাশীগতি মুস্তৌফীর জমিদারী ছিল ভুরকুণ্ডা মহাল। ঐ জমিদারী মহাল তিনি দেবোত্তর করে দেন দেবীর মন্দির-রক্ষা ও সেবা-পূজার জন্য। জমিদারী-প্রথা বিলোপ হওয়ার জন্য আজ মন্দিরের এই দুরবস্থা।

নিস্তারিণী মন্দিরের অদূরে হরসুন্দরী কালিকা-মন্দির। সোমড়ায় আসবার পর মুস্তৌফীরা সম্ভবতঃ প্রথমেই এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ছিল নবরত্ন ও প্রায় ষাট ফুট উঁচু। ভিত্তিবেদী, নিস্তারিণী মন্দিরের ভিত্তির চেয়ে বেশ বড় ও বর্গাকার। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে কয়েকটি চূড়া ভেঙ্গে গেলে প্রতিষ্ঠাতা রামনিধি মিত্র-মুস্তৌফীর বংশধরেরা চূড়াগুলো পুনর্নির্মাণ না ক'রে সবগুলো চূড়ো ভেঙ্গে ছাদটি পরিষ্কার করে ফেলেন। পরবর্তীকালে মন্দির প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। আমি মন্দিরের কাছে এগোতে পারলাম না। সেখানে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। বিড়লা ট্রাষ্টভাণ্ড থেকে মন্দিরের সংস্কার কাজ সুরু হয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, মুক্ত আকাশকে

চাঁদোয়া কয়ে সারা গায়ে ভাঙা-দেওয়ালের চুণ-বালি মেখে সাদা-পাথরের শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কালো পাথরের ফিট তিনেক উঁচু হরসুন্দরী কালিকা-মাতা।

মন্দিরগুলির পরেই একটি পরিখা। বর্তমানে জল কম, কচুরী-পানায় ভরা। পরিখার উপরের একটা আধভাঙা সাঁকোর উপর দিয়ে পার হ'য়ে বেরিয়ে এলাম হাইস্কুলের ধারে। স্কুলের টিউব-ওয়েলে হাত মুখ ধুয়ে পাশের একটি ছোট্ট দোকানে জুটল মাত্র এক কাপ চা। দোকানদারের নির্দেশে চললাম সোমড়ার রামচন্দ্র রায়ের ভগ্ন-প্রাসাদবাড়ির দিকে। রায়-রায়ান রাজা রামচন্দ্র রায় ছিলেন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান। তাঁর একদা-সুন্দর প্রাসাদ আজ একটি ধ্বংসস্তূপ মাত্র বলা যায়। ভাঙা প্রাসাদের ফটকের গায়ে একখানি ফলকে ইংরেজীতে লেখা :

"Here lived
Rai Raian Raja Ramchandra
(Dewan Bengal Bihar Orissa)

কাঁটাঝোপ ও জঙ্গলের জন্য সব ঘুরে দেখা গেল না। বেশ কয়েক একর জমির উপর বিস্তৃত ভেঙ্গে-পড়া বসতবাটি এলাকার মধ্যে কয়েকটা ভাঙ্গা মন্দির দেখা গেল, কোনটায় পূজা হয় বলে মনে হ'ল না! একমাত্র শিবলিঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনটিতে কোন বিগ্রহ নেই। একটিমাত্র মন্দিরে জগদ্ধাত্রী রয়েছেন, সেখানে নিত্যপূজা হয় বোঝা গেল। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ শ্লোকটি :

"বাজি=দ্বিপ=ধরাসার সুতা শেষ সুতানৈঃ,
ভূবা পরিমিতে শাকে মন্দিরাং শঙ্করোঽকরোৎ।"

সোমড়ায় কোন হোটেল পেলাম না। খাবারের দোকানে বসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে করতে শুনলাম, গ্রামের আগের সুদিন না থাকলেও দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও কালীপূজার ব্যাপকতা আছে।

একটি জিনিষ মনে হচ্ছিল, সোমড়ার নদীর পূর্বপারে শান্তিপুর

বৈষ্ণব ভাবরসে ডুবু ডুবু, উত্তরে কালনা-গুপ্তিপাড়া বৈষ্ণবতীর্থ, দক্ষিণে জীরাট-বলাগড় গঙ্গাবংশীয় বৈষ্ণবদের ঘাঁটি—চারিদিকে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে সোমড়া কিভাবে শাক্ত-তান্ত্রিক ঘাঁটি হয়ে আছে?

সোমড়া থেকে ফেরার পথে ট্রেনে বসে বার বার এই কথাটাই মনে হয়েছে মানুষের দেহ কি ক্লান্তি বোধ করে, না মন? আমি নিত্যকালের বাউণ্ডুলে, আমার বেড়াতে বেরুলে কাঁধের ঐ হালকা থলেটাই সব। যদি খুব দূর পথে যেতে হয় বড় জোর বাঁ হাতে অতি-হালকা একটি বেডিং। সঙ্গী থাকলেই অনেক বোঝা টানাটানি, দৌড়-ঝাপ, কোথায় থাকা কোথায় খাওয়া নানান ফৈজৎ, কিন্তু তবুও দেখছি একা একা সোমড়া বেড়িয়ে যেন ক্লান্ত হয়েছি। বুঝলাম, ভ্রমণ-সম্ভোগ ঠিক একলা হয় না। আর সম্ভোগে তৃপ্ত না থাকলে ক্লান্তি আসবেই।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরলাম। দেখি, অপরেশ বসে আছে। আমাকে দেখেই প্রশ্ন করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?

'সোমড়া।'

সে বলল, 'আগামী একাদশীর দিন অতি ভোরেই আমাদের বাড়ী যাবেন। আমাদের ওখান থেকেই চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব কুলিয়ার পাটে—অপরাধ-ভঞ্জনের মেলা দেখতে।'

জবাব দিলাম, 'চেষ্টা করব।'

'না, না চেষ্টা নয়, যাবেনই।' আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে অপরেশ বেরিয়ে গেল।

# এগার

## অপরাধ-ভঞ্জন

'বদ্ধ পচা জলে স্নান, সারাদিন অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পৌষের শীতে খোলা-মাঠে পড়ে থেকে কার কোন্ অপরাধটি এরা ভঞ্জন করবে, বলতে পার দাদা ?'

অপরেশের প্রশ্নটি আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে যার উদ্দেশ্যে বলা সে ঠিক জবাব দিল, 'অপরাধটি দেখলে কোথায় ? মানুষ তীর্থ ধর্ম করতে আসবে না ? যে তীর্থের যে নিয়ম সেটা তো মানতে হবে। সবাই তো তোমার মত ম্লেচ্ছ না।'

'নিমোনিয়া ধরবে যে।'

'আমার নিমোনিয়া হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও, তোমার সেবা করতে হবে না।'

স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে কিছু না ব'লে স্মিতহাস্যে চুপ করে রইলাম। কথা হচ্ছিল কুলিয়ার পাটে দাঁড়িয়ে। সকালের জলযোগ সেরে, শিপ্রা ও অপরেশকে সাথে নিয়ে বেরিয়েছিলাম অপরাধ ভঞ্জনের মেলা দেখতে।

কল্যাণী রেলষ্টেশনে নেমে সোজা পুবদিকে প্রায় দু'মাইল পথ হেঁটে পৌছেচি কুলিয়া গ্রামে। অনেকেই কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নেমে গেল। তাদের মুখে শুনলাম মেলার দু'দিন কাঁচড়াপাড়া থেকে কুলিয়ার মাঠ পর্যন্ত বাস চলাচল করে, তবে ভীড় খুব বেশী হয়। কল্যাণী ষ্টেশন থেকে একটাকা ভাড়ায় রিক্সাও পাওয়া যায়। নেতাজী স্যানাটোরিয়াম ও গান্ধী হাসপাতালের মাঝখান দিয়ে সুন্দর পীচের রাস্তা। গল্প করতে করতে হেঁটেই এসেছিলাম।

প্রবাদ : দেবানন্দ ভাগবতী ছিলেন কুলিয়া গ্রামবাসী, জ্ঞানবান,

তপস্বী, কিন্তু ভক্তিহীন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। শ্রীমদভাগবতের অধ্যাপনা করতেন। একদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্শচর শ্রীবাস পণ্ডিত, ভাগবতের ব্যাখ্যা শোনবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে আসেন। ভাগবতের শ্লোক শোনামাত্র শ্রীবাস প্রেমাবিষ্ট হলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলেন ও মাটিতে পড়ে গেলেন। পাগলের পাগলামি মনে করে দেবানন্দ ও তাঁর ছাত্ররা শ্রীবাসকে মারধর করে বাড়ীর বাইরে দূর করে দেন। এই অপরাধে নাকি তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ হন। মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্দের ভক্তিতত্ত্বে বিশ্বাস জন্মায়। তিনি বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতার। শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি ব্যবহারের জন্য তাঁর অনুশোচনা হোল। তখন এই কুলিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে যমুনা বয়ে যেত। মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রাম হয়ে কুমারহট্ট আসবার সময় দেবানন্দের শ্রীপাটের কাছে এলে দেবানন্দ মহাপ্রভুর চরণে নিজের দৈন্য জানালেন ও একখানা কুলায় করে মূলা, পালং শাক, চাল প্রভৃতি দিয়ে সিধা দেন। মহাপ্রভু দেবানন্দকে যমুনার ঘাটে স্নান করতে বলেন, যমুনার ঘাটে ডুব দেওয়া মাত্র দেবানন্দের শরীর থেকে কুষ্ঠব্যাধির চিহ্ন পর্যন্ত দূর হয়। ঐ সিধা রান্না করে মহাপ্রভু একাদশীর পারণ করেন ও যমুনার ধারে সারা রাত্র কীর্তনে অতিবাহিত করেন। কয়েক বছর পর ঐ তিথিতেই দেবানন্দ দেহত্যাগ করেন। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে দেবানন্দের বৈষ্ণব হিংসনের অপরাধ ভঞ্জন হয়েছিল বলে তদবধি ঐ দিন যমুনার ঘাটে দেবানন্দের সমাধির পাশে অপরাধ-ভঞ্জনের মেলা হয়। স্থানীয় মেয়েদের ধারণা, দেবানন্দের তিরোভাব উৎসবের দিন কুলিয়ার পাটে স্নান ও বনভোজন করলে সমস্ত অপরাধ ভঞ্জন হয় এবং জন্ম-জন্মান্তরেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

বর্তমানে যমুনা জায়গায় জায়গায় মজে গেছে। সরকার থেকে মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে মজা যমুনার বুকে কতকগুলো ঝিল তৈরী করেছে। কুলিয়ার ঝিলে সরকার থেকে মাছের গবেষণা-কেন্দ্র খোলা

হয়েছে। এই জলার ধারে জনবিরল এলাকায় দেবানন্দের শ্রীপাঠ বা কুলিয়ার পাঠ। দেবানন্দের সমাধির পাশে মহাপ্রভুর মন্দির ও তারই সামনে নাটমন্দির। মেলার দু'দিনে হাজার হাজার জনসমাগম হয়; বেশীর ভাগই কিন্তু মহিলা। মেলায় কুলা, মূলা ও পালং-শাকের বিক্রি সবচেয়ে বেশী। মেয়েরা এখানে এসে যমুনায় স্নান করে কুলায় করে সিধা নিয়ে কুলা মাথায় উলু দিতে দিতে মন্দির ও সমাধি পরিক্রমা করে। পরে কেউ কেউ মূলা পালং নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। কিন্তু বেশীর ভাগই মন্দিরের চারপাশের বিস্তৃত এলাকায় এখানে-সেখানে বসে রান্না করে বনভোজন করে। খোলা-আকাশের তলায় বা সামান্য চট টাঙিয়ে তার তলায় কীর্তন করে বা কীর্তন শুনে রাত কাটান। বাউল ও ভক্তের সংখ্যাও চার পাঁচ হাজারের কম নয়। মেলায় বেশ কয়েকটি বড় খাবারের ও চিড়া মুড়ির দোকান। হোটেল নেই। মাটির হাড়ী, চাল, তরকারীর ও রান্নার কাঠের দোকানের সংখ্যা অনেক।

যমুনা এখন আর প্রবাহিনী না হলেও দু'মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া কুলিয়া ঝিলের জল অতি স্বচ্ছ। ঝিলের পুবদিকে পিচের রাস্তা ও তার পরই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। প্রাকৃতিক শোভার তুলনা নেই। মেলার সময় ভিন্ন নির্জনতা ভীতিপ্রদ। শ্রীপাঠের দক্ষিণ দিকে সিকি মাইল এসে কুলিয়া মৎস-গবেষণা কেন্দ্রের মিউজিয়ম একটা দেখার জিনিস।

শিপ্রার বায়না, সে ঝিলে স্নান করবে, মূলা পালং কিনে কুলায় করে পূজা দেবে এবং ওখানে মাঠে রান্না করে খেয়ে বাড়ী ফিরবে। সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই আনেনি, নইলে রাত্রে গাছতলায় থেকে যাবার ইচ্ছেও ছিল।

যতদূর চোখ যায়, ঝিলের পার দিয়ে ছোট বড় দল মাঠের মাঝে বসে গেছে। রং বেরংয়ের জামা কাপড় পরা। কেউ-বা চিড়ে মুড়ি খেতে বসেছে, কেউ খেতে বসেছে বাড়ী থেকে আনা খাবার, কিন্তু

অধিকাংশই রান্না আরম্ভ করেছে। এক কথায় বলা যায়, কুলিয়ার পাটের উৎসব এক বিরাট বনভোজনের মেলা।

শিপ্রার বায়না শেষ পর্যন্ত জয়ী হোল। সে স্নান করে মাথার উপর কুলোয় করে চাল, মূলো, পালং প্রভৃতি সাজিয়ে, অন্যান্য মেয়েদের সাথে মন্দির প্রদক্ষিণ করে এল।

এক কাঁঠাল গাছের তলায় মাটির হাঁড়ি, কড়াই ও কাঠ কিনে এনে রান্না চাপাল। আমরা পাশে বসে গল্প সুরু করলাম। আমরা বসেছিলাম মেলাক্ষেত্রের প্রায় শেষের দিকে রাস্তার ধারে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একখানা রিজার্ভ বাস। যাত্রী প্রায় জন পঞ্চাশেক। এসেছেন কোন্নগর থেকে। সবাই মন্দির ও মেলা দেখতে গেছেন। তাঁদের অনেকেই স্নানও করবেন। কেবল পুরুষ-যাত্রীদের মধ্যে চারজন থেকে গেছেন। যেখানে বাস দাঁড়িয়েছে তার পাশেই মাঠের মধ্যে রান্না করছেন।

শুনলাম এঁরা সকালে বেরিয়ে মূলোজোড় কালীবাড়ীর মেলা দেখে এখানে এসেছেন। দু'টি উনুনে ভাজা, আলু কপির তরকারী, চাটনি ও লুচি তৈরী হবে। পিকনিক সেরে এঁরা ফেরার পথে হালিসহর বেড়িয়ে, দক্ষিণেশ্বর দেখে, কোন্নগর ফিরবেন। একদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম, খরচাও শুনলাম, খুব বেশী হবে না। বাস-ভাড়া সাড়ে চারশ টাকা, সঙ্গে একজন ঠাকুর এনেছেন। জোগাড়ে উদ্যোক্তারা নিজেরাই। একই পাড়ার দশ-বারটি পরিবারের লোক মোট অনুমান পঞ্চাশ জন। আটশো, সাড়ে আটশো টাকার মধ্যে পঞ্চাশ জনের বেড়ান, ধর্ম, তীর্থ, পিকনিক সব সারবেন। যা খরচা হবে সবাই ভাগ যোগ করে দেবেন।

রান্না খাওয়া শেষ করে, কিছুক্ষণ কীর্তন শুনে, নাগরদোলায় চড়ে, মেলা ঘোরা যখন শেষ করলাম তখন সূর্য পাটে বসেছে। ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে ফিরছিলাম। ঝিলের এপারে এসে দূর থেকে মনে হোল যেন কৃষ্ণা একাদশীর নক্ষত্রে ঢাকা আর একখানা আকাশ

নেমে এসেছে কুলিয়ার ঝিলের পাশের মাঠে। সেখান থেকে কানে আসছে মুক্ত-আকাশের তলে যারা থাকবে সেই চার পাঁচ হাজার লোকের আনন্দ-কোলাহল।

সেদিকে তাকিয়ে অপরেশের সকালের প্রশ্নের যেন জবাব পেলাম: বিধাতা যেদিন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন তাকে করেছিলেন যাযাবর। করে দিয়েছিলেন তাকে সারা বিশ্বের অধীশ্বর। মানুষ করতে গেল খোদার উপর খোদকারী। বনবাসী মানুষ বাঁধল ঘর, হতে চাইল তথাকথিত সভ্য। সেই হোলো তাঁর প্রথম অপরাধ। পৃথিবীর সন্তান মানুষের মাথার উপর পৃথিবীর পিতা সবিতা আশীর্বাণী ঢালবেন তা বুঝি তথাকথিত সভ্য মানুষের পছন্দ হয়নি, তাই মাথার উপর গড়ল ছাদ, বন্ধ করল মুক্ত বায়ু, গড়ল দেওয়াল। পিতামহের আশীর্বাদ অবহেলা করে মানুষ করল আর এক অপরাধ। তাই সভ্যতার সাথে চির-বিবাদ আনন্দের।

মানুষ বুঝি তার নিজের সেই অপরাধ-ভঞ্জনের জন্য রান্নাঘর ছেড়ে বেরোয় বনভোজনে, অট্টালিকা ছেড়ে একটা রাত কাটাতে আসে মুক্ত আকাশে তলায়। পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে বেরোয় ভ্রমণে।

খোদার উপর খোদকারী করে অপরাধ করেছে সারা মনুষ্য-সমাজ, তাই বনভোজন ও ভ্রমণের মাধ্যমে বুঝি অপরাধ ভঞ্জন করতে চায় সারা বিশ্ববাসী।

কল্যাণী ষ্টেশনে এসে ট্রেনে ওঠার পর শিপ্রা বেশ অনুযোগের সুরেই বলল, 'এত লোক মেলায় মুক্ত আকাশের তলায় রাত কাটাবে, আমাদেরও গান শুনে একটা রাত কাটালে কি দোষ হ'ত? জীবনের এ-একটা নূতন থ্রীল।' অপরেশ ওর কথা শুনে খিঁচিয়ে উঠল। আমি হালকাভাবে ওর কথার জবাব দিলাম, 'মেলায় যদি রাত কাটাতে হয় তবে, কেঁদুলী মেলায় বা ঘোষপাড়ার মেলায় রাত কাটানো বরং ভালো। সেখানে সারা রাত শোনা যায় বাউলের গান, দেখা হয় বহু অনাসক্ত ভক্তের সঙ্গে।'

'কেঁদুলীর মেলা তো বীরভূমে, ঘোষপাড়ার মেলা কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল শিপ্রা।

এই কল্যাণীরই পশ্চিমদিকে মাইল খানেক দূরে। একমাস দেরী আছে, শ্রীপঞ্চমীর আগের রাত্রে মেলা। আমি আগে কখনও আসিনি এবার মেলা দেখতে আসবার ইচ্ছে আছে।'

'কি গো, আসবে নাকি? একটা তো রাত্রি!' অপরেশকে জিজ্ঞাসা করল শিপ্রা।

'সে তখন দেখা যাবে।' অপরেশ যেন একটু বিরক্ত ও গম্ভীর—, আমি বলি, 'তার চেয়ে বরং চল আমার সাথে। আসছে সপ্তাহে একদিন প্রদ্যোতের ওখান থেকে বেড়িয়ে আসি। প্রদ্যোৎ আমার শিল্পী বন্ধু।'

## বার

### গান্ধীগ্রাম

শিল্পীবন্ধুর ওখানে যাব বলে সকাল-সকাল মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে ট্রেনে নৈহাটী এসে নদী পার হয়ে (লঞ্চে) এগোলাম চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ের দিকে। উদ্দেশ্য—ঊনিশ নম্বর বাসে গিয়ে নামব রাজহাট। প্রথমে ভেবেছিলাম, ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত ট্রেনে চলে যাই, ওখান থেকেও ঊনিশ নম্বর পোলবাগামী বাস পাব, কিন্তু বাসগুলি চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় থেকে ছাড়বার সময়ই এমনভাবে বোঝাই হয়ে যায় যে ব্যাণ্ডেল থেকে উঠতে হলে আগে বেশ কিছুদিন আগাশীর সার্কাসের দলে ট্রেনিং নেওয়া দরকার।

দূর থেকে চোখে পড়ল, ষ্ট্যাণ্ডে বহু বাস দাঁড়িয়ে। জোরপায়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়েই বোঝা গেল, অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নয়। বাসের দু'চারজন ড্রাইভার ও কনডাকটার, এদিক ওদিক

ঘোরাফেরা করছে বটে কিন্তু সবগুলি বাসই খালি, কোনোটিতে যাত্রী নেই। শুনলাম, ব্যাণ্ডেল গীর্জার কাছে একটি বাসের সাথে রিক্সার ধাক্কা লাগায় সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাকি স্থানীয় লোকেদের সাথে বাস-চালকদের আরম্ভ হয় বচসা, ক্রমে হাতাহাতি, লোহার রড, পাইপগান, দশ-বারজনের ইমামবাড়া হাসপাতাল যাত্রা ও শেষ সংবাদ দু'জনের পরপার গমন। ফলে সমস্ত রুটেই বাসের চলাচল বন্ধ।

একেই কয়েক মাস ধরে শিল্পীর ওখানে যাব-যাব করেও যাওয়া হচ্ছে না, আজ তৈরী হয়ে যদিও-বা বেরুলাম কিন্তু অর্ধপথে এসে যাত্রায় বাধা। ইজ্জতেরও প্রশ্ন রয়েছে, সঙ্গে আছে ওরা দুজন। বিশেষ করে ভাবছি শিপ্রার কথা। বেচারী ভোরে উঠেই রান্নাবান্না সেরেছে। শিল্পীর বাড়ী যাচ্ছে বলে কিনা জানি না সেজেছেও যেন একটু বেশী যত্নে। আজ ওকে দেখেই যেন মনে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'প্রিয়ে, গৌরবরণ তনু-দেহটির মূলে ফল্‌সাবরণ, সাড়িটি ঘিরেছে ভালো।' গণ্ডের পাশে ছোট্ট চুণির দুল, রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা। সাবধানে টানা 'কম্প্রকাজল রেখা'। সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন?' জবাব দিলাম, 'গান্ধীগ্রাম।'

'রিক্‌সাওয়ালা অতো ভিতরে যেতে চাইবে কিনা জানি না। আমি যাব রাজঘাট দু'টাকায় দু'খানা রিকসা যাবে, চলুন, চারজনে চলে যাই। আপনি দেড়টাকা দিয়ে দেবেন। রাজঘাট থেকে ওটুকু হেঁটে চলে যেতে পারবেন।'

বাস বন্ধ, ফলে দুপুর বেলায়ও পথচারীর সংখ্যা খুব কম নয়। তাদের খানিকটা বিরক্তি উৎপাদন ক'রে একটানা ফোঁক ফোঁক শব্দ করে আমাদের রিক্‌সা দু'খানি ছুটে চলল। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের কাছ থেকে আমরা সোজা পশ্চিম দিকে পোলবা রোড ধরে এগোলাম। ডানদিকে পড়ল দেবানন্দপুর যাবার পথ। আর একটু এগিয়ে আমরা সরস্বতী নদীর পুল পার হলাম। এক সময় এই নদীর বুকে

ভেসে চলত, সপ্তগ্রাম থেকে পণ্য সম্ভার নিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ তাম্রলিপ্তির পথে। এখন এই নদীর অবস্থা দেখে সে সব প্রাচীন কাহিনী বিশ্বাস করতে মন চায় না। দেখলাম, একপাশ দিয়ে একশ দেড়শ ফুট চওড়া একটা মজা খাল, বুকে এক হাঁটু জল আর থকৃথকে কাদা। নদীর মজে যাওয়া বিশাল বুক জুড়ে হয়েছে আই আর এইট বোরো ধানের চাষ। মজে-যাওয়া নদীর বুকে যেখানটি ক্রমে ক্রমে বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে সেখানে হচ্ছে চাঁপাকলার ক্ষেত।

সহযাত্রী বৃদ্ধ পাল মশায়ের মুখে শুনলাম, ওনারা এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাসিন্দা, জাতিতে বারুই। সপ্তগ্রামের সুদিনে অর্থাৎ ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮) সময় থেকে মুর্শিদকুলির (১৭০৩-১৭২৭) সময় পর্যন্ত, এই চারশ বছর ধরে, সপ্তগ্রামের বণিকেরা যেমন একদিকে আনন্দের সাথে বাণিজ্য করে চলেছে—তেমনি তাদের দু'টি অর্থকরী পণ্য পান ও শুপারি চাষ করে যোগান দিয়েছে সরস্বতী, কুন্তি, কুন্তল ও ঘিয়া নদীর তীরে বসবাসকারী বারুজীবীরা। তখন সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, মহানাদ, পাণ্ডুয়া ও দ্বারবাসিনী সহরের বাসিন্দাদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী ছিল সুবর্ণবণিক, গান্ধিকবণিক তাম্বুলীবণিক ও মুসলমানেরা, আর গ্রামের (বর্তমান বলাগড়, মগরা, পোলবা সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলা থানা অঞ্চল) অধিবাসীরা ছিল মূলতঃ সদগোপ ও বারুই-রা। তখন এই সব অঞ্চলে ছিল সারি-সারি পানের বরজ। এল আলিবর্দীর যুগ। ব্যবসাকেন্দ্র চলে গেল কলকাতায়। জলপথে হার্মাদদের ও ডাঙ্গাপথে বর্গীর আক্রমণে বাঙলার সমাজ-জীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বহু পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছাড়ল পিতৃভূমি। সবচেশে বেশী আক্রমণ পড়ল বারুইদের উপর, হার্মাদ ও বর্গীরা লুটপাট করার পর ফেরার পথের পাশে পানের বরোজে আগুন জ্বালিয়ে পৈশাচিক আনন্দ পেত। বারুইরা হ'ত নিঃস্ব। ফলে, হুগলীর বারুজীবী-সমাজ চণ্ডীতলা, বলাগড় পোলবা সিঙ্গুর-এলাকা ত্যাগ করল দলবদ্ধভাবে, আশ্রয় নিল খুলনা-যশোরে।

অষ্টাদশ শতকে নোতুন বারুইদের সমাজ গড়ে উঠেছিল খুলনা, যশোর, বরিশাল অঞ্চলে। আজ তারা উন্নত, ধনী, শিক্ষিত কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ কেন যে পড়েছিলেন সেই পোড়া-ভিটে কামড়ে জানি না। তাই আমরা আজ সবচেয়ে অপাংতেয় হয়ে পড়ে আছি। পানের চাষ, ব্যবসা, মোকাম সব উঠে গেছে। ধরেছিলাম কলার চাষ, তাও ক্রমে-ক্রমে বিহারী-মাড়োয়াড়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে' কথা শেষ করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পাল মশায়।

সরস্বতীর পুল পার হয়ে আমরা ডান দিকের পথে এগোলাম। বাঁ দিকে নদীর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে কোরোলার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর দিকে। পাল-মশায়ের মুখে শুনলাম, দেবী জাগ্রতা। হুগলী জেলার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ও ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য ভক্তরাই এখানে আসেন বেশী। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, কালী পূজার দিন উপবাসী থেকে কোরোলার সিদ্ধেশ্বরীকে অঞ্জলি প্রদান করলে নিঃসন্তানের সন্তান লাভ হয় ও যে কোন বাসনা সিদ্ধ হয়।

বর্তমানে যেখানে কোরোলার কালীমন্দির ও গ্রাম, আজ থেকে চার পাঁচ'শ বছর আগে সেখান দিয়ে বয়ে যেত প্রবলস্রোতা সরস্বতী। নদীর পশ্চিমতীরের দিকে প্রথমে মজে গিয়ে চর পড়তে আরম্ভ করে। কালে-কালে সেই চরের উপর গড়ে উঠে মুসলমান-প্রধান কোরোলা গ্রাম। প্রায় তিনশ বছর আগে ঐ গ্রামের ঘোষাল বংশের এক পূর্বপুরুষ পুকুর-কাটানর সময় কালো পাথরের কালিকা-মূর্তি পান ও নিজগৃহে দেবীর প্রতিষ্ঠা ক'রে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ঐ বংশের ৺বিষ্ণু ঘোষাল। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত ঘোষালদের দুই ভাগিনেয় বংশ। কিম্বদন্তী, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে একদল বর্গী দক্ষিণ দিক থেকে গ্রামের পর গ্রাম লুট করতে করতে সুগন্ধা গ্রামের দক্ষিণস্থ ঘিয়া নদীর ধার পর্যন্ত এগিয়ে আসে। সুগন্ধার জমিদার মশায় পরিবারের মেয়েদের ও কিছু ধনসম্পদ পাঠিয়ে দেন বাঁশবেড়িয়ার দত্ত-বংশীয় রাজাদের গড়খাই

ঘেরা বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। নিজে এসে হত্যা দিয়ে পড়েন কোরোলার কালীবাড়ীতে। হঠাৎ অকালে আরম্ভ হয় জল ঝড়। তখন শীতকাল। বর্ষণ চলে একটানা সাত দিন। ঘিয়া নদীতে নামে ঢল। বর্গীর দল ফিরে যায় পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে। মন্দিরের সামনেই যাত্রীদের থাকবার জন্যে পাকা বিশ্রাম-ভবন আছে। কালী-পূজার দিন এখানে মহা-জাঁকজমক করে পূজা হয় ও বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ভক্ত ও ঘোষালদের শিষ্য সমাগম হয়। আগে কালী পূজার দিন কয়েকশ পশুবলি দেওয়া হোত। ডুমুরদহের উত্তম-আশ্রমের গুরুদেবের অনুরোধে এখানে পশুবলি বন্ধ হয়েছে।

২-নম্বর জাতীয় সড়ক পার হয়ে ফার্লং দুয়েক পশ্চিমে রাজহাট বাজারে যেয়ে আমরা রিক্সা থেকে নামলাম। বৃদ্ধ পাল মশায় বিদায় নিলেন। আমরা তিনজন কুন্তী নদীর পুল পার হয়ে পোলবা রোড ত্যাগ করে নদীর ধারে ধারে দক্ষিণমুখী গ্রাম্য পথ ধরলাম। আমি আগে আগে চলেছি, ওরা দু'জন পিছনে। কানে এল শিপ্রার মন্তব্য : ঝোঁপ, লতা গাছে ঢেকে যেন পাতার গেট হয়ে আছে, ঝোপের ভেতর থেকে বাঘ বেরুবে না তো!" দুপুরেও রাস্তা আধো-অন্ধকার, বাঁশ ও গাছপালায় ঢাকা, কোথাও-কোথাও বাঁশগাছ মাথার উপর ঝুঁকে পড়েছে। আশে পাশে লোকজনের বসতিও খুব কম। গ্রাম্য বনপথের শোভা শিপ্রার মন ভুলালেও অনভ্যস্ত ও অপরিচিত বলে ভয়েরও সঞ্চার করেছে বোঝা গেল। প্রায় সওয়া এক মাইল গ্রাম্য পথে এগিয়ে পৌছলাম গান্ধীগ্রামে। কুন্তি নদীর পাড়ে চারিদিকে গাছপালায় ঢাকা গ্রামের মাঝে কয়েকটি বাড়ী নিয়ে একটি ছোট মিনি সহর। এলাকামাত্র কয়েক বিঘা। যেন সাহারার মাঝে ওয়েসিশ।

প্রায় বছর বারো আগে কুন্তী নদীর ধারে এই দুর্গম জঙ্গলে ঢাকা এলাকার কয়েক একর জমি নেন রাজ্য সরকার। তখন এখানে যাতায়াতের কোন পথঘাটই ছিল না বলা চলে। সওয়া এক মাইল

উত্তরে পোলবা রোড এবং দু'মাইল দক্ষিণে সুগন্ধা গ্রাম। তখন সত্যি সত্যিই এখানে মাঝে মাঝে দু'একটা গো-বাঘা চোখে পড়ত। সেই দুর্গম জায়গায় এখন গড়ে উঠেছে গান্ধীগ্রাম আবাসিক বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

আমরা যে পথ দিয়ে এলাম, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের জন্য সেই পথটি তৈরী করে পোলবা রোডের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ীতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনীদের আবাস ও শ্রেণীকক্ষ। অধ্যাপকদের জন্য ছোট ছোট বাস-ভবন। বিদ্যার্থী ভাই-বোনেরা এখানে আসে মাত্র একটি বছরের জন্য। তাদের নিজহাতে গড়া বাগান, স্বশাসিত ও সমবায়-ভিত্তিতে পরিচালিত মেস, হোষ্টেলের ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এ যেন এক অন্য পৃথিবী। ছাত্রদের নিজেদের হাতে-গড়া ছোট ছোট কিচেন-গার্ডেন। খড়ের তৈরী গোল-ছাতার আকারের বসবার ঘর, মৌমাছির চাষ, সামনের দিকে সুন্দর ফুলবাগান দেখতে দেখতে অপরেশ বলে উঠল, আমাদেরই বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা নিজেরা এই বনের মধ্যে যা গড়ে তুলেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তবুও এটি তারা নিজেরা চিরকাল ভোগ করবে না, বছরটি শেষ হওয়া মাত্র অপরিচিত নবাগতদের হাতে দিয়ে চলে যেতে হবে।'

একজন অধ্যাপক আমাদের সাথে ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছিলেন। তিনি অপরেশের কথা শুনে মন্তব্য করলেন, 'আমাদের দেশের ছেলেদের কর্মক্ষমতা সত্যই পর্যাপ্ত কিন্তু পশ্চিমবাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিটি নেতার এই ছেলেদের কুপথে পরিচালিত করবার, মিথ্যা কথার জাল বুনে ও বক্তৃতা করে বিভ্রান্ত করবার ক্ষমতা অপর্যাপ্ত। তাই পশ্চিমবাঙলার আজ এই দুর্গতি।' হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন, মনে হোল যেন অসতর্ক মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে সত্য কিন্তু অপ্রিয় কথাগুলি বেরিয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক মশায় আমাদের শিক্ষণ কেন্দ্রের সংগ্রহশালাটি খুলে

দেখালেন। ছাত্রেরা অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের মন্দির-শিল্পীদের মত টেরাকোটার ইট (পোড়া মাটির নক্সা করা) তৈরী করে রেখেছে। ফ্রেমের-কাজ বিভাগে পরিচালক শৈলেন সান্যালের নির্দেশে পাটকাটির তৈরী 'জয় বাংলা থেকে আগত জনস্রোত' নামে একটি মডেল দেখে শিপ্রা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা বুঝি আর্ট স্কুলে তৈরী?' অধ্যাপক জানালেন, 'না, প্রতিটি মানুষের ভিতরই আর্টবোধ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, আমরা সাধারণ শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের সেই সুপ্ত বোধটাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। এটি তৈরী একটি সাধারণ গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষকের।' মুগ্ধ বিস্ময়ে মডেলটির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম।

বিদ্যার্থীরা এখানে থাকবার সময় বিকালে বা ছুটির দিনের অবসরে আশেপাশের অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বহু জিনিস সংগ্রহ করে এনে রেখেছে। ভূতাত্ত্বিক বিভাগে মহানাদ থেকে প্রাপ্ত গুপ্ত যুগের মাটির পাত্র, গোয়ালজোড় গ্রাম থেকে ছাত্রদের দ্বারা সংগৃহীত পাল-যুগের পাথরের বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ সত্যিই উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে ভাল লাগল যেখানে ছাত্রেরা প্রজাপতি সংগ্রহ ক'রে রেখেছে; পাশাপাশি রেখেছে প্রথম জঙ্গল কেটে বিদ্যালয় গড়ার সময় যত সাপ, গোসাপ, বিছে প্রভৃতি ভয়ংকর জীবদের মেরেছে। ঠিক তারই নীচে রয়েছে কতকগুলি মাটির তৈরী প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের জন্তুর মডেল যথা ডাইনোসোর, টেরাডাকটিল প্রভৃতি।

অধ্যাপক আমাদের জানিয়ে দিলেন যে অধ্যক্ষ, গান্ধীগ্রাম বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পোষ্ট রাজহাট, জেলা হুগলী, এই ঠিকানায় চিঠি দিয়ে এলে ওরা আগে থেকে সব কিছু ভালভাবে দেখানর বন্দোবস্ত করে রাখেন।

অধ্যাপিকা অর্চনা ভট্টাচার্য এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তার বাসায় চা খাবার জন্য। অধ্যাপিকার স্বামী শিল্পসাধক। তাদের ছোট্ট দু'খানি ঘর, তাঁর হাতের রসোত্তীর্ণ শিল্প কাজ সুশোভিত।

অবাক-বিস্ময়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন অজন্তার গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। স্বামী ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, স্ত্রী হলেন সঙ্গীতশিল্পী। চা-পান পর্ব শেষ করে তাঁর গান শুনতে বসলাম। সুরের মূর্ছনা যেন অস্তগামী সূর্যের পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগলো।

ভারাক্রান্ত মন ছুটে চলে গেল কয়েকমাস আগের একটা দিনে। সেদিন কল্পনার সামনে বসে এই ভাবেই সুরের মাঝে ডুবে গিয়েছিলাম। মন ছুটে চলল রাশমুক্ত অবস্থায়। কোথায় গেছে ওরা, এতদিন হয়ে গেল, একটা খবরও দিল না। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, নোতুন জায়গায় গিয়েই চিঠি দেবে।

শিপ্রা তাগাদা দিল, 'উঠুন, রাত হয়ে গেল। এই অন্ধকার পথে আবার ফিরতে হবে তো।'

বন্ধুবরের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরলাম। গ্রাম্য পথ গভীর আঁধারে ঢাকা কিন্তু মনের তন্ত্রীতে তখনও ধ্বনিত হচ্ছে অর্চনা দেবীর গানের একটি কলি : "নিরঞ্জন তুমি নয়ন রঞ্জন তুমি হে অন্তরযামী" :

## তের

**শ্রীপুর**

বন্ধুবর-প্রদ্যোৎ টর্চ হাতে আমাদের এগিয়ে দিল রাজ-হাটের কুন্তি নদীর পুল পর্যন্ত। ব্যাণ্ডেলগামী প্রচুর রিক্‌স। বাস বন্ধ, শেয়ারের অংশীদার পেতেও অসুবিধা হল না।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, নৈহাটী হয়ে শিয়ালদাগামী সালোর-প্যাসেঞ্জার প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি একটি কামরায় উঠলাম। বসতে যাচ্ছি, পাশ থেকে কে নাম ধরে ডাক্‌লো। তাকিয়ে দেখি, নলিনীদা।

নানা গল্প সুরু হোল। শিপ্রার অনুরোধ: সামনের রবিবার কোথাও চলুন, সবাই মিলে। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'কোথায় যেতে চাও?'

'কোথায় আর যাবে! স্বল্পবিত্ত মানুষ, বেড়ানর সখ আছে সামর্থ নেই। শ্রীনগর দেখা নাই হোক, শ্রীপুরটা দেখে আসতে পার' বললেন নলিনীদা। 'শ্রীপুর কোথায়?' প্রশ্ন করল অপরেশ।

নলিনীদা রসিক লোক। হেসে জবাব দিলেন, 'সব শ্রী-র একই অবস্থা। কার যেন লেখায় পড়েছিলাম, "ক্যালেণ্ডারে ছবি দেখে মনে হোত কাশ্মীর ভূস্বর্গ। কিন্তু কাশ্মীরে গিয়ে দেখি, শ্রীনগরের কোন শ্রী নেই, পথঘাট নোংরা, ঘিঞ্জি দোকান-পাট, বাড়ি, ঘর, বহুৎ বস্তি। ডাল লেকে নোংরা জল। শ্রীপুরেও গিয়ে হয়ত দেখব, শ্রীপুরের শ্রী-র সবটুকুই চলে গেছে, পড়ে আছে স্মৃতিটুকু। শ্রীনগরের পিছনে সরকারী ও বেসরকারী ভ্রমণ-ব্যবসায়ীদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা আছে, শ্রীপুরের তাও নেই। তবুও পুরোনো বহু স্মৃতি আছে।'

কথামত পরের রবিবারে যাত্রা সুরু।

'ভোর সাড়ে ছ'টায় হাওড়া থেকে দু'টাকা নব্বই পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে চেপে বসেছিলাম সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে। সঙ্গের সাথী কাঁধের ঝোলাটার মধ্যে ছিল গতরাতের বাড়তি খানপাঁচেক রুটি, এক ঢেলা ভেলীগুড়, লুঙ্গি ও গামছাখানি।'

'শ্রীপুর বলে কোন ষ্টেশন নেই। ষ্টেশনের নাম জিরাট, হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে। জিরায়ৎ ফরাসী শব্দ, অর্থ ফসলক্ষেত। ষ্টেশন সার্থকনামা। কাছাকাছি ঘরবাড়ী নেই বলা চলে। চার পাশে ধানক্ষেতে সবুজের ঢেউ খেলে চলেছে, তারই মাঝখান দিয়ে সর্পিল পাকারাস্তা। পূব দিকে প্রায় দু'মাইল যেয়ে গঙ্গার ধারে গাছপালা-ঢাকা সুন্দর গ্রাম শ্রীপুর। সুন্দর কিন্তু গ্রাম্য শান্ত স্তব্ধতা নেই। কাঠের উপর হাতুড়ির-ঘায়ের ঠক্ ঠকা ঠক্ আওয়াজে দিনরাত কান ঝালা-পালা হয়ে যায়।

গঙ্গার ধার দিয়ে প্রায় আধ মাইল এলাকার গাছের তলায়,

বাগানে একেবারে নদীর চড়ার উপরে চলেছে নৌকা-তৈরীর কাজ। সারি সারি ছুতোরের কারখানা। সবই মোটা হাতের কাজ, কোথাও ডিঙি তৈরী হচ্ছে, কোথাও পাছা-কাটা বোট্, কোথাও ভাওয়ালীয়া। নদীর চড়ার উপর বেশীর ভাগই পুরোনো নৌকা মেরামত ও গাওনার কাজ হচ্ছে।

ছুতোর পাড়া ছেড়ে বাজার। তারই ঠিক উত্তরে একটি বিরাট গড় খাঁই। মাঝে মাঝে শুকিয়ে উঠেছে। গড় পার হয়েই সামনে পড়ল একটা পুরানো দোলমঞ্চ। ডানদিকে একপাশ ভেঙে পড়া একদা বিশাল ফটকের পরই বিরাট প্রাসাদ ও অনেকগুলি দেবমন্দির। বহুদিন কোনটিরই সংস্কার হয়নি, লোকজনও চোখে পড়ে না। এ যেন সেই ঠাকুরমার ঝুলিতে পড়া—এক যে রাজার পাতালপুরী, মরণ-কাঠির পরশে কত যুগ ধরে যেন ঘুমিয়ে আছে।

শ্রীপুরের প্রাচীন নাম ছিল, আটিশেওড়া। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রধান কানোনগো ছিলেন রামেশ্বর মিত্র। নবাব তাঁকে রাজা ও মুস্তৌফী পদবী দেন। এই রামেশ্বর মিত্রই হচ্ছেন উলা-বীরনগরের মিত্র-মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

রামেশ্বরের বড় ছেলে রঘুনন্দন পিতার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বাঁশ-বেড়িয়ার রাজা রঘুদেবের কাছ থেকে আটিশেওড়া গ্রামে পঁচাত্তর বিঘা মকরাণ জমি দান গ্রহণ করেন। সেই জমির উপর উলার বসত-বাটির চেয়ে জাঁকজমক করে গড়বেষ্টিত বসতবাড়ি তৈরী করেন। খনন করেন প্রশস্ত দীঘি। গড়ে তোলেন বেশ কয়েকটি মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ। নূতন করে গ্রামের নামকরণ করেন, শ্রীপুর।

প্রাচীন কারুকলা ও কারিগরির নিদর্শন হিসাবে ঐ চণ্ডীমণ্ডপ একমাত্র আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের সাথে তুলনীয়, এ রকম উচ্চাঙ্গের কাঠের কাজ একালের বাংলার শিল্পীরা তো করেননি, অনেকেই দেখেন নি। উইপোকায় খানিকটা খেয়ে ফেললেও যেটুকু অবশেষ আছে তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। কাঠের স্তম্ভের গায়ে কড়ি কাঠে

ফ্রেমের উপর ( পাশিতে ) বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, পৌরাণিক চিত্র খোদাই করা। চালের নিচে স্থানে স্থানে নানা রং-এর বাঁশের কাঠির চিক সরু বেতের সুতো দিয়ে বাঁধা। শুনে অবাক হলাম, পথের ধারে যে সব সূত্রধরদের কারখানা দেখে এসেছি তাদেরই কোন পূর্বপুরুষের তৈরী এই চণ্ডীমণ্ডপ। দেশের উন্নতি হচ্ছে বলছি অথচ এ রকম উচ্চাঙ্গের শিল্পীর বংশধরেরা আজ নৌকার তলায় গাওনা করে কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন ক'রছে!'

পথ চলতে চলতে অপরেশ মন্তব্য করলেন, 'জমিদারী প্রথা শেষ হয়েছে। সরকার জমিদারী দখল করেছেন, সবই ভাল কথা কিন্তু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব শিল্পগোষ্ঠী ছিল তাদের বাঁচানর কথা কি সরকার ভেবেছেন?' কেন তাদের কথা ভাববেন? কয়টি বা ভোট, ওঁদের বাঁচানর চেয়ে কোন কলকারখানায় যাদের ইউনিয়ন আছে যাদের শ্রেমিক অর্গানাইজড, তাদের কিছু ধাপ্পা দেওয়া গরম-গরম বুলি বললে ভোট পাওয়া যাবে অনেক বেশী।' মন্তব্য করল শিপ্রা: ওদের কথা নাই ভাবুন, এই কীর্তি বা চণ্ডীমণ্ডপের কপালী কখানা যদি কলকাতা যাদুঘরে নিয়ে রক্ষাও করতেন, তাহলে একদা বাঙালী সূত্রধরদের গুণের কথা বিশ্ববাসী জানবার সুযোগ পেত। মন্ত্রী মশায়েরাও না হয় দেশের কাজ করার নামে একটু বাহাদুরী করার সুযোগ পেতেন।'

বেলা তখন প্রায় একটা, একটি ভাঙ্গা মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে আমরা শুকনো রুটি কখানা ও শিপ্রার নিয়ে আসা মোটামোটি তিনজনের মত ভরপেট শুকনো খাবার তিনজনে ভাগ করে খেয়ে নিয়ে ফটকের কাছের টিউবওয়েলে জল খেতে গেলাম। সেখানে এক বৃদ্ধা বিধবা কলসীতে জল ভরছিলেন। জল ভরা হয়ে গেলে তিনিই আমাদের হাতে জল ঢেলে দিলেন।

বৃদ্ধার মুখে শুনলাম, মুস্তৌফীদের প্রায় সবাই কলকাতায় বা চাকরী উপলক্ষে অন্যত্র থাকেন। বৃদ্ধাও ওদেরই এক সরিক। কিছু

ধানের জমি এখনও আছে, তাতেই পেট চলে যায়। মন্দিরে নিত্য ভোগের ব্যবস্থা এক রকম উঠেই গেছে। বৃদ্ধাই প্রতি-সন্ধ্যায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতি-মন্দিরের দরজায়-দরজায় বাতি দেখিয়ে আনেন।

শ্রীপুর দেখতে এসেছি শুনে বৃদ্ধা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি দেখতে এলে বাবা! শ্রীপুরের শ্রী অনেকদিন চলে গেছে। আমার দাদাশ্বশুর তখন বেঁচে। নয় বছর বয়সে এই বাড়ি এসেছিলাম চেলী প'রে হাতীর পিঠে চড়ে। দীঘির পাড়ে আমাদেরই ছ-ছটা হাতী বাঁধা থাকত। ঐ যে নৌকার কারখানা দেখে এলে দীঘির ওপারে, ওটাকে এখনও বলে হাতিকান্দা মৌজা। প্রতিদিন এই মন্দিরে দুপুরে সওয়া মন চালের ভোগ দেওয়া হোত। অতিথি অভ্যাগত প্রসাদ না পাওয়া পর্যন্ত বুড়ো কর্তা খেতে বসতেন না। আর আমি কপালখাকি, হতভাগিনী, তার নাতবৌ হয়ে ভর-দুপুরে তোমাদের আঁচলায় খালি জল ঢেলে দিচ্ছি।' বলতে বলতে বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে গেলাম পাশের কালীগড় গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখতে। বৃদ্ধার কথা শোনার পর থেকে শিপ্রা কেমন চুপচাপ হয়ে গেল।

অনেক ঘুরে সন্ধ্যা ছটার সময় হাজির হলাম পরবর্তী ষ্টেশন বলাগড়ে। সেখান থেকে সালার প্যাসেঞ্জারে চেপে ব্যাণ্ডেল নৈহাটি হয়ে যখন শিয়ালদা পৌছলাম তখন রাত্রি নটা।

বাড়ি পৌছে টেবিলের সামনে গিয়ে থমকে গেলাম। আমার নামে একখানা টেলিগ্রাম পড়ে রয়েছে। খুলে ফেললাম। টেলিগ্রাম ঐ দিনই বেলা দশটার সময় করা, কালনা থেকে লেখা:

"Mother Kalpana Death bed Come
Head mistress Mahishmardini girl's School"

প্রায় একটি বছর, যার একটুখানি সংবাদ বা হদিস পাবার জন্য

মন ছটফট করেছে, তার হদিস এল। কিন্তু একি সংবাদ? একবার দু'বার টেলিগ্রামখানা পড়লাম। কে মৃত্যু শয্যায়? কল্পনার মা নাকি কল্পনা নিজে? মা মৃত্যুশয্যায় হলে প্রধান শিক্ষিকা কেন টেলিগ্রাম ক'রবে, টেলিগ্রাম করত কল্পনা। চিন্তা করে কোন সমাধান হলো না। রাত্রিতে কালনা যাবার কোন গাড়ী নেই। সকাল ছটা ছত্রিশ মিনিটের সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে যাবার জন্য তৈরী হলাম।

## চোদ্দ

(১) বাগনাপাড়া

নমস্কার! মাসিমাকে দেখতে এসে শুনলাম আপনি এসেছেন। পর পর দু'দিন ধরে আসছি। রোজই শুনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। কল্পনাদিরও দেখা নেই। আপনাকে পেয়ে ওঁরও ডানা গজিয়েছে।

আমরাও প্রায়ই বেড়াতে বেরুই। কল্পনাদিকে সাথে যেতে ব'ললে, উনি দেখেছি এড়িয়ে যান। ওজর আপত্তির মূল কথা, 'মাকে একলা রেখে কি করে যাব।' আজ দু'দিন তো বেশ মাসিমাকে একলা রেখে বেরতে পারছেন।

'থাম্, খুব যে কথা শিখেছিস দেখ্‌ছি।' কল্পনা বক্তা তরুণীটকে ধমক লাগাল। 'তোরা কি বেড়াতে যাস, তোরা যাস স্ফূর্তি করতে। তোদের সাথে বেরিয়ে না যায় কিছু দেখা, না যায় কিছু শোনা, তোদের তো শুধু খাই খাই। তোদের-বেরনর আগে তিন দিন চলে বেড়াতে গিয়ে কি কি খাব তার ফর্দ করা। নোতুন জায়গায় গিয়ে দর্শনীয় সব পড়ে থাকল, কোন দোকানে কি পাওয়া যায়, খালি খাবারের খোঁজ। পথে গেলা, পৌঁছে আগে গো-গ্রাসে গেলার ব্যবস্থা। দেখার শোনার কি আছে সে খোঁজে কাজ নেই।'

'দেখ কল্পনাদি, তোমার মত মুখে চাবি দিয়ে, আত্মাকে বঞ্চিত ক'রে, কোথায় একটা পুরোনো মন্দির বা মসজিদ আছে, কোন ভাঙ্গা ইটখানার কি ইতিহাস আছে তাই খুঁজে বেড়ানো, আমাদের পোষাবে না। পয়সা খরচ ক'রে বেরই খেয়েদেয়ে একটু ফুর্তি করে হল্লা করে বেড়াব বলেই তো। দেখার দরকার হ'লে ঘরে বসে সিনেমা, টি. ভি. কিম্বা ভাল ছবির বই কিনেও অনেক কিছু দেখা যায়। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরীতে ইতিহাসের বই-এর অভাব নেই। বাইরে বেরিয়েও যদি ইতিহাসের ছাত্রগিরি করতে হয় তবে না হয় নাই বেরলাম।'

তরুণীর ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে 'বোস্ তোরা গল্প কর আমি দেখি উনুনে আগুন দিয়ে আসি' বলে কল্পনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কল্পনাদির মুখে শুনেছি, আপনি ভ্রমণপাগল লোক। সারা ভারত এমন কি ভারতের বাইরেও নাকি বহু স্থানে ঘুরেছেন। আমাদের কালনা কেমন দেখলেন?'

'কালনা এখনও ভালভাবে দেখা হয়নি। এসে প্রথম দু'দিন তো বেরতেই পারি নি। কাল থেকে মাসিমা অনেকটা ভাল আছেন ব'লে কাছাকাছি একটু ঘুরে আসছি। এসেছি যখন কালনা দেখেই ফিরব। আচ্ছা আপনি তো দেখছি আমার কথা অনেক শুনেছেন। কিন্তু আপনি কে? পরিচয় জানি না। আপনার কল্পনাদিও বেশ লোক, আমাদের পরিচয় না করিয়ে দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় যদি কোন অপরাধ না নেন, তবে আপনার নিজের মুখ থেকেই আপনার পরিচয়টা জেনে নিই।'

তরুণী সুশ্রী, সপ্রতিভও বটেন। প্রথমে একটুখানি যেন লজ্জাবনতা-মুখী হলেন। দু'টি গণ্ড হয়ে উঠল একটু লাল। তার পরই সোজা সুজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নয় তুমি, এমন কি তুইও বলতে পারেন, কল্পনাদি তুইই বলেন। আমার নাম

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি মীরা বলে ডাকবেন। আমিও কল্পনাদির সাথে এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ করি। কল্পনাদির চেয়ে আমি বয়সে বছর চারেক ছোট হলেও চাকরীতে ওর চেয়ে দু'বছরের সিনিয়ার। এখানে আমার চাকরী তিন বছর পুরো হোল। তার উপর আমি এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী '

'তোমরা তাহলে এখানকার আদিবাসিন্দা?'

'না, অনেকদিন এখানে থাকলেও আমাদের অবস্থা কল্পনাদির মত। তবে তফাৎ হচ্ছে কল্পনাদি তার মাকে নিয়ে আছেন ভাড়া বাড়িতে আর আমরাও মা-বেটিতে আছি আমার মামার বাড়িতে বাগনাপাড়ায়। আমার মামারা মুখুজ্জে, বাগনাপাড়ার বলরাম বিগ্রহের বর্তমান সেবাইত বংশ। মা-মামাদেরও আদি বাস এখানে ছিলনা। বাগনাপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র গোস্বামীর বংশ হচ্ছে আবার মামাদের মাতুল বংশ। মাতুল সম্পত্তি হিসাবে মামারা বলরামের সেবাইত হবার অধিকার পেয়েছেন।

আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার বাবা মারা যান। মা আমাকে নিয়ে এসে মামার বাড়িতে ওঠেন। ঐখান থেকেই আমি পড়াশুনা করেছি। মামারাই চাকরী যোগাড় করে দিয়েছেন। এখনও ওখানে আছি।' বললে মীরা।

'এখনও ওখানে আছ। তাহলে কি আর বেশীদিন মামার বাড়ি থাকতে হবে না। নিজের বাড়ি হবার যোগাযোগ তাহলে হয়ে গেছে,' জিজ্ঞাসা করলাম একটু হেসে।

'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মামা খুব বিজ্ঞ হিসেবী লোক। মামার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের পক্ষে তাদের পিসি বা পিসতুতো বোন তাদের বাড়িতে বাস করুক এটা না চাওয়া বা না পছন্দ করা অন্যায় নয় এসব কথা অনেক আগেই ভেবে মামা আমার বাবা মারা যাবার পরই তারই টাকা থেকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে মায়ের নামে এক টুকরো জমি কিনে রেখেছিলেন। বাবার

বাকী টাকার এক পয়সাও মামা খরচ করতে দেন নি, ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। এখন মামাই উঠে প'ড়ে লেগেছেন। আমাদের একটা পৃথক বাড়ি করে দেবেন যাতে ভবিষ্যতে মামাতো পিসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে কখনও মনান্তর না ঘটতে পারে।'

'কোথায় বাড়ি হচ্ছে?'

'এখনও আরম্ভ হয়নি, তবে শিগ্‌গিরই হবে ঐ মামার বাড়ির কাছেই বাগনাপাড়াতে।'

'বাগনাপাড়া এখান থেকে কতদূর?'

'কালনা থেকে নবদ্বীপধামের দিকে কালনার পরবর্তী ষ্টেশন বাগনাপাড়া। গ্রামটি ষ্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে। কালনা থেকে বর্ধমানগামী বাস বাগনাপাড়া হয়ে যায়। আমরা সাধারণতঃ বাসেই যাতায়াত করি। ষ্টেশন থেকে রিকৃস আছে কিন্তু ভাড়া একটু বেশী। তার উপর এ লাইনে ট্রেনের সংখ্যাত তো খুব বেশী নয়।

একটু থেমে মীরা বল্‌লে, 'আপনি তো নোতুন নোতুন জায়গা দেখতে খুব ভালবাসেন। চলুননা একদিন আমাদের বাড়ি বাগনাপাড়া দেখে আসবেন।'

'তোমাদের নিজের বাড়ি হোক তারপর একদিন যাওয়া যাবে, এখন যেয়ে আর কার বাড়ি দেখব?'

'গরীবদের বাড়ির আর কি দেখবেন। দেখবেন প্রাচীন গ্রাম বাগনাপাড়া। দর্শনীয় মন্দির আছে। তার উপর পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণব তীর্থগুলির মধ্যে বাগনাপাড়ার একটা বিশেষ স্থান আছে। মীরা বলে চ'লল, 'এই গ্রামের দক্ষিণ ও পূব দিক ঘিরে একসময় বয়ে চ'লত প্রবল স্রোতা ভল্লকা বা বেহুলা নদী। এই নদী বেয়েই নাকি সর্পাঘাতে মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ক'রে ভেসে চলেছিলেন পতিব্রতা বেহুলা। নদীর দু'টি পারই ছিল দুর্গম জঙ্গলে ঢাকা, শ্বাপদসংকুল। এই জঙ্গলে মাঝে মাঝে আদিবাসী শবরেরা শিকার ক'রতে আসত।

বাগনাপাড়ার বুড়োদের মুখে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী শুনেছি, 'মহাগুরু নিপাত জনিত অশৌচের সময় হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতে বসে কোন এক মহাসাধকের নাকি মাংস খাবার ইচ্ছা জাগে। সেই পাপে যখন সে পরজন্মেও মানুষ হয়ে জন্মাল তার পা দুটি হ'ল বাঘের পায়ের মত নখরযুক্ত। কিন্তু পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে হল মহামুনি। এই মুনির নাম ব্যাঘ্রপাদ। ব্যাঘ্রপাদ মুনি এই জঙ্গলের মধ্যে ভল্লুকা নদীর পাড়ে আশ্রম তৈরী করে তপস্যা করতেন। ভক্ত সমাগম আরম্ভ হয়। কালে কালে জঙ্গলের মধ্যে গড়ে ওঠে জনপদ নাম হয় বাঘনাপাড়া।

মীরা অন্য একটা প্রচলিত ধর্মমঙ্গলের কাহিনী শোনাল। 'এক সময়ে সমস্ত এলাকা ছিল জঙ্গলে ঢাকা। নদীর ধারে ধারে ছিল জেলে, মালো ও বাগদীদের বাস। বৌদ্ধতন্ত্র সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছিল। এরা, বৌদ্ধতন্ত্রমতে ধর্মঠাকুরকেই মানতো। মার্কণ্ডমুনি নাকি ছিলেন গোঁড়া বৈদিক ঋষি, ধর্মঠাকুরের নিন্দা করায় তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ হন। পরে তিনি এই ভল্লুকার তীরে বাগনা-পাড়ার জঙ্গলে এসে ধর্মঠাকুরের পূজা করে রোগ-মুক্ত হন। শূন্যপুরাণেও ধর্মঠাকুরের উল্লেখ আছে—

"বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম ভল্লুকাতে স্থিতি।"

মীরা শিক্ষিতা মেয়ে। সে নিজেই ব'লল, এ সব গাঁজাখুরি কাহিনী ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকৃত তথ্য বোধ হয়, চৈতন্য পূর্বযুগ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে এই অঞ্চল ছিল অর্দ্ধ বনাঞ্চল। ধর্মঠাকুর সেবিত নিম্নজাতির কিছু লোকের বাসও ছিল।

চৌদ্দশ একত্রিশ শকের ( ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ ) মাঘ মাসে শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। সমস্ত পার্শ্বচরেরাও মহাপ্রভুর সাথে গেলেন নীলাচলে। তারা সদাব্যস্ত মহাপ্রভুর সেবায় *চব্বিশটি বছর কেউ খোঁজ নিলেন না, নিমাই সন্ন্যাস নেবার পর

*চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। ভক্তগণ লৈয়া নীলাচলে বাস—চৈতন্য চরিতামৃত—১৷১৩৷৩২

পুত্রহারা শচীমা কিম্বা পতিহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হোল। কদাচ কখনও কোন ভক্ত নীলাচল থেকে ফিরে হয়ত শচীমাকে মহাপ্রভুর খবরটি দিয়ে যেতেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা একমাত্র ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে কিছুটা পাওয়া যায়ঃ

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎমাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

একমাত্র বংশীবদন গোস্বামী শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে নবদ্বীপে দেখাশুনা ক'রতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ দেখে কাতর বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের মূর্তি তৈরী করান।

মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর নিত্যানন্দ প্রভু গার্হস্থ ধর্ম গ্রহণ করে খড়দহে শ্রীপাট গড়লেন। অদ্বৈতাচার্যের ছেলে অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে বসবাস আরম্ভ করলেন। অন্যান্য শিষ্য ভক্তরাও যে যার মত শ্রীপাট গড়ে নিজেদের সাধন ভজনে মন দিলেন। একমাত্র বংশীবদন আঁইমা (শচীমাতা) ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবিতকাল পর্যন্ত নবদ্বীপে ছিলেন। তারপরই নিত্যানন্দের নির্দেশে ধর্মপূজার আদি বাসস্থান ভল্লুকার তীরের জেলে ও বাগদীদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের কাজে নামলেন বংশীবদন। নদীতীরের অধিকাংশ জঙ্গলে ঢাকা বাঘ ভাল্লুকের বাস। সেখানেই বংশীবদন খড়ের চালায় গড়লেন মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির। আরম্ভ হ'ল নিত্য সকাল সন্ধ্যায় খোল করতাল সহযোগে নাম কীর্তন। খোল করতালের প্রচণ্ড শব্দে জঙ্গলের বাঘের দল নিরাপদ আশ্রয়ের

আশায় অন্যত্র সরে পড়ল। গোস্বামীদের বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে লোক-বসতিও বাড়তে লাগল। ভল্লুকার তীর হল জঙ্গলমুক্ত। বংশীবদনের মৃত্যুর পর তার ছেলে চৈতন্যদাস শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজার ভার নিলেন। চৈতন্যদাসের বড় ছেলে রামচন্দ্র গোঁসাই ছিলেন পরম ভক্ত। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা নেন। রামচন্দ্র বহু তীর্থ পরিক্রমা করেন। তিনি বৃন্দাবন থেকে বলরাম বিগ্রহ এনে বাগনাপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বলরাম বিগ্রহই বর্তমানে শ্রীপাট বাগনাপাড়ার মূল দেবতা।

রামচন্দ্র গোস্বামী ধর্মঠাকুরের ভক্ত ব্যগ্র ক্ষত্রিয়দের সদলবলে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। জঙ্গলের বাঘের প্রতিপত্তি করার জন্যেই হোক অথবা বাগদীদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে তাদের মুক্তির উপায় করে দিয়েছেন বলেই হোক গ্রামের নাম হয় বাগনাপাড়া।

মীরাকে প্রশ্ন করলাম, 'বনের বাঘ থেকে, নাকি জাতি বাগদি থেকে গ্রামের নাম হয়েছে—কোন্‌টা তোমার বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?' মীরা বলল, 'যদিও গ্রামে বামুনরাই বর্ধিষ্ণু, জমিজমা সবই প্রায় তাদের দখলে তবুও গ্রামে বাগদিদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তারা দাবী করে বাগদিদের গ্রাম থেকেই নাম বাগনাপাড়া। আমার কিন্তু মনে হয় নামের সাথে বনের বাঘের স্মৃতিটুকুই জড়ান। কারণ যদি বাগনাপাড়ায় যান দেখতে পাবেন, গোস্বামী বাড়ির উঠোনের পাশেই গোপেশ্বর শিবের মন্দির ও একটু দূরে ধর্ম ঠাকুরের থান রয়েছে। এখনও বৈশাখ মাসের বুদ্ধপূর্ণিমার দিন গ্রামে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়। তখন গোঁসাই বাড়ি থেকেই বাঘ-বাঘিণীর নামে ভোগ দেওয়া হয়।

মীরা বলে চ'লল, 'বাগনাপাড়া বৈষ্ণব শ্রীপাট হলেও অন্যান্য পূজার কমতি নেই। চৈত্র মাসে গোপেশ্বরের গাজন উপলক্ষে সারা গ্রামের লোক মেতে ওঠে। যদিও গ্রামের শ্রেষ্ঠ উৎসব মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রামচন্দ্র গোস্বামী তিরোভাব তিথি

মহোৎসব। মামার মুখে শুনেছি তাদের ছেলেবেলায় ঐ উৎসবে নাকি সারা বাংলার হাজার হাজার বৈষ্ণব, মোহান্ত, বাবাজী ও বৈরাগীরা এসে হাজির হতেন। কয়েকদিন ধরে কীর্তন ও মহোৎসব চ'লত। এখন জাঁকজমক অনেক কমে গেছে, তবুও বেশ কয়েক-শ বৈষ্ণব গোঁসাই-এর সমাগম হ'য়। একদিনের জন্য ছোট খাট একটা মেলাও বসে।

সেবাইতদের মধ্যে অতি আধুনিক যারা তারা সহরমুখী হয়েছেন। গ্রামে এসে চাষের সময় যা কিছু পারেন কুড়িয়ে নিয়ে সহরে যান। কিন্তু যারা একটু প্রাচীনপন্থি তারা এখনও তাদের যথাসাধ্য ঐ দিনটিতে বৈষ্ণব ভক্তদের ভোজ ফলারের ব্যবস্থা করেন। মন্দির সংলগ্ন দুটি বৈষ্ণববাস্তুও আছে। সেখানে ভক্তেরা ইচ্ছা করলে রাত্রে থাকতে পারেন।

মহাপ্রভুর জন্মতিথি দোল পূর্ণিমার দিনও বেশ জাঁকজমক হয়, কিছু কিছু বাইরের ভক্তও আসেন।

### (২) শ্রীখণ্ড

'খুব যে গল্পে জমে গেছ দু'জন' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল কল্পনা। হাতে তার চা ও জলখাবারের থালা।

'ওঁকে ব'লছিলাম বাগনাপাড়া দেখে আসতে। কল্পনাদি, তুমিও তো কখনও যাওনি, চলোনা দু'জনে একসঙ্গে একদিন আমাদের ওখানে বেড়িয়ে আসবে' বললে মীরা।

'সে একদিন দেখা যাবে। এখন নে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' হাসি গল্পে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে মীরা চলে গেল।

বারান্দায় মুখোমুখি বসে আমি ও কল্পনা। মাসিমা আজ অন্নপথ্য ক'রেছেন। এ বেলায় কেবল একটু মাত্র দুধ খাবেন। আমাদের তরি তরকারি দুপুরেই রান্না করা আছে। কল্পনা চা জলখাবার তৈরী

করে সেই উনুনেই ভাত চাপিয়েছে। কেবলমাত্র হাঁড়িটা নামিয়ে উপুড় করে দেবে। প্রচুর অবসর। ওদের কলকাতা ছেড়ে আসার পরের কথাপ্রসঙ্গে কল্পনা বলছিল, 'এখানে স্কুলে চাকরী পেয়ে কলকাতা থেকে মাকে নিয়ে চলে আসবার পর অনভ্যস্ত মফস্বল জীবনে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। কলকাতা থেকে নিঃস্ব হয়ে বেরিয়েছিলাম। এখানে এসে নিজের সামান্য আয়ে চালাতে গিয়ে আমাদের এই গরীবপাড়ায় ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে। সহরে ইলেকট্রিক থাকলেও আমাদের হ্যারিকেন ভরসা। আপনি ভবঘুরে লোক, ঠিকানা জানা থাকলে হঠাৎ যদি এসে আমাদের এই অবস্থায় দেখেন সেই সংকোচের জন্য কথা দিয়ে আসা সত্বেও চিঠি দেই নি। মনটা মাঝে মাঝে কেমন করে উঠত। অনেকবার ভেবেছি চিঠি লিখব। সংকোচ ও মিথ্যা মর্যাদাবোধ এসে বাধা দিয়েছে।'

কল্পনা একটুখানি থামল। আবার চলল এক বছরের সুখ দুঃখের স্মৃতির রোমন্থন। আজ যেন কল্পনা মুখর হয়ে উঠেছে। কথাপ্রসঙ্গে বলল, 'জানেন আমরা কিন্তু এর মধ্যে একটা লম্বা ট্যুর দিয়ে ফেলেছি। আমাদের কাছেই এখানে শ্রীখণ্ডের এক ভদ্রলোক থাকেন। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, পরম বৈষ্ণব। তিনি শ্রীখণ্ডের মধুমতী সমিতির পক্ষ থেকে এখানকার জানাশুনা, সবার কাছ থেকেই কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেন ও সবাইকে শ্রীখণ্ডের উৎসব দেখতে যেতে অনুরোধ করে থাকেন। তারই অনুরোধে আমি, মা, মীরা ও মীরার মামা গিয়েছিলাম শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে। তখন কার্তিক মাসের প্রথম। গরমের দাপট নেই, শীতও পড়েনি। বেশ সুন্দর আবহাওয়া। আমরা অতি ভোরেই উঠে যাত্রা করেছিলাম।

কালনা থেকে ভোর পাঁচটার সময় ট্রেন। সাড়ে সাতটার মধ্যেই পৌঁছে গিছলাম কাটোয়া জংসনে। কাটোয়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ন্যারো গেজের ছোটগাড়ী যাতায়াত করে। ঐ ছোট রেলের কাটোয়া

জংসনের পরের ষ্টেশনই শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। কল্পনা বলে চলেছিল তার শ্রীখণ্ড ভ্রমণের দীর্ঘ কাহিনী।

কল্পনার মুখে শোনা সেই দীর্ঘ কাহিনীর সারমর্ম হ'ল,—

শ্রীখণ্ড কাটোয়া থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার পথ। দিনে রাতে মোট বারখানা ট্রেন কাটোয়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত যাতায়াত করে, এ ভিন্ন প্রতি পনের থেকে কুড়ি মিনিট পর পর বাস আছে, তবুও ট্রেনে ও বাসে যাত্রীর ভীড় খুব বেশী। কলকাতা থেকে শ্রীখণ্ড যেতে সহজতম উপায় হচ্ছে ট্রেনে হাওড়া থেকে বর্ধমান গিয়ে সেখান থেকে বাসে যাওয়া। বাসের রাস্তা রেলপথের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে।

শ্রীখণ্ড বাস স্টাণ্ডের পাশেই তৈরী হয়েছে নোতুন ব্লক উন্নয়ন অফিস, পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতি। শ্রীখণ্ড মস্ত বড় গ্রাম। সম্ভবত বর্ধমান জেলায় এতবড় গ্রাম আর নেই। বয়সের দিক থেকেও শ্রীখণ্ড প্রাচীনতম গ্রাম। শ্রীখণ্ডের ধারাবাহিক জীবনের ইতিহাস পাওয়া যায় প্রায় হাজার বছরের। পূর্বে গ্রামের নাম ছিল খণ্ডগ্রাম। দশম ও একাদশ শতকে বৈদ্যদের প্রাধান্য খুব বেড়ে যাওয়ায় নাম হয় বৈদ্যখণ্ড। নরহরি ঠাকুরের শ্রীপাট প্রতিষ্ঠার পর গৌড়িয় বৈষ্ণবেরা এই গ্রামকে গৌড়ের শ্রীক্ষেত্রতুল্য মনে ক'রে নাম দেন শ্রীখণ্ড। গ্রামে ঢোকার মুখে একটি হরিসভা, তারই অল্পদূরে গ্রামের উত্তর অংশে ভূতনাথ তলায় রয়েছে অনাদিলিঙ্গ (অতি প্রাচীন) শিব। কিন্তু মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়, মহারাজা রাজবল্লভের তৈরী। স্থানীয় লোক এই শিবলিঙ্গকে ভূতনাথ বল্লেও প্রাণতোষণী তন্ত্র মতে শ্রীখণ্ডের এই অনাদিলিঙ্গ শিবকে কেতুগ্রামের দেবী বহুলার ভৈরব ভীরুক বলে বর্ণনা ক'রেছেন। গ্রামে ঢোকার পথের পাশে শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী কালিকাদেবীর থান খণ্ডেশ্বরীতলা। কোন মন্দির বা বিগ্রহ নেই। বট-গাছের তলায় একটিমাত্র পাকা বেদী রয়েছে। প্রতি বৎসর মাটির মূর্তি তৈরী করে খণ্ডেশ্বরী কালির পূজো করা হয়। স্থানীয় সাধারণ লোকেরা খণ্ডেশ্বরীকে জাগ্রতা দেবী ও শ্রীখণ্ডের 'নগরদেবী ও সমস্ত

অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষাকর্ত্রী ব'লে মনে করে। সরকার বংশের প্রাচীন বাড়িকে শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবাড়ি বলে। এই ভিটাতেই ভক্ত প্রবর নরহরি সরকার জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে বাড়িটি তিন সরিকের মধ্যে ভাগ হয়েছে।

চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকেই শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের গৌড়ের মুসলমান রাজ-দরবারে অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। গৌড়েশ্বর সুলতানেরা ধর্ম বিষয়ে খুব উদার ছিলেন না। হিন্দু সাধারণ প্রজার উপর মুসলমান পীর ও ধর্ম প্রচারকদের অত্যাচার ও ধর্মান্তরকরণকে সুলতান সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন কিন্তু নিজের শাসন কাজের সুবিধার জন্য উচ্চবর্ণের দু' চারজন হিন্দুকে বড় বড় রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। ঝামটপুর ও নৈহাটীর ব্রাহ্মণেরা, কুলীনগ্রামের কায়স্থেরা ও শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা ছিলেন গৌড়ের মুসলমান সুলতানের ডান হাত। সরকারী বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। তাদের প্রতিপত্তিও সমাজে খুব কম ছিল না। নরহরি সরকারের পিতা নরনারায়ণ দেব ছিলেন সুপণ্ডিত। এই বংশের কুলদেবতা গোপীনাথ। নরনারায়ণের তিন ছেলে। বড় মুকুন্দ ছিলেন গৌড় দরবারের রাজবৈদ্য। দ্বিতীয় নরহরি, ছোট ভাই মাধব। নরহরি ছিলেন অকৃতদার। মুকুন্দের ছেলে রঘুনন্দন নরহরি সরকারের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে সাধন ভজনে মন দেন। রঘুনাথের বংশধরেরাই বর্তমানে এই তিন বাড়ির সেবাইত।

রঘুনাথের পরবর্তীকালে তার বংশধরেরা একবাড়ি ভেঙ্গে পরস্পর সংলগ্ন তিনটি বাড়ি তৈরী করেন। উত্তরের বাড়ির বর্তমান সেবাইত গোপীবিলাস ঠাকুরের বংশধরেরা। মাঝের বাড়িতে নদিয়া বিনোদ ঠাকুরের বংশধরেরা ও দক্ষিণের বাড়িতে নিত্যানন্দ ঠাকুরের বংশধরেরা সেবাকার্য চালাচ্ছেন। কুলদেবতা গোপীনাথ পালাক্রমে মাসে পনের দিন উত্তরের বাড়িতে পাঁচ দিন মধ্যের বাড়িতে এবং দশ দিন দক্ষিণের বাড়িতে থাকেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ কাল পাথরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি। হাতে পাথরের

আধখানা নাড়ু। এ বিষয়ে শ্রীখণ্ডে প্রচলিত কিম্বদন্তী, একদিন সেবাইত মুকুন্দের কার্যব্যাপদেশে বাড়ি ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে বাড়ির মেয়েরা বালক রঘুনাথকে বললেন এই থালার নাড়ু ও জল গোপীনাথের সামনে রেখে আয়, ঠাকুর খাবে। গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী মেয়েরা ঠাকুরের ভোগ দেয় না বলে পাঁচ বছরের বালকের হাতে দিয়ে গোপীনাথের ভোগ নিবেদন করান। রঘুনাথ নাড়ুর থালা বিগ্রহের সামনে রেখে চিৎকার করে ব'লল, 'মা ঠাকুর খাচ্ছে না।' মা বাইরে থেকে বললেন, তুমি ঠাকুরকে খেতে বলে চলে এস। সরল বালক রঘুনাথ বলল, এই ঠাকুর খাও বলছি। নিত্যসিদ্ধ ভক্তের ইচ্ছাপূরণের জন্য শিলারূপী ভগবান হাতে নাড়ু তুলে খেতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় পিতা মুকুন্দ এসে হাজির। বিগ্রহ স্তব্ধ হয়ে গেলেন গোপীনাথের হাতের আধ খাওয়া নাড়ু শিলাভূত হয়ে রয়ে গেল।

নরহরি সরকার মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার প্রকট অবস্থাতেই শ্রীচৈতন্যের তিনটি কাঠের নাটুয়া মূর্তি তৈরী করান। সবচেয়ে বড়টি প্রতিষ্ঠিত আছে কাটোয়ায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের স্মৃতিবিজড়িত জায়গায়। দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ববাংলার ভাগ্যকুলের অন্তর্গত গঙ্গানগরে; সেটি এখন আছে শ্রীখণ্ডের উত্তরের ঠাকুর বাড়িতে আর ছোট মূর্তিটি নরহরি সরকার রেখেছিলেন নিজের কাছে সেটি কুলদেবতা গোপীনাথের সঙ্গে পালাক্রমে সেবিত হচ্ছেন।

মাঝের বাড়িতে ঢুকবার দরজার পাশেই একটা বেদি গাথা আছে। গায়ে একখানা ফলকে লেখা, 'অদর্শন হৈল ঠাকুর নরহরি।'

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে আছে:

"কার্তিকে শ্রীদাস গদাধর সঙ্গোপনে
প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষণে ক্ষণে
কে বুঝিতে পারে তার অন্তরের ব্যথা
সে দিবস হৈতে কারো সনে নাই কথা
মার্গ শীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে
অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা সেই স্থানে।"

নরহরি ঠাকুরের অদর্শন নিয়ে দুটি প্রচলিত কাহিনী আছে। একটি কাহিনী, তিনি মাঝের বাড়ির বেদিতে বসে ধ্যান করতে করতে অদৃশ্য হন। অন্য কাহিনী, ঠাকুর নরহরি শ্রীখণ্ড গ্রামের বাইরে দক্ষিণ দিকে নির্জন মাঠের মধ্যে বড়-ডাঙায় এক গাছতলায় সাধন ভজন করতেন এবং একটা কুটির তৈরী করে সেখানেই বাস করতেন। কার্তিক মাসে দাস গদাধরের মৃত্যুর পর থেকে তিনি পাঙ্খি, অজগর ও মৌন ব্রত অবলম্বন করেন ও অগ্রহায়ণ মাসের একাদশীর দিন বড়-ডাঙায় বটবৃক্ষের গায়ে মিলিয়ে যান। রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাস আচার্যের চেষ্টায় অন্তর্ধানের এক বৎসর পর বড়ডাঙায় নরহরির অন্তর্ধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত সাড়ে চারশ বছর ধরে প্রতি বৎসর বড়ডাঙায় এই উৎসব উপলক্ষে পাঁচ দিন ধরে কীর্তন মহোৎসব ও ধর্মসভা হয়। নরহরি সরকার নাগরভাবে গৌরাঙ্গের ভজনা করতেন। সহজিয়া বাউলেরা নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য লোচন দাসকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেন। বড়-ডাঙায় উৎসবে সহজিয়া বাউলরা তাই প্রথমেই নরহরি সরকারের পদ গাইতে আরম্ভ করেন :

"রসের ভ্রমরা প্রাণ গোরা
কিবা জানে পিরিতি নব নব যুবতী
বদন কমল মধুচোরা
হিয়ায় ধরয়ে হিয়া গৌরাঙ্গ রসিয়া গো
সঘনে কাঁপয়ে মোর দেহা
নরহরি প্রাণবঁধু কতনা জানয়ে গো
অমিয়া পাথার তার লেহা"

দক্ষিণের বাড়ির পশ্চিমদিকে মধু পুষ্করিণী। গৌড় পরিক্রমা কালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দসহ এখানে আসেন ও এই পুষ্করিণীর জল পান করেন। পুকুরটির বাঁধান সিঁড়ির পাশে একখানি ফলকে লেখা আছে :

কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেইজল ভাজনে ভরিয়া
আনিয়া ধরিল আগে মধুস্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে
গণ-সহ খায় নিত্যানন্দ।

তিন ঠাকুর বাড়ি, ও উৎসবমুখর বড়ডাঙা দেখে ও সেখানের মহোৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করে ওরা একরাত্রি বাস করেছেন শ্রীখণ্ডে।

(৩) জাজীগ্রাম

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড থেকে ফেরার পথে ওরা আরও একটি বৈষ্ণব তীর্থ দেখে আসে—শ্রীপাট জাজীগ্রাম। এই জাজীগ্রাম শ্রীখণ্ড থেকে কাটোয়া যাবার বাস রাস্তার ধারে। শ্রীখণ্ড থেকে দূরত্ব মাত্র চার মাইল।

বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপের অল্পদূরে চাকুন্দি গ্রাম। জাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের মাতুলালয়। আচার্যদেবের শ্বশুরালয়ও এই গ্রামে ছিল। শ্রীনিবাস ছিলেন শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্য এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরুভাই। নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তার বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনিবাস ও আর কয়েকজন শিষ্যের দায়িত্বে তাঁর সারা জীবনের লিখিত বৈষ্ণব পুথিগুলি গৌড়ে পাঠান। পথিমধ্যে ঐ সকল গ্রন্থ লুণ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রীনিবাসই ঐ সকল গ্রন্থ উদ্ধার করেন এবং বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন।* রাজা বীর হাম্বিরের আগ্রহ আতিশয্যে শ্রীনিবাস

* বিস্তারিত কাহিনীর জন্য এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিষ্ণুপুর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আচার্যকে প্রায়ই বিষ্ণুপুরে যেয়ে থাকতে হোত এজন্য তিনি বিষ্ণুপুরেও বিগ্রহ স্থাপন করে সেখানে দ্বিতীয় শ্রীপাট নির্মাণ করেন।

শ্রীপাট জাজীগ্রামের মন্দিরটি একটি সাধারণ একতালা দালান। মন্দিরের কোন চূড়া নেই। পাশেই আচার্যদেবের এক দরিদ্র বংশধর একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস ক'রছেন। যে সমস্ত বংশধরদের অবস্থা সচ্ছল তারা নবগ্রাম, মালিহাটি, হীরাপুর প্রভৃতি জায়গায় থাকেন। শ্রীপাট রক্ষণাবেক্ষণের তাদের কোন আগ্রহই নেই। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সামনের পাকা নাট-মন্দিরেরও অবস্থা দিন দিন জীর্ণ হয়ে প'ড়ছে। পাশে একটি ছোট্ট ডোবা। লোকমুখে ডাল-ঢালা পুকুর নামে পরিচিত।

কিম্বদন্তী, কার্তিক মাসের শুক্লা গোষ্ঠাষ্টমীর দিন শ্রীনিবাস আচার্যের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। পর বৎসর নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু আচার্যের তিরোভাব তিথি উদ্‌যাপনের জন্য বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে এত বৈষ্ণব ভক্ত সমাগম হয়েছিল যে পাত্রে না কুলানর জন্য ঐ ডোবাতে ডাল ঢেলে রেখে ভক্তদের পরিবেশন করা হয়েছিল। তদবধি ঐ ডোবা ডালঢালা পুকুর নামে খ্যাত। নাট মন্দিরের দক্ষিণ পাশে প্রাচীন একটা তমাল গাছের তলায় আচার্যদেবের ভজনস্থলী। ভজন কুটিরের মধ্যে একটি পাথরের উপর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণ-চিহ্ন আঁকা আছে। পাশে একটি বেদি মিলনস্থলী নামে পরিচিত। আগে ওখানে একটি বটগাছ ছিল। তারই তলায় রামচন্দ্র কবিরাজ এসে শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে দেখা করেন।

অতি দীন অবস্থায় মন্দিরে নিত্যসেবা চলছে। যা কিছু ভেঙ্গে পড়ছে তার সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। বছরে একমাত্র আচার্য দেবের তিরোভাব উৎসবের দিন ব্যতীত কোন ভক্ত সমাগম হয় না। অবস্থা দেখে মনে হয় একদিন মানুষের স্মৃতি থেকে শ্রীপাট জাজীগ্রাম মুছে যাবে।

কল্পনার কথা শুনে ব'ললাম, 'ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীকোট বা পাইকোড় দেখতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম এক জাজীগ্রাম। সে ছিল শক্তি উপাসনার কেন্দ্র। জাজীগ্রাম নামে যে বৈষ্ণব তীর্থ আছে সে আজ তোমার কাছে জানলাম।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কল্পনা প্রশ্ন করল, 'সে পাইকোড় কোথায় সেখানে কি কি দেখার আছে বলুন না।'

'সে জাজীগ্রামে দর্শনীয় বড় একটা কিছু নেই বরং পাইকোড়ে এখনও বেশ কিছু দেখার আছে তবে রাত বেশ হয়েছে। তার উপর মাসীমা আজই অন্নপথ্য ক'রেছেন। আজ আর রাত বাড়ান উচিত হবে না। বরং পরে আর একদিন পাইকোড়ের কথা শোনান যাবে।'

সে দিনের মত রাতের আহারাদির জন্য উঠে পড়লাম।

(৪) পাইকোড়

ঘরের বাতিটি জেলে একখানি বই নিয়ে বসেছি। মাত্র দু'তিন পাতা এগোতে না এগোতে কল্পনা এসে বসল। ইস্কুল থেকে ফিরেই সে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। বোঝা গেল তাড়াহুড়া করে রন্ধন পর্ব শেষ করেই এসেছে।

'মাকে রাতের মত খাওয়ান শেষ হয়েছে। আমাদের খেতে বসতে এখনও ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। হাতের বই রাখুন, এই অবসরে আপনার পাইকোড়ের কথা শুনব।'

'পাইকোড় আমার নয়। পাইকোড় বীরভূম জেলার মুরারই থানার।'

'ঐ হোল, নিন বলুন।'

বলতে হোল পাইকোড় বা প্রাচীকোটের প্রাচীন কাহিনী। বর্তমানে যে অঞ্চলটা মুরারই থানা, দশম ও একাদশ শতকে সেটি ছিল এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। দেবপাল সকল উত্তরপথ নাথ নামে

পরিচিত ছিলেন। তার সাম্রাজ্য ছিল হিমালয়ের সানুদেশ থেকে আরম্ভ করে বিন্ধ্যপর্বত এবং উত্তর পশ্চিমে কম্বোজ দেশ থেকে প্রাগ-জ্যোতিষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। আটশ পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল। দেবপালের পরবর্তী সম্রাট শূরপাল পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এই সুযোগে কলচুরীরাজ, গুহিলোটরাজ ও ভোজদেব-প্রতিহার, পাল সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে করতে রাজধানী মগধ পর্যন্ত হস্তগত করে নিলেন। বঙ্গরাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠীত হোল।

মহীপাল রাজা হয়ে সাময়িক ভাবে পালবংশের গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। পিতৃরাজ্যের সামান্য অংশ পুনরুদ্ধারও করেন। একাদশ শতকে পালবংশের সন্তানেরা সর্বহারা হয়ে জনতায় মিশে গেল। একমাত্র শিবরাত্রির সলতের মত নয় পাল ( কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে জয় পাল ) এসে বাঁসলে নদীর দক্ষিণে প্রাচীকোটে এসে পূর্বপুরুষদের একটি দুর্গ সংস্কার করে সেখানে আশ্রয় নিয়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা হলেন। সেই প্রাচীকোটই বর্তমানে লোক মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে পাইকোড়ে দাঁড়িয়েছে।

১০৫০ খৃষ্টাব্দে চেদীরাজ কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করে দখল করেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া শৈব। মগধের তিনটি বৌদ্ধ বিহার তিনি ধ্বংস করেন। তার পরই তিনি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন বীরভূমের দিকে। পাকুড়ের মাঠে চলল দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম। নয় পাল ছিলেন বৌদ্ধদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সেই সময়ে নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাজ্ঞানী ( অতীশ ) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি এগিয়ে গেলেন এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম মেটাতে। দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় হল সন্ধিচুক্তি। নয় পাল প্রতি বৎসর পাঠাবেন দেচীরাজকে সৌজন্যমূলক কর। চেদীরাজ গৌড় ত্যাগ করলেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণসহ গৌড় তার অধিকারে এল।

চার বৎসর শান্তিতে কাটল। নয় পাল পরলোক গমন করলেন।

গৌড়ের সিংহাসনে বসল তৃতীয় বিগ্রহ পাল। কন্দর্পকান্তি বাইশ বছরের তেজস্বী যুবক। প্রথমেই তিনি চেদীরাজকে বার্ষিক করদান বন্ধ করলেন। কর্ণদেবও এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করবার মত লোক ছিলেন না। কর্ণদেবের হাতে গৌড়-রাজ্য দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হ'ল। বিগ্রহপালও এগিয়ে এসে রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীকোট দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করলেন। চেদীরাজের বিপুল বাহিনী তিন দিক দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রাচীকোটকে ঘিরে ফেলল। স্বয়ং রাজা কর্ণদেব পাগলা নদী অতিক্রম করে মিত্রপুরের কাছে এসে শিবির স্থাপন করে বসলেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সাথে প্রাচীকোটের যোগাযোগ এক রকম ছিন্ন হল। প্রাচীকোট প্রায় অবরুদ্ধ।

কর্ণদেবের এই অভিযানের সময় তার সঙ্গে ছিলেন তার পরিবার-বর্গ। শত্রুপক্ষ অবরুদ্ধ। একসময়ে তারা আত্মসমর্পণ করবে। কর্ণদেব নিশ্চিন্ত মনে সময়ক্ষেপণ করছেন। প্রতিদিন বিকালে কর্ণদেবের যুবতী কন্যা যৌবনশ্রী শিবিরের বাইরে নদীর ধারে বেড়াতে বেরোন।

দুঃসাহসী বীর বিগ্রহপাল দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে হাত দেখা ও ভাগ্যগননার নাম ক'রে শত্রুসৈন্যদের কাছে যেয়ে বিপক্ষের সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধের অবস্থানের খোঁজ খবর নেন।

সূর্যদেব যখন পাগলা নদীর দুই তীর তার শেষ রক্তরাগে রাঙিয়ে দিয়ে বিদায়মান, দেখা হোল ছদ্মবেশী গনকের সাথে ভ্রমণরতা যৌবনশ্রীর।

'আমার ভাগ্য দেখে দেবে?'

'আজ আলোর বড় অভাব, আবার দেখা হবে তখন দেখব'। এর পর কবে, কোথায়, কদিন তাদের দেখা হয়েছিল, গণক তার হস্তরেখায় কি পেয়েছিলেন, সে কথা কোন ইতিহাস লেখে না।

ঘটনা, অনঙ্গদেব দুই শত্রুপক্ষকে তার শরাঘাতে আহত করলেন। পরবর্তী অধ্যায় কর্ণদেবের শিবির থেকে এল সন্ধির প্রস্তাব। তারই

পূর্ণ পরিণতি প্রাচীকোটের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কর্ণদেবের শিবির এক সন্ধ্যায় মুখরিত হয়ে উঠল উলুধ্বনিতে। বিগ্রহপাল ও যৌবনশ্রীর মিলনের মাঝে হ'ল স্থায়ী সন্ধিপ্রস্তাব সাক্ষরিত। সেই শিবিরের অবস্থান, যেখানে দু'টি তরুণ প্রাণের প্রথম মিলন হয়েছিল, আজও মিত্রপুর নামে সেই প্রাচীন আত্মীয়তার স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে।

ঐ অঞ্চলের মধ্যে আজও প্রাচীকোট বা পাইকোড় সবচেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। জাজীগ্রাম শক্তি সাধনার কেন্দ্র ছিল এক সময়ে। এখন সেখানে একটি মাত্র পুরানো মন্দির ছাড়া আর কিছুই নেই। মিত্রপুরে আছে জোড়া বাংলা মন্দির। মিত্রপুরে, গ্রামের উত্তরে যেখানে কর্ণদেব তার শিবির স্থাপন করেছিলেন ত'রই পাশে রয়েছে কাকচক্ষু মহীপালের দীঘি! পাইকোড়ে গেলে কিন্তু যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বা ইতিহাসের ছাত্র তার মনে প্রচুর খোরাক আজও পাবে।

গ্রামের পশ্চিম দিকে রয়েছে জয়দুর্গার মন্দির। বিগ্রহ অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। কাছেই একটি বেদীর উপর খোলা আকাশের তলায় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী ক্ষ্যাপা কালির পাষাণময়ী মূর্তি। পাইকোড় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পাশেই সুন্দর পুষ্করিণী। পুকুরের পাড়ে নারায়ণ চত্বর নামে প্রশস্ত বাধান বেদী। বেদীর উপর বহু ভাঙ্গা ও আংশিক ভাঙ্গা পাথরের মূর্তি ও দুটি শিলালিপি উৎকীর্ণ পাথরের থাম। শিলালিপির একটিতে কর্ণদেবের আর একটিতে বিজয়সেনের নাম খোদিত আছে। বেদীর উপর রয়েছে একটা সুন্দর নরসিংহ মূর্তি। গ্রামের অন্তধারে বুড়ো শিবের মন্দিরের মধ্যে শিব ছাড়াও রয়েছে সূর্যদেব, হরিহর প্রভৃতি প্রাচীন যুগের পাথরের বিগ্রহ। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি ঢিবিকে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলে।

কল্পনা প্রশ্ন কর'ল, 'প্রাচীকোট দেখতে গেলে কিভাবে যাব, থাকব কোথায়?'

'পূর্ব রেলের হাওড়া-সাঁইথিয়া-বারহাওয়া লুপ লাইনে মুরারই

ষ্টেশনে নেমে মাত্র পাঁচ ছ'মাইল রাস্তা। রিক্সা ও বাস পাওয়া যায়। যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। থাকবার হোটেলাদির কোন ব্যবস্থা নেই। বাইরের লোকের পক্ষে নলহাটিতে ললাটেশ্বরী দর্শন করে ট্রেনে মুরারই হয়ে কিম্বা নলহাটি ডাকবাংলোর মোড় থেকে সরাসরি বাসে যেয়ে পাইকোড় দেখে ফিরে আসাই সুবিধাজনক। নলহাটিতে থাকবার বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা আছে।'

'এখন উঠুন খেয়ে দেয়ে ঘুমোনো দরকার। আগামীকাল সকালেই কালনার মন্দিরগুলো দেখতে বেরতে হব' বলে কল্পনা খাবার দেবার জন্য উঠে পড়ল।

(৫) অম্বিকা—কালনা

ঘুম ভাঙল রান্নার ছ্যাক্ ছ্যাক্ আওয়াজে। কল্পনা ভাল করে আলো ফুটবার আগেই রন্ধনপর্ব আরম্ভ করেছে। প্রশ্ন করে জানলাম, কালনার মন্দিরগুলি ভোর ছটার আগেই সব খোলে, বেলা একটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়, আবার খোলে সন্ধ্যার কিছু আগে সন্ধ্যাদীপ দেওয়া ও আরতির জন্য। রান্নাপর্ব শেষ করে চাপা দিয়ে রেখে জলযোগ-পর্ব শেষ করে সাতটার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। মতলব, ঘুরে দেখে বেলা দেড়টা দুটো নাগাদ ফিরে আহারাদি সারব; রবিবার কল্পনা সাথে থাকবে।

প্রথমেই গেলাম গৌর গৌরীদাস মিলনস্থল তেতুলতলায়—দেখি সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক গঙ্গাস্নান সেরে এসে তেতুলতলায় প্রণাম করছেন। পরিচয়ে জানলাম তিনি গোস্বামী বংশের সন্তান। পাঁচশ বছরের প্রাচীন সেই তেতুল গাছ, তার তলায় দেখলাম গৌরীদাস পণ্ডিতের পাথরের তৈরী ভজন সিংহাসন রয়েছে। গোস্বামী মশায় আবেগ-জড়িত কণ্ঠে যখন এখানকার প্রাচীন কাহিনী বলছিলেন তখন মনে হোল যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পাঁচশ বছরের আগের এক দৃশ্য। 'মুণ্ডিতমস্তক গৌরকান্তি গৌরাঙ্গের সমস্ত শরীর বেয়ে স্বেদধারা বয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিন দিনের

উপবাসে ক্লিষ্ট, সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রীচৈতন্যকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন গৌরীদাস কীর্তনীয়া। চিৎকার করে উঠলেন, রাধারমণ—রাধারমণ। রাধা নাম শুনেই প্রভুর জন্মান্তরের বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে গেল।

"আচম্বিতে অচৈতন্য প্রেমাবেসে শ্রীচৈতন্য,
পড়িগেলা আমলীর মূলে।"

গোস্বামী মশায়ের সাথে আমরা গেলাম মহাপ্রভু মন্দিরে। এটি গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। গোস্বামী মশায়ের মুখে শুনলাম, গৌরীদাস মহাপ্রভুকে প্রথমে নীলাচলে যেতে দিতে চাননি। পরে নিমাইয়েরই আদেশে নবদ্বীপে যে নিম গাছেব তলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই নিম গাছের কাঠে তার দারু মূর্তি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন! এই দারুমূর্তিও নাকি যতদিন গৌরীদাস বেচে ছিলেন তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন।

মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর ভক্তগণ আকুল আগ্রহে গৌরীদাস মন্দিরে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য আসতেন। পাছে কোন ভক্ত হৃদয়ে এই বিগ্রহের প্রাণশক্তিকে ধরে নিয়ে যায় এই ভয়ে গৌরীদাস দর্শন দেওয়া বন্ধ করলেন। ভক্তরা শচীমার কাছে আবেদন জানালেন। শচীমার আদেশে কোন ভক্ত দর্শন করতে চাইলে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য গৌরীদাস মন্দিরের দরজা খুলে দিতেন।' এখনও দেখলাম মন্দিরে সেই ঝলক দর্শন প্রথা চালু আছে।

গৌরীদাস মন্দির দেখে তারই মাত্র একশ গজ দূরে আমরা গেলাম সূর্যদাস সারকেলের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরে। মন্দিরে শ্যামসুন্দর ও নিতাই গৌর বিগ্রহ। ত্রিপুরার রাণী শ্রীমতী মনোমঞ্জরী দেবী ১৮৩১ শকাব্দে এই মন্দির সংস্কার করেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন এই মন্দিরে উৎসব হয়।

নীলাচলে মহাপ্রভু অপকট হবার আগেই নিত্যানন্দকে আদেশ দিলেন, 'তুমি গৌড় দেশে ফিরে যাও। কেবল মাত্র সন্ন্যাসের পথে

নয় সংসারের পথে, গৃহীধর্ম পালন করেও যে প্রেম ধর্মের আচরণ করা যায়। সংসারীর পক্ষে সংসারে থেকেও যে নাম কীর্তনের মাধ্যমে সহজতর মুক্তির পথ আছে সেই শিক্ষা গৌড়বাসীকে দাও। যাও আমি আদেশ দিচ্ছি নিজে সংসার ধর্ম আচরণ করে লোক শিক্ষা দেবে।'

মহাপ্রভুর আদেশে 'জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম / তথায় ভ্রমেন নিত্যানন্দ গুণধাম।' হরিনামের বন্যায় সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠল। প্রেমের মূর্তপ্রতীক নিত্যানন্দ প্রভু অবশেষে এই কালনায় এসে খুঁজে পেয়েছিলেন তার হ্লাদিনী শক্তিকে। তিনি সূর্যদাস সারকেলের কন্যা জাহ্নবীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

সূর্যদাস পণ্ডিতের মন্দিরের আঙ্গিনার বিপরীত দিকেই নিত্যানন্দের বিবাহের স্থান কুলতলা। বিপুলাকার পাঁচশ বছরের প্রাচীন কুলগাছটি—সেই পরম লগ্নের স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা নাটমন্দিরের ছবিগুলি ও ফলকের লেখা ঘুরে ঘুরে দেখে যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, দেখি কল্পনা তখনও একদৃষ্টে কুলগাছটির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের কোণে জল।

সূর্যদাস পণ্ডিতের পাট থেকে মাত্র পাঁচ-ছ মিনিটের পথ হেঁটে এসে আমরা চকবাজারের কাছে কালনার মন্দিরপাড়ার পিছন দিকে পৌঁছলাম। রাস্তার একদিকে বিশাল গোল চত্বর ঘিরে একশ আট শিব মন্দির। দুটি এককেন্দ্রিক বৃত্তাকারে মন্দিরগুলি সাজান। শিবলিঙ্গগুলি পর পর সাদা ও কাল পাথরে তৈরী। রাস্তার বিপরীত দিকে প্রথমেই বাঁ দিকে পড়ল প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির।

কালনায় ছোট বড় মিলিয়ে ঠিক কতগুলি মন্দির আছে বলা কঠিন। অন্যান্য মন্দিরের কথা বাদ দিলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশালকায় পঁচিশ শিখর যুক্ত বহুচূড় রত্নমন্দির আছে মাত্র পাঁচটি— তার মধ্যে তিনটিই কালনায়। একটি হুগলী জেলার সুখড়িয়ায় আর

একটি আছে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে। কালনাকে প্রকৃতপক্ষে মন্দিরময় নগরী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংরেজ আমলের সুরুতে বৃটিশের যোগসাজসে পাঞ্জাব আগত বর্ধমানের রাজারা রাঢ়ের সামন্ত পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করে তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে মহারাজা হয়েছেন। পত্তনি প্রথার মারফৎ জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ করেছেন আবার রাস্তা তৈরী, পুষ্করিণী খনন ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে মধ্যযুগীয় জমিদারী বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্ধমানের মহারাজাদের এই বদান্যতা প্রকাশের একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল গঙ্গাতীরের অম্বিকা কালনা।

কালনার অনেক মন্দিরেই টেরাকোটার কাজ দেখা যায়। তার মধ্যে প্রতাপেশ্বর শিব মন্দিরের পোড়ামাটির কাজগুলি সবচেয়ে সুন্দর। প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পাশেই রাসমঞ্চ। উল্টোদিকে গোপেশ্বর শিব ও পঞ্চরত্ন শিব মন্দির।

গোপেশ্বর শিব মন্দির ছেড়েই দু'পাশে জেলখানার মত উঁচু পাচিল ঘেরা পঁচিশ চূড়োওয়ালা দুটি বিশাল মন্দির। বাঁ দিকের মন্দিরটি লালজী মন্দির নামে খ্যাত। ডান দিকেরটি কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। দুটি মন্দিরেই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। লালজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কাহিনী শুনলাম। এক বাউল তার ঝোলায় করে লালজীর পাথরের বিগ্রহ নিয়ে দেশ দেশান্তরে গান গেয়ে ফিরত। একদিন যখন সে কালনার গঙ্গাতীরে ভিক্ষালব্ধ কিছু চাল ফুটিয়ে লালজীকে ভোগ দিচ্ছে, তখন সেই ঘাট থেকে বর্ধমানের রাণী গঙ্গা স্নান সেরে উঠছিলেন। তিনি বাউলের কাছ থেকে বিগ্রহটি নিয়ে নিলেন। বললেন, তুমি দিনান্তে একবার মাত্র লালজীকে খেতে দাও তাও কোন মতে শুধা এক মুষ্টি। আমি লালজীর দিনে জগন্নাথের মত বাহান্নবার ছানা, মাখন, পোলাওএর ভোগ দেব। বাউল বিগ্রহ রেখে গেলেন বটে তবে বলে গেলেন, 'রাণী-মা লালজীকে খাওয়ানর তুমি কি মালিক? লালজীর যখন খুশি হয় ও শুধা খায় যখন

যখন খাবার ইচ্ছা তাই খায়, আবার ইচ্ছে হলে ভুখা ভি থাকে।'

লালজীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দিনে বাহান্ন ভোগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জমিদারী উঠে যাবার পর এখন লালজীর ভোগের কোন ব্যবস্থাই নেই। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সত্যিই এখন এমন দিন প্রায়ই যায় যেদিন লালজীর একবার বাতাসা জলও জোটে না।

এখান থেকে আমরা চললাম কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের দিকে। পথে পড়ল পঁচিশ চূড়া গোপালজীর মন্দির। এই মন্দিরের সামনের অংশ অনেকটা শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দিরের মত। মন্দিরের দেওয়ালে এক সময় পোড়ামাটির কাজ ছিল। বেশীর ভাগই মন্দির সংস্কারের সময় সিমেণ্ট বালির পলেস্তারায় ঢাকা পড়েছে।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের দরজায় পূজার উপাচার বিক্রেতার দোকান। মন্দিরের ভিত খুব উঁচু বেশ বোঝা যায় প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন মন্দিরের উঁচু ভিটার উপর বর্তমান মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের মধ্যে আরও পাঁচটি শিবমন্দির রয়েছে। মন্দিরের ফলকে লেখা, "শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬১। ২।২৬।৬ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়সা। মিস্ত্রি শ্রী রামচন্দ্র।"

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের রাস্তার বিপরীত দিকে ভূতনাথ বাবা প্রতিষ্ঠিত সাধক কুঞ্জ ও কুবেরেশ্বর মহাদেব মন্দির।

বেলা একটা বেজে গেছে। মন্দিরগুলি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম, ভবার ভবানী মঠ ও আরও বহু মন্দির না দেখেই বাড়ী ফিরলাম।

'এই শরীর নিয়ে তুমি কি চলতে পারবে? তারপর যা গরম।'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ম'রব না। বহুদিনের সাধ সাক্ষাৎ ভগবান

যেখানে মাথা মুড়িয়েছিলেন সেখানটা দেখব। যদি বা সুযোগ এল তুই আর না করিস না। ছেলে সঙ্গে আছে কোন কষ্ট হবে না। আমি বেশী ঘুরব না। গৌরাঙ্গ বাড়ী যেয়ে ব'সে থাকব। ও ঘুরে ফিরে সহর দেখে বেড়াবে, ফেরার পথে আমায় নিয়ে আসবে। ছেলে সোজা কলকাতা চলে যাবে, আমাকে কালনা ষ্টেশনে নামিয়ে দিলে আমি রিকস করে ফিরে আসব।' 'তার চেয়ে তুমি ওকে আর কটা দিন থাকতে বল না। আগামী সপ্তাহে গরমের ছুটি আরম্ভ হচ্ছে সবাই মিলে এক সঙ্গে বেরুন যাবে। এর মধ্যে তোমার শরীরটাও আর একটু সেরে উঠবে।'

'তুই-ই বলে দেখনা।'

'আমি বলতে পারব না। কাউকে অনুরোধ করলে সে যদি কথা না রাখে আমার বড্ড লাগে।'

ভিতরের বারান্দার একপাশে রান্নার জায়গা। সেখানে ব'সে কথা হচ্ছিল মা বেটিতে। আমি ঘরের মধ্যে বসে সবই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।

এক সপ্তাহ হল কালনা এসেছি। ওদের ছোট্ট ভাড়াবাড়ীতে আমি থাকায় ওদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। রাত্রে খাওয়ার পর রান্নাঘর মুছে সেই মেঝেতে বিছানা করে যদিও কল্পনাকে শুতে হচ্ছে। ঐ কষ্টকে কষ্টই মনে করেনি। মুখে কিছু না বললেও বুঝতে পারছি আমি আসায় কল্পনা অত্যন্ত খুশি। আরও কয়েকদিন থাকলে ও আরও খুশি হবে কিন্তু আমার নিজেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। গতকাল ও কথা প্রসঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিল, 'সামনের সপ্তাহে পূজোর ছুটি আরম্ভ হবে এবার কয়েকদিন আপনার সাথে বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে কাছাকাছি জায়গাগুলি দেখা যাবে।'

তখনই বলেছিলাম অনেকদিন হয়ে গেল। পরদিন-ই বেরিয়ে পড়ছি। এতদূর এলাম। কাটোয়াটা দেখে সোজা কলকাতা ফিরব শুনে মিনিট দুয়েক চুপ করে ছিল কল্পনা। তারপর ধরাগলায়

স্বগত উক্তি করেছিল, আমারই ভুল। মায়ের অসুখ, বিপদের কথা শুনে দৌড়ে এসেছেন, মাত্র কদিনের পরিচয়ে এতটাই বা কে করে।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছেছিল।

আমি কাটোয়া হয়ে কলকাতা ফিরব কল্পনার মুখে এই কথা শুনেই বোধ হয় ওদের ঐ আলোচনার সুরু।

মাসীমা ঘরে ঢুকলেন।

'বাবা আর কয়েকটা দিন থেকে গেলে কি খুব অসুবিধা হবে? আজ সোমবার, সামনের রবিবারে বেরুলে মেয়েটাও সাথে যেতে পারতো।'

কাটোয়া দেখতে যাব। কল্পনা সাথে থাকবে, ভাবতেও মনটা খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু আরও এক সপ্তাহ এখানে চুপ করে এদের ঘাড়ে চেপে বসে থাকা সেটাও ভাল লাগছিল না। একটু ভেবে জবাব দিলাম, আমি আজই যেমন বেরিয়ে যাচ্ছি যাই। কাটোয়া যাব না। আপনিও ইতিমধ্যে আরও একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। ঘর বাড়ি সব চেনা হল, এবার মধ্যে মধ্যে আসব তখন একবার সবাই একসঙ্গে কাটোয়া যাওয়া যাবে।'

মাসীমা খুশি হলেন।

কোথায় যাচ্ছি ওদের না বলেই বেরিয়ে পড়লাম।

আশা করেছিলাম কল্পনা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কবে ফিরব প্রভৃতি প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। কিন্তু দেখলাম কল্পনা নীরব। শুধু আরক্ত দুটি চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকল। সে চোখের পলক নিস্কম্প—ভাষা নীরব।

***